বিলাতযাত্রার পূর্বে গৃহীত এই ছবিটি কলিকাতা পুলিশ-কোর্টে ছিল ;
এখন বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে রক্ষিত আছে।

যুগন্ধর মধুসূদন

শ্রীশীতাংশু মৈত্র, এম.এ., ডি.ফিল.

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
১৩৬৫

গ্রন্থ-পরিচিতি

ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাঙালীর ভাবলোকে যে আলোড়ন ও উদ্দীপনা আসিয়াছিল এবং কবি মধুসূদন যে ভাববিপ্লবের সার্থক ধারক তাহারই আলোচনা আছে এই গ্রন্থে। ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. ফিল. উপাধির জন্য গ্রন্থকারের গবেষণার ফল। এই গ্রন্থে যে দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বিত হইয়াছে তাহার পারিভাষিক নাম দ্বন্দ্বমূলক জড়বাদ বা ডায়ালেকটিক্ মেটিরিয়ালিজম্। এই দৃষ্টিকোণ লইয়া ইতঃপূর্বে কেহ কেহ প্রবন্ধাদি লিখিলেও ইহার ভিত্তিতে একটি সামগ্রিক ভাববিপ্লবকে দেখিবার প্রচেষ্টা বাংলা সমালোচনার ক্ষেত্রে বোধ হয় এই প্রথম। তাই ভুলভ্রান্তি এবং তত্ত্বের অপপ্রয়োগ ইহাতে থাকা স্বাভাবিক। সহৃদয় পাঠকবর্গের সমালোচনা সেইজন্য আমার একান্ত কাম্য।

এই গবেষণাগ্রন্থের পরীক্ষক ছিলেন আচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী এবং বিশ্বভারতীর শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন। ইঁহাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, বাংলা সমালোচনার ক্ষেত্রে এই প্রকার গবেষণা অভিনন্দনযোগ্য এবং ইহার দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষ মতবাদপ্রসূত হওয়া সত্ত্বেও কোথাও এই গ্রন্থ যান্ত্রিকতা বা একদেশদর্শিতায় দুষ্ট নয়।

গ্রন্থের মুদ্রণকার্য, বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশ করিবার আগেই দ্রুত সমাপ্ত হওয়ায় অনেক মুদ্রণপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। একটি শুদ্ধিপত্র অবশ্য সংযোজন করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাও সুসম্পূর্ণ নয়; একটি বানান ভুল আমাকে বড়ই পীড়া দিতেছে: গ্রন্থের সর্বত্র 'রেনেসাঁস্' (Renaissance-Fr.) কথাটি 'রেনেসাঁ' লিখিত হইয়াছে। কিন্তু আপাতত ইহা অসংশোধনীয়।

বঙ্গবাসী কলেজ
মহালয়া, ১৩৬৫

ইতি
গ্রন্থকার

মুখবন্ধ

মধুসূদন সম্পর্কে যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের গ্রন্থের ভূমিকা অগ্রচারীর ; সে আজ ৬৩ বৎসরের কথা। তাহার পর মধুসূদন সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন সাধন করিয়া, তাঁহার কীর্তি যে সত্যই গতানুগতিকতার ব্যতিক্রম তাহা আমাদের বুঝাইলেন রবীন্দ্রনাথ। মধুসূদন যে নূতন কিছু করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার সমকালীনেরা উপলব্ধি করিলেও পরবর্তীকালে আমরা ভুলিতে বসিয়াছিলাম এবং যোগীন্দ্রনাথ বসু মধুসূদনের খ্রীষ্টান হইবার ব্যাপারে এমন চঞ্চলচিত্ত হইয়া উঠিলেন যে যুগের পটভূমিকায় মধুসূদনের জীবনকে স্থাপনই করিতে পারিলেন না। আবার মধুসূদনের কাব্য আলোচনা করিতে গিয়া 'রামাদিবৎ কার্যঃ রাবণাদিবৎ অকার্যঃ'—এই চিরাচরিত সংস্কৃত-ব্যবসায়ীর মনোভাব লইয়া বিচারের ফলে তিনি শুধু করিলেন অলংকার-বিচার আর দেখিলেন পাপের পরাজয় পুণ্যের জয়।

রবীন্দ্রনাথ অল্প বয়সে মধুসূদনের যে সমালোচনাগুলি করিয়াছিলেন সেগুলি আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রত্যাহার করিলেও মধুসূদনের ঐতিহ্য সম্পর্কে, 'সাহিত্য-সৃষ্টি' নামক প্রবন্ধে একটি অনুচ্ছেদ লেখা ছাড়া, আর কোন সম্পূর্ণ ও বিস্তৃততর বিশ্লেষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন না। ফলে তাঁহার বক্তব্য নূতন আলোকপাত করিলেও অস্পষ্ট রহিয়া গেল। রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করিয়া যিনি আধুনিক সাহিত্য-বিচারের পদ্ধতি অনুসারে মধুসূদনের সৃষ্টির বিশ্লেষণ করিলেন, তিনি শশাঙ্কমোহন সেন। অতি-ভাষণ এবং স্ব-বিরোধতা সত্ত্বেও তিনিই প্রথম মধুসূদনের প্রতিভাকে যুগের পট-ভূমিকায় স্থাপন করিবার যথার্থ চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ আজ আর ছাপা হয় না। ইঁহার পরেই নাম করিতে হয় মোহিতলাল মজুমদারের। কিন্তু তিনি মধুসূদনকে খাঁটি বাঙালী প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টায় আসল কথা বেশী বলিবার অবকাশ পান নাই। মধুসূদন ত বাঙালী ছিলেনই ; কিন্তু ভারতচন্দ্রও খাঁটি বাঙালী ছিলেন। আমাদের কাছে এই দুইজনের সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই কি বড় কথা নহে ?

এ পর্যন্ত মধুসূদনের প্রতিভার প্রকৃত, নিরপেক্ষ, পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ হয় নাই। অবশ্য অনেকে মনে করেন, অনেক বলা হইয়াছে, আর বলিবার দরকার নাই। কিন্তু অনেক বলা হইলেও যে অনেক ক্ষেত্রে আসল কথা বলা হয় না—ইহা এই সমালোচকদের মনে করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন।

বর্তমান গ্রন্থে প্রধানত এই কথাই প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, মধুসূদন ইংরাজ বনিয়া গিয়াছিলেন কি বাঙালী হিন্দুই ছিলেন, অথবা ট্যাঁশফিরিঙ্গী হইয়া সমাজের বাহিরে বাস করিতেছিলেন, ইহা বড় কথা নহে ; বড় কথা হইল তাঁহার জীবনে ও কাব্যে যুগ-প্রেরণার সম্যক্ প্রতিফলন—যুগপৎ সেই প্রেরণার শক্তির ও দুর্বলতার। **মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য তৎকালীন বাঙালীর জীবনের মহাকাব্য—সেই জীবনের অফুরন্ত সম্ভাবনার ও সেই সম্ভাবনার বাস্তব অপরিপূর্তির।** এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে

দেখিলে তবেই বুঝা যাইবে কেন মেঘনাদবধ কাব্য, কবির প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও, বীর-রসাত্মক না হইয়া করুণ-রসাত্মক হইল এবং কেন দীপ্ত পৌরুষের প্রতীক রাবণ তাঁহার অনির্বাণ পৌরুষ সত্ত্বেও কেবলই পরাজিত হইলেন 'ভিখারী রাঘবের কাছে' এবং একান্ত অভিমানে অবুঝের মত সারা কাব্য ব্যাপিয়া প্রশ্ন করিতে থাকিলেন, কেন তাঁহার ভাগ্যে এই ঘটিল। পাপের পরাজয় ও পুণ্যের জয় উদ্ঘোষণ বা 'ধর্ম বিদ্রোহী মহাদম্ভী' রাবণের নিয়তিবশে একান্ত পরাজয়ের কাহিনী মেঘনাদবধ কাব্য নয়। এ পর্যন্ত সমস্ত বাঙালী সমালোচক যাহাকে নিয়তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছেন, মেঘনাদবধ কাব্যে সেই নিয়তি-তত্ত্ব যে নাই—ইহাও আমাদের প্রামাণ্য। পৌরুষের ও যোগ্যতার যে গ্লানিকর পরাজয় তৎকালীন বাঙালীর জীবনে ঘটিতেছিল, মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণের সর্বনাশ ও মেঘনাদের অপমৃত্যু তাহারই প্রতিফলন।

আর রাম ও তাঁহার অনুচরদের প্রতি অর্থাৎ সমাজের রক্ষণশীল সৃষ্টিবিমুখ গতানুগতিকতার সমর্থকদের প্রতি মধুসূদনের অবজ্ঞা সেই যুগধর্মেরই প্রতিফলন যাহার মূল কথা হইল মানবতাবাদ, ঐহিকতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতাবাদ, যুক্তিবাদ ও তীব্র মর্ত্যপ্রেম।

এই আলোচনা-প্রসঙ্গে সিপাহীবিদ্রোহ সম্পর্কে তৎকালীন বাঙালীর মনোভাব যে কি ছিল এ বিষয়ে এ পর্যন্ত প্রচলিত ধারণার প্রতিবাদ করা হইয়াছে; এবং দেখান হইয়াছে যে বাঙালী এই বিদ্রোহকে মনে প্রাণে সমর্থন করে নাই, এ কথা তথ্যবিরোধী। প্রসঙ্গক্রমে তাঁতিয়া টোপীকে সমর্থন করিয়া আচার্য কৃষ্ণকমল যে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন (এখন অপ্রাপ্য) তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইহা ছাড়া তিলোত্তমা সম্ভবের আলোচনাতে এই কথা প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে বাংলা সাহিত্যে যে রোমান্টিকতার ধারা রবীন্দ্রনাথে আসিয়া পরিণতি লাভ করিল, তাহারও উৎস মধুসূদন।

আমাদের প্রধান আলোচ্য তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য এবং মেঘনাদবধ কাব্য বলিয়া ইহাদের উপরেই আলোচনা নিবদ্ধ হইয়াছে। নাটক ও প্রহসন আলোচনা করা হইয়াছে কেবল সূত্র ধরিবার জন্য। মেঘনাদবধ কাব্যের পরবর্তী সৃষ্টি আমাদের বর্তমান গ্রন্থের অধিকারের বাহিরে।

এই গ্রন্থের আলোচনার কোন কোন অংশ সংক্ষিপ্ত অথবা বর্ধিত আকারে শনিবারের চিঠি (কার্তিক, ১৩৬৩), রবিবাসরীয় যুগান্তর (১৩ই মে, ১৯৫৬), রবিবাসরীয় স্বাধীনতা (১৪ই আষাঢ়, ১৩৬০), Unity (জুলাই, ১৯৫৪), ও চতুষ্কোণ (কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩৬০)—এই পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছে। মধুসূদন সম্পর্কে একটি একাঙ্কিকা পরিচয় পত্রিকার ১৯৫৪, নভেম্বর সংখ্যায় বাহির হয়।

তাড়াতাড়ি মুদ্রণ-কার্য শেষ করিতে গিয়া কিছু কিছু বানান-ভুল ঘটিয়া গেল। সে জন্য ত্রুটি স্বীকার করিতেছি।

ইতি

গ্রন্থকার

জন্মাষ্টমী, ১৩৬৩

আচার্য স্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত
ভূমিকা

ভূমিকা

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শীতাংশু মৈত্র মহাশয়ের লিখিত এই বইখানি প্রকাশনের পূর্বে যখন ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত হয়, সেই সময় অন্যতম পরীক্ষক হিসাবে ইহা পাঠ করিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল; এবং তিনজন পরীক্ষকের ঐকমত্য অনুসারে এই পুস্তকের জন্য তাঁহাকে ডি. ফিল. উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে।

বইখানির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। একটী নূতন এবং এ যুগের অনেকের কাছে প্রিয় দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া গ্রন্থকার গত শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্যের একটী ধারার আলোচনায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইনি গোড়াতেই আমাদের সচেত করিয়া দিয়াছেন যে ইঁহার দৃষ্টিভঙ্গী হইতেছে মার্ক্সীয়। কিন্তু মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সবটা প্রয়োগের অবকাশ তিনি পান নাই, কারণ ইহার মুখ্য অবলোকন হইতেছে Man and the Moment লইয়া, অর্থাৎ আলোচ্য কবি বা লেখক কি পারিপার্শ্বিক বা পরিবেশ এবং কোন যুগধর্ম্মের মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছেন, তাহারই আলোচনা হইতেছে এই পুস্তকের মুখ্য কথা। সুতরাং মার্ক্সীয় মতের অনেক বিবাদগ্রস্ত সিদ্ধান্ত যথা Dialectical materialism ('দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ'—বা বর্মীরা যেভাবে পালি শব্দ লইয়া ইহার অনুবাদ করিয়াছে, 'অনু-প্রতি-লোম রূপবাদ')—তাহার অবতারণার কোন আবশ্যকতা উঠে নাই। কোনও কবি বা লেখককে বুঝিতে হইলে তাঁহার পৃষ্ঠভূমিকা স্বরূপ তাঁহার যুগের মানুষের বিষয়ে জ্ঞানাও অত্যাবশ্যক; এবং ইহাই হইতেছে Man and the Moment বিচার করিয়া আলোচনা করার মূলসূত্র। কবি বা লেখকের কালের মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ, তাহার রাজনৈতিক অবস্থা, এবং জীবনের মুখ্য ক্ষেত্রে কবির আশা ও আকাঙ্ক্ষা, এবং আকাঙ্ক্ষার পূর্তি বা আকাঙ্ক্ষার বিষয়ে ব্যর্থতা, ইহারই বাতাবরণে কবি আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রস্তুত গ্রন্থে লেখক বহু পৃষ্ঠা ধরিয়া, গত শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বাঙ্গালা দেশের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের মনকে সংস্কারমুক্ত করিয়া দিবার জন্য যে-সকল শক্তি কার্য্যকর হইয়াছিল—যে-সকল দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর

Weltanschauung অর্থাৎ বিশ্বপ্রপঞ্চ ও মানব সম্বন্ধে যে বোধ বা বিচার ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার আলোচনা আছে। এইরূপ আলোচনার উপযোগিতা সকলেই স্বীকার করিবেন। গ্রন্থকার গত শতকের শিক্ষিত বাঙ্গালীর বিশ্ব ও মানব সম্বন্ধে জাগরিত যে বোধ বা বিচারের বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা আমার কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হইয়াছে।

গ্রন্থকারের মতে এই যুগের শিক্ষিত বাঙ্গালীর জীবনে সর্বাপেক্ষা বড় কথা হইতেছে—তাহার অসীম এবং দুর্দমনীয় অগ্রগতির আকাঙ্ক্ষা, এবং সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক প্রতিকূলতা ও বিদেশী রাজশক্তির শোষণ ও শাসনের প্রভাবে এই আকাঙ্ক্ষার অপরিহার্য্য ব্যর্থতা। এই অবস্থার মধ্যে লেখক মার্ক্সীয় মতবাদের অতিপ্রিয় সিদ্ধান্ত শ্রেণীসংগ্রামের কোন স্থান বা ক্রিয়া পান নাই। প্রস্তুত পুস্তকের অর্দ্ধেকের উপর এইভাবে শিক্ষিত বাঙ্গালীর চিত্তের বিশ্লেষণ লইয়া লেখক যে গবেষণা করিয়াছেন, তাহা তিনি প্রমাণপঞ্জী সহকারে এবং বিশেষ যোগ্যতার সহিত উপস্থাপিত করিয়াছেন; তজ্জন্য তাঁহাকে সাধুবাদ দিতে পারা যায়। শিক্ষিত বাঙ্গালী ইংরেজী সাহিত্যের কল্যাণে যে মানসিক বিচারশীলতা এবং আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী পাইল, যে নবীন আধিমানসিক শক্তির অধিকারী হইল, তাহার পূর্ণ পরিণতির পথে কতকগুলি অনপেক্ষিত এবং অনপনেয় বাধা দেখা দিল। ইংরেজ শোষণ-নীতির ও দমন-নীতির সহায়করূপে দেখা দিল বাঙ্গালা দেশে একটী পাটোয়ারী মনোভাবযুক্ত জনসমাজ—যে জনসমাজ শাসনের ক্ষেত্রে এবং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ইংরেজেরই অনুগামী হইয়া দাঁড়াইল। বইয়ের এই অংশ গ্রন্থকার একটু বেশ তেজের সহিতই লিখিয়াছেন, এবং তাঁহার লেখা পড়িয়া বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার নিজ মত প্রকাশের শক্তি আছে; এবং বাঙ্গালা দেশের এই যুগের মানবধর্ম ও সাহিত্যধর্ম সম্পর্কে তিনি পড়াশুনা করিয়াছেন যথেষ্ট, এবং যাহা পড়িয়াছেন তাহা আত্মসাৎ করিতেও পারিয়াছেন।

কিন্তু যেখানে তিনি মধুসূদনের সাহিত্যিক কৃতিত্বের মূল্য-নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছেন, সেখানে তিনি বিশেষভাবে স্বকীয় একটী দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণা করিয়াছেন। মধুসূদন অবশ্য তাঁহার জীবনে ও চিন্তায় এবং সাহিত্যিক প্রকাশে, যাহা অযৌক্তিক এবং কেবলমাত্র গতানুগতিক, তাহার বিরোধী ছিলেন; এবং তিনি ছিলেন তেজীয়ান্ শক্তিশালী বীর পুরুষেরই গুণগ্রাহী; এবং যে প্রগতি বা উন্নতি কেবল নিজের ব্যক্তিগত শক্তির আধারেই কার্য্য করে, তাহারই

সমর্থক এবং পূজারীও তিনি ছিলেন। এইরূপ শক্তিশালী পুরুষ, প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িয়া নিষ্ফলতা ও ব্যর্থতার অভিশাপে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। লেখক মধুসূদনের রচনাবলীকে সাধারণভাবে শিক্ষিত এবং আদর্শবাদী স্বাধীনতাকামী বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনন-শক্তির প্রতীক বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী তাঁহার লেখায় সর্বাপেক্ষা অধিক কার্য্যকর হওয়ায়, মধুসূদনের কবি-ব্যক্তিত্বের গঠনে অন্য কি কি শক্তি কার্য্য করিতেছিল, আমার মনে হয়, সে বিষয়ে তিনি তেমন অবহিত হইতে পারেন নাই। মধুসূদনের যুগের ইয়ং বেঙ্গলের মত, কবি নিজে Byron-এরই অনুগামী ও অনুকারী ছিলেন; এবং ইয়ং বেঙ্গলের প্রত্যেকেই নিজেকে 'ক্ষুদে' বা ছোটখাট Byron বলিয়াই মনে করিতেন। মধুসূদন তাঁহার প্রাথমিক কবি-জীবনে Byron-এর মোহে পড়িয়াছিলেন একথা ঠিক; কিন্তু কিছুকাল পরেই তিনি Milton-এর কবিতার সাগর-গর্জনের দ্বারাও অভিভূত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার নাট্যপ্রতিভা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি কখনও শেকস্পিয়রকে ভোলেন নাই। প্রস্তুত গ্রন্থে লেখক মনে করেন যে, মধুসূদনের কবিতার মধ্যে কোন pose বা নাটকীয় ভঙ্গী নাই—তিনি ভাবশুদ্ধির সহিত লিখিয়াছেন, ভাবের ঘরে চুরি করেন নাই; এবং যেখানেই তিনি নিজের রচনায় দুঃখের আবেগের পরিচয় দিয়াছেন কিংবা পরাজয়ের কথা বলিয়াছেন, সেখানে লেখক, কবির মনে যে দুঃখবিলাসের সম্ভাবনা আছে, তাহা ভাবেন নাই; তিনি তাঁহার মধ্যে কেবলমাত্র উনবিংশ শতকের শিক্ষিত বাঙ্গালীর জীবনের ব্যর্থতার শোকগাথাই পাইয়াছেন। এই দৃষ্টিকোণ ধরিয়া বিচার করিলে আমার মনে একটু আশঙ্কা হয় যে, গ্রন্থকার মধুসূদনের ব্যক্তিত্বের ও চরিত্রের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা বস্তুনিষ্ঠ না হইয়া কতকটা যেন আত্মনিষ্ঠ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অধ্যাপক মৈত্র এই বিষয়টীই আমাদের কাছে আগ্রহের সহিত উপস্থাপিত করিয়াছেন যে, মধুসূদনের রচনার মুখ্য কথা হইতেছে জীবনের ব্যর্থতার বেদনা ও যন্ত্রণা মাত্র, এবং প্রায় আর কিছুই নহে (তাঁহার মধ্যে যে একটী স্বতঃ-উৎসারিত কাব্যধর্ম আছে, যাহা গীতি-কবিতায় প্রকাশিত হইয়াছে, সেটী অবশ্য লেখক স্বীকার করিয়াছেন)। লেখকের এই দৃষ্টিকোণ যে মধুসূদনের কবি-প্রতিভায় কেবল জীবনে ব্যর্থতারই প্রতীক খুঁজিয়া পাইয়াছে, এটী 'লেখকের মনে যে ভাবধারা কার্য্যকর হইতেছে বলিয়া মনে হয় তাহারই

প্রতিফলন—এই ভাবধারার মধ্যে বিশ্বপ্রপঞ্চের অন্য সমস্ত factors (সত্তা)—কে অতিক্রম করিয়া কেবল মানুষেরই জয়গান করা,"ক্ষণস্থায়ী মানব-জীবনকেই দেবত্বের আসন দেওয়া।

মতবাদ বিষয়ে লেখকের এই যে আস্থা বা আত্মনিষ্ঠ বিচার বা অনুভূতি, ইহার সহিত অনেকে একমত না হইতে পারেন। কিন্তু তাহা হইলেও সাহিত্যের আলোচনার ক্ষেত্রে এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচারকে প্রথম হইতেই ন-স্যাৎ করিয়া দিবার কথা, নিরপেক্ষ সমালোচকের মনে আসা উচিত নয়। এইজন্য আমি বলিব যে, গ্রন্থকারের দৃষ্টিভঙ্গী যাহাই হউক, তাঁহার আলোচনা-শৈলী প্রণিধানযোগ্য—যদিও আমরা লেখকের সঙ্গে আদৌ একমত হইতে পারি না, যেখানে তিনি একটু অনাবশ্যক তীব্রতার সহিত মধুসূদনেব রচনার পূর্ব সমালোচকগণের মন্তব্যের প্রতিবাদ কবিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও লেখকের এই সমালোচনা হইতে বাদ পড়েন নাই। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, লেখকের পূর্বে যাঁহারা মধুসূদনের রচনা লইয়া বিচার করিয়াছেন, তাঁহারা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে কবির চিন্তা, দর্শন এবং সামাজিকতা ও কাব্যধর্মের প্রতি আলোকপাত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য, তাঁহাদের এই সমস্ত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের যৌক্তিকতা ও সার্থকতা বিচার করিয়া দেখিবার বস্তু। তবে সাহিত্যিক এবং অন্যবিধ আলোচনায় একেবারে অপরিবর্তনীয়রূপে মত স্থির কবিয়া লইযা বিচার করিতে যাওয়া সংস্কারমুক্ত মনের পরিচায়ক নহে।

ভূমিকা লিখিতে গিয়া দেখিতেছি লেখকের সহিত আমার দৃষ্টিভঙ্গীব পার্থক্যের কথাটাই যেন বড় হইয়া উঠিল। কিন্তু সাধারণভাবে আমাব মনে হয় যে, অন্য সমালোচক বা মধুসূদনের অনুরাগী পাঠকের সঙ্গে মতভেদ হইলেও, একথা স্বীকাব করিতে হইবে যে, প্রস্তুত পুস্তকখানি বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনাব ক্ষেত্রে একটু নবীনত্ব আনিয়াছে। অবশ্য লেখক তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী অন্য সমালোচকের অনুমোদনীয় করিবার জন্য তাঁহার নিজের কথা সম্পূর্ণ নূতনভাবে বলুন, একথা বলি না; তবে তাঁহার প্রস্তাবিত কতকগুলি মূলসূত্র যে বিচার-সাপেক্ষ, তাহা বলি। এই পুস্তক পাঠ করিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন যে, লেখক এই বই রচনার জন্য উপযুক্ত প্রস্তুতি লইয়াই অবতীর্ণ হইযাছেন। সাহিত্য-আলোচনার ক্ষেত্রে, একটী বিশ্বঙ্কর ও সর্বাতিগ নীতি বা পদ্ধতি যে হইতে পারে আমরা তাহা মনে করি না। তবে বিচারের আধার রূপে

যে নীতি গৃহীত হইয়াছে, তাহা যুক্তিসহ কিনা তাহা দেখা আবশ্যক। লেখক তাঁহার আবিষ্কৃত 'ব্যর্থতা'-র মান লইয়া সবকিছু বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেইজন্য মাঝে মাঝে তিনি এক কথারই একটু বেশী পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। বাঙ্গালা ও ভারতীয় সাহিত্য ছাড়া ইউরোপীয় সাহিত্যের সহিত তাঁহার ভালো রকমের পরিচয় থাকা সত্ত্বেও তিনি ইউরোপীয় শব্দ 'Renaissance"-কে বাঙ্গালায় 'রেনেসাঁ' রূপে লিখিবার উর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু এ হ বাহ্য। আমার কাছে এই বইয়েব মূল্য এইখানেই যে একটী নূতন দৃষ্টিপাত লেখক আনিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং মার্ক্সবাদকে আশ্রয় করিলেও এই মতবাদের সবকথা ঢুকাইবার চেষ্টা তিনি করেন নাই—এ বিষয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী দেখাইয়াছেন—এবং এই সব কারণে কাব্যালোচনার ক্ষেত্রে এইরূপ পুস্তকের সার্থকতা॥

'সুধর্মা', হিন্দুস্থান পার্ক,
কলিকাতা,
৩।১২।৫৮

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

যুগন্ধর মধুসূদন

প্রথম পরিচ্ছেদ

সেই যুগ

(ক)

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বাঙালীর নবজাগরণের কথা আজ এত সুপরিচিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত যে, এ সম্পর্কে যুক্তি-তর্কের অবতারণা নিষ্প্রয়োজন। আর এই জাগরণ যে শুধু বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না, পরন্তু, দুই-দশ বছরের ব্যবধানে প্রায় সমগ্র ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষেই ব্যাপ্ত হইয়াছিল তাহাও সুবিদিত। মহারাষ্ট্রে, গুজরাটে. বিহারে (অবশ্য তখন বিহার বাংলা হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল না), আসামে (বাংলার সঙ্গে তখন একত্রীভূত) এই নবভাবের উন্মেষ নানা মাধ্যমেই ঘটিয়াছিল। কিন্তু বাংলাদেশে ছিল এই ভাবগঙ্গার উৎস-মুখ। তাহার কারণ এই বাংলাদেশেই ইংরাজের আনীত প্রতীচ্যের নূতন গণতান্ত্রিক চেতনার প্রসার ও প্রভাব প্রথম স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিল। যদি ইংরাজ আমাদের দেশে না আসিত তাহা হইলে এই নূতন ভাবধারা ঐ বিশিষ্ট দেশে ও কালে প্রবাহিত হইত কি না, এ আলোচনা আজ নিরর্থক। তথ্যকে স্বীকার করিয়া লইয়াই আমরা অগ্রসর হইতে চাই। ইংরাজ বাঙালীর তথা ভারতীয়ের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হরণ করিয়াও যে তাহাদের মানসলোকে এই অভিনব ভাবতরঙ্গ বহাইয়াছিল, ইহা বিস্ময়ের না হইলেও, কিন্তু ভাবিবার বিষয়। সেইজন্য ইউরোপের বিভিন্নদেশে পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে যে নবজীবনের সূচনা হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে সুদূর প্রাচ্যখণ্ডের এই রেনেসাঁর মূলগত প্রভেদ আছে।

প্রতীচ্যে এই রেনেসাঁর সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল নব জাতীয়তা-বোধ, নব মানবতা-বাদ (humanism), জীবনের অপরিসীম বিস্তারের প্রতিফলন হিসাবেই কল্পনার অপরিমেয় বিস্তার। সেখানে বাস্তব জীবনের সঙ্গে ভাবলোকের আত্যন্তিক বিরোধ ছিল না। ক্রিস্টোফার মার্লো যখন তৈমুর লঙের কাহিনীর মাধ্যমে সে যুগের নূতন মানুষের নিঃসীম জীবনপিপাসাকে রূপ দিতেছিলেন, তখন বাস্তব জীবনেও ভাস্কো-ডা-গামা হইতে আরম্ভ করিয়া র‍্যালে পর্যন্ত সকল অভিযাত্রীই পৃথিবীকে নূতন করিয়া আবিষ্কার করিতেছিলেন; গ্যালিলিও,

কোপর্নিকস্ ও কিছুপরে নিউটন ও লাইবিনিৎস্ পৃথিবীর সীমা ছাড়াইয়া শূন্যে পাড়ি জমাইলেন মানুষের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের মধ্যে এই অসীম জ্যোতির্লোককে ধরিবার জন্য, তাহাকে পৃথিবীর অধিকারে আনিবার জন্য: ফ্রান্সিস্ বেকন স্থাপন করিতেছিলেন প্রকৃতিকে আবিষ্কার করিবার নূতন কলাকৌশল; আর দুর্ধর্ষ আর্মাডাকে পরাজিত করিবার উল্লাসে ইংলণ্ডের নবশক্তির আধার মধ্যবিত্ত সমাজ সাত সমুদ্রের রাণী হইবার কল্পনায় তখন মশ্‌গুল। অষ্টম হেনরীর রাজ্যকালে রিফর্মেশন ইংলণ্ডীয়দের এই নব-জাতীয়তাবাদে দীক্ষা গ্রহণের সুযোগই করিয়া দিয়াছিল পোপের সঙ্গে এবং তাঁহার 'Holy Roman Empire' এর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করাইয়া। এই রিফর্মেশন আপাতদৃষ্টিতে ধর্মীয় আন্দোলন হইলেও মূলত ইহা উদীয়মান মধ্যবিত্তশ্রেণীর এবং জাতি (nation)-ভিত্তিক নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের (absolute monarchy) সহায় হিসাবেই ইংলণ্ডে সংসাধিত হইয়াছিল: "The Medieval Papacy was a centralised, international organisation which succeeded in establishing a highly profitable monopoly in the grace of God. Even in feudal times................this monopoly was often resented by kings and princes. *With the coming of centralised nation states* it was bound to lead to a general and open conflict, for the breaking of the papal monopoly was a necessary step in the creation of the *absolute monarchies.*........The Protestant Reformation was, therefore in essence, a *political movement*........

The antagonism to the papal monopoly expressed itself in varying ways, not always in open conflict. The greatest powers, France and Spain, never broke with the Papacy because they hoped to be able to control and exploit it for their own ends as the French kings had done while the Popes lived at Avignon. In the sixteenth century the struggle between France and Spain in Italy was to a large extent a struggle to control the Papacy.........

Midway between these extremes in power and wealth stood England. Wolsey and Henry VIII began by

believing that they could compete with France and Spain for the control of the Papacy and it was not till they were disillusioned that they took the first steps towards freeing England from Papal control.........

To break with Rome was almost universally welcomed......The exactions of the Papacy were disliked even by large sections of the clergy and when Henry in 1531 declared himself head of the church there was little opposition except from the monks........Protestantism was the body of ideas *inspiring the popular mass movement.*"[১]

ইংলণ্ডে এই যে নূতন সমাজ-ব্যবস্থায় নূতন মানুষ অভিনব মন ও অচিন্ত্যপূর্ব জীবনাদর্শ লইয়া আবির্ভূত হইতেছিল, সেই মানুষ সম্পর্কেই শেক্সপীয়র বলিয়াছেন: "What a piece of work is a man, how noble in reason, how infinite in faculties, in form and moving, how express and admirable in action, how like an angel in apprehension, how like a god—the beauty of the world; the paragon of animals;"[২] এবং এই নূতন জগৎ ও নূতন মানুষকে রূপায়িত করিবে যে কবি, তাহার ক্ষমতারও যেন কোনো সীমা-পরিসীমা নাই:

"The poet's eye, in a fine frenzy rolling,
Doth glance from heaven to earth,
from earth to heaven
And as Imagination bodies forth
The forms of things unknown, the poet's pen
Turns them to shapes, and gives to airy nothing,
A local habitation and a name."[৩]

এই কল্পনা আর মূলত Platoর সেই দৈবী প্রবর্তনা নহে; ইহা এখন কবি-মানসের একটি সহজ শক্তি। Platoর কবি লেখেন স্বর্গীয় অনুপ্রেরণা-বশে, কিন্তু কি লেখেন তাহা তিনি জানেন না। তাঁহার আবেগ আছে কিন্তু জ্ঞান নাই। তাই রথের গতি যখন হোমার বর্ণনা করেন তখন সেই গতি সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞান রথচালকের জ্ঞানের কাছাকাছিও যায় না।[৪] তিনি যখন লেখেন তখন প্রকৃতিস্থ থাকেন না; তখন তিনি থাকেন দৈবী আবেশে।

Republic গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে এই কবিকেই প্লেটো সমাজ হইতে বহিষ্কার করিয়াছেন। বহিষ্কারের বা অস্বীকৃতির নানা কারণের মধ্যে প্রধান হইতেছে কবির অজ্ঞতা বা সত্য জ্ঞানের অভাব। Platoর এই নিষ্করুণতার কারণ অবশ্য Intellect (মনন বা বুদ্ধি) এবং Imagination (কল্পনা) এর বিরোধে মনন-জনিত বা বুদ্ধি-আয়ত্ত জ্ঞানকেই জ্ঞান বলিয়া স্বীকৃতি দান এবং কল্পনাকে জ্ঞানবিরোধী বলিয়া প্রচার। Aristotle যে পরে কাব্যকে ইতিহাসের চেয়েও বেশী বিশ্বজনীন (universal) ও philosophical বলিয়াছিলেন[৫], সে বিশেষ করিয়া ট্র্যাজেডির ঘটনাবিন্যাসের আভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য বা কার্য-কারণ-সম্পর্ক সিদ্ধির জন্য : "From what we have said it will be seen that the poet's function is to describe, not the thing that has happened, but a kind of thing that might happen, i.e., what is possible *as being probable or necessary*". [৬] Aristotle কাব্যলোকের আন্তঃসৌসাম্যের (inner consistency) উপর নির্ভর করিয়া উহার মূল্য নিরূপণ ও প্রতিষ্ঠা করিলেন ; কবি যে বাস্তব জ্ঞানের (objective knowledge) অধিকারী এ কথা স্পষ্টত প্রমাণ করিলেন না। রোমক যুগ ও ইতালীয় রেনেসাঁর স্ফুরণের মাঝেও শিল্প ও সত্যের এই প্রশ্নটি অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছিল, কারণ এই দীর্ঘ যুগ ধরিয়া Aristotle এর বদলে হোরেসের এবং জ্ঞানবিস্তারের বিরোধী চার্চের প্রাধান্য। ইংলণ্ডেও রেনেসাঁ যুগে Aristotle এর Poetics প্রায় অজ্ঞাতই ছিল। কিন্তু যুগচেতনাই যেন শেক্সপীয়রের মুখ দিয়া বলাইল : কবি স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল বিচরণ করিয়া যাহা আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত ছিল, তাহাকেই নাম-ধাম প্রদান করিয়া আমাদের অনুভবগম্য করেন। কবি শুধু সত্য দর্শনই করেন না,আমাদের অনধিগম্য সত্যও আমাদের গোচর করেন। কবির এই আত্মপ্রত্যয়, এই স্ব-ধর্মে প্রতিষ্ঠা, নবযুগের চেতনা-প্রসূত। তিনি নিজেই জানেন : "What's Hecuba to him, or he to Hecuba"[৭],...তবু সেই শিল্পই ত মানুষের মনকে রসায়িত করে। কবির ধর্ম সম্পর্কে এই মহৎ চেতনা রেনেসাঁ যুগের বৈশিষ্ট্য ; এই রেনেসাঁর যুগেই মানুষ নিজের সুপ্ত ঐশ্বর্য আবিষ্কার করে। এতদিন যে করে নাই, তাহার কারণ সামাজিক শক্তি ও সামাজিক প্রয়োজন সেই সব সুপ্ত সম্ভাবনার স্ফুরণের অনুকূল ছিল না। যে সমস্ত নূতন সামাজিক শক্তি-সমাবেশের কথা আগে উল্লেখ করা হইয়াছে [২য় অনুচ্ছেদ] সেগুলি অবশ্য সবই ভাবলোকে ক্রিয়া করে—অর্থাৎ সেগুলি সবই অধিসৌধের ব্যাপার (superstructural)—জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, ভৌগোলিক আবিষ্কার,

শিল্প-সাহিত্য সব কিছুই মনোজগতের সামগ্রী। কিন্তু মনোজগৎ নিরবলম্ব নহে—সে শূন্যের মধ্যে ক্রিয়া করিতে পারে না। সমাজদেহের অর্থনৈতিক বনিয়াদে কোনো **মৌলিক** পরিবর্তন না ঘটিলে ভাবলোকেও কোনো **মৌলিক** রূপান্তর ঘটে না। ইহার অর্থ এই নহে যে, অর্থনৈতিক জীবনের পরিবর্তন দিয়াই মনোলোকের সকল পরিবর্তন ব্যাখ্যা করা যায় বা, অর্থনৈতিক পরিবর্তন না হইলে ভাবলোকে কোনো পরিবর্তনই হয় না। কিন্তু মনোজগতের কোনো মৌলিক রূপান্তর, সমাজের জীবন-ধারায় কোনো বুনিয়াদী পরিবর্তন না আসিলে, ঘটে না; এবং এই বুনিয়াদী পরিবর্তন অর্থনৈতিক, কেননা সমাজ-জীবনের ভিত্তিই হইল অর্থনীতি বা ধনোৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা। অষ্টাদশ শতকের শেষে এবং উনবিংশের প্রথমে শিল্পবিপ্লব না ঘটিলে যেমন রোমান্টিক ভাবধারা আসিত না, পরিপুষ্ট হইত না ফরাসী বিপ্লব (যে বিপ্লবেরও মূলীভূত কারণ অর্থনৈতিক বনিয়াদের পরিবর্তনের সূচনা) না ঘটিলে, তেমনি রেনেসাঁও আসিত না, শুধু ইংলণ্ডে নহে ইউরোপের অন্যান্য দেশেও, যদি সমাজ-জীবনের অর্থনীতির মূলীভূত পরিবর্তন না ঘটিত। অর্থনীতির ভাষায় বলিতে গেলে ইংলণ্ডে রেনেসাঁ যুগে চৈতন্যলোকে যে বন্যা আসিয়াছিল, তাহার ভিত্তিমূলে ছিল পুরাতন সামন্ততন্ত্রের দ্রুত বিলোপ ও নূতন ধনতন্ত্রের উদ্ভব। অবশ্য এই পরিবর্তনের সূচনা হইয়াছে অনেক আগে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই: "The thirteenth century in England is marked by a general transformation of feudalism leading ultimately to its decline and the growth of a capitalist agriculture."[৮]

এই রূপান্তরের পর্যায়গুলি নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিগুলি হইতেই স্পষ্ট: "As the towns grew in size, craft guilds came into being, in addition to, and sometimes in opposition to the Merchant guilds. ...These guilds, like the first trade unions, were discouraged and often forced to work secretly. Besides the skilled craftsmen, covered by the guild organisation, the larger towns soon attracted a floating population of escaped serfs and others who formed a submerged class of unskilled and irregularly employed labourers".[৯] **ইহারই ফলে সৃষ্ট হইল ক্রয়যোগ্য শ্রমশক্তি—অর্থাৎ দিনমজুর। এই দিনমজুরের আবির্ভাব না হইলে ধনতন্ত্র আবির্ভূত হইতে পারে না।** "It

was in the form of merchant capital that the first great accumulation of bourgeois property took place. The first and most important field that merchant capital found for its operations in England was the wool trade.·· More important was the monopoly position of England as a wool-growing country....With the growth of the trade English exporters began to challenge their foreign rivals····The growth of trade on a national scale involved the loss of many of their exclusive privileges by the chartered towns.....The decline of feudalism and the growth of trade led to changes in the character of taxation that had most important consequences.....The decline of feudalism had created a growing differentiation between the great barons and the lesser landowners or knights.····It was during the same period that the final steps were taken which gave Parliament its modern form. At first all sections sat together as one body, and inevitably, the proceedings were dominated by the great barons. Then came a period of experiment. Sometimes there were three 'Houses'—Barons, clergy and commons. Sometimes the burgesses sat alone to legislate on matters concerning trade.....In the division the knights of the shire—representing the smaller landowners—took their places in the commons with the representatives of the town merchants.···This alliance between the merchants and the squires is the key to the growth of parliamentary power.····While in most parts of Europe the representative bodies which grew up about this time declined and in many cases disappeared with the decline of feudalism, in England the decline of feudalism only strengthened the position of the commons as the non-feudal part of parliament.····"[১০]

ইহার ফলে সমাজে যে দ্রুত পরিবর্তন আসিল তাহার মূল কথা হইল অর্থ-কৌলীন্য। সেই অর্থ-সঞ্চয়ের পথে কোনো নৈতিক বাধাই যথেষ্ট নৈতিক বলিয়া মনে হইল না। কারণ অর্থ-সঞ্চয়েচ্ছুরা ইহা বুঝিয়া লইয়াছিল যে, ন্যায় এবং সততা আর ধনবত্তা সমব্যাপক কথা নহে: "The ways to enrich are many, and most of them foul: parsimony is one of the best, and yet it is not innocent;........How happily they lived in Spain, till fire made some mountains vomit gold! and what miserable discords followed after ....If this were put down, Virtue might then be queen again....As for gold, surely the world would be much happier if there were no such thing in it. But since it is now the fountain whence all things flow, I will care for it, as I would for a pass....We magnify the wealthy man, though his parts be never so poor; the poor man we despise, be he never so well otherwise qualified. To be rich is to be three parts of the way onward to perfection. To be poor, is to be made a pavement for the tread of the full-minded man. Gold is the only coverlet of imperfections:" ১১ ইহার পরেই পিউরিটান কবি George Withers এর 'Hymn for A Merchant' হইতে উদ্ধৃতি দেওয়া যায়-

"Unless, O Lord! Thy grace Thou lend
To be my hourly guide,
In every word I do offend,
In every step I stride....
Yea, to great wealth men seldom rise
Through what they sell and buy,
Except to vend their merchandise
They sometimes cheat and lie. ১২

শুনিয়াছি আমাদের দেশের কাপালিকেরা স্বার্থ-সাধনের জন্য নরবলি দিত আর ডাকাতেরা সাফল্যের জন্য মা কালীকে ডাকিত। ইহাদের প্রার্থনার সঙ্গে বণিগ্‌দের এই প্রার্থনার কোনো মূলগত প্রভেদ নাই। এই সঙ্গে স্মরণীয় Shakespeare এর Henry IV নাটকে Sir John Falstaff এর আত্ম-

সম্মান (Honour) সম্পর্কে অপরূপ স্পষ্টভাষণ : "No, what is honour? A word. What is in that word honour? What is that honour? Air—a trim reckoning. Who hath it? He that died a wednesday. Doth he feel it? No. Doth he hear it? No. 'Tis insensible then? Yea, to the dead. But will it not live with the living? No. Why? Detraction will not suffer it. Therefore I'll none of it—honour is a mere scutcheon, and so ends my catechism," [১৩] ইহারই সম্পূর্ণ বিপরীত কোটিতে পাই "What a piece of work is a man" etc. [১৪] এই দুই কোটির মধ্যেই রেনেসাঁ-চেতনা আন্দোলিত হইয়াছে ইংলণ্ডে—একদিকে "Queen Elizabeth was impressed with his (Hawkins's) prosperous success and much gain. She wanted to be a partner to any profits in the future. So, for his second expedition, the Queen loaned a ship to *slave-trader* Hawkins. The name of the ship was *Jesus*", [১৫] অপরদিকে ইংলণ্ডের অপূর্ব সাহিত্যের বিদগ্ধা পৃষ্ঠপোষিকা রাণী এলিজাবেথ, যাঁহার স্তবগান করিয়াছেন Shakespeare কামদেবের অক্ষমতাকে বিদ্রূপ করিয়া :

"........a certain aim he took
At a fair vestal, throned by the west,
And loosed his love-shaft smartly from his bow,
As it should pierce a hundred thousand hearts.
But I might see young Cupid's fiery shaft
Quenched in the chaste beams of the watery moon
And the imperial vot'ress passed on,
In maiden meditation, fancy free". [১৬]

এই যে বিচিত্র রেনেসাঁ যাহার ভিত্তিতে রহিয়াছে অর্থ-কৌলীন্য আর সৌধ-চূড়ায় রহিয়াছে কবি আর তাহার মহৎ কবি-ধর্ম (Sir Philip Sidneyর Apology for Poetry-তে যাহার জয়গান), সেই যুগের মানুষের চেতনার বিস্তার ও গভীরতা, উচ্চাশা ও অর্থগৃধ্নুতা, নিষ্ঠুরতা ও ঔদার্য, প্রেম ও কুটিলতা, একনিষ্ঠতা ও বহুবল্লভতা—এই জটিল ভাবলোক প্রথম অনুচ্ছেদে বর্ণিত যুগমানসের পরিবর্তনের অনুসিদ্ধান্ত হিসাবেই গৃহীত হইতে পারে।

সামন্ততন্ত্রে ভূমিদাস (serf এবং villein) প্রভুদত্ত ভূমিখণ্ডের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বাঁধনে বদ্ধ একটি জীবমাত্র ছিল। জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই তাহার স্বাধীনতার বালাই ছিল না। নিজের ক্ষেতে খাটিতে ও প্রভুর ক্ষেতে বেগার খাটিতেই তাহার সকল সময় কাটিত ; নিজেকে মানুষ করিয়া তুলিবার কোনো অবকাশ বা অধিকার তাহার ছিল না। ব্যক্তিস্বাধীনতা পদার্থটিই নীচের তলার এই অসংখ্য মানুষের অগোচরে ছিল। সামন্তরাজ (feudal chief) হইতে আরম্ভ করিয়া নাইট, জেণ্টল্‌মেন, ইওমেন, স্কোয়ার, সার্ফ, ভিলিন প্রভৃতি স্তর-স্তরান্তরে বিভক্ত এই সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপীয় সমাজে ব্যক্তির অধিকারের কোনো তাত্ত্বিক স্বীকৃতিই ছিল না। অপরদিকে ব্যক্তির ও সমাজের চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল চার্চের রাজত্ব। সেই ক্যাথলিক চার্চের অপকর্মের ও দুর্নীতিপরায়ণতার অন্ত ছিল না, কিন্তু তাহাকে ক্ষমতায় আসীন না রাখিলে চার্চের বিরাট জমিদারী ও পোপের সাম্রাজ্য থাকে না। অতএব আদিম পাপ (original sin) এবং স্ত্রীলোক যে নরকের দ্বার (অর্থাৎ বিশেষ করিয়া পুরুষের মনে) অতএব জীব হিসাবেও নিকৃষ্ট এবং শুধু অগণিত সংখ্যায় উপভোগেরই সামগ্রী, ইহা মধ্যযুগীয় ধর্মনীতি। নরনারীর সম্পর্কের ব্যাপারে একনিষ্ঠতা মধ্যযুগে প্রায় একেবারেই অজ্ঞাত এবং জোর করিয়া মেয়েদের উপর পুরুষ ইহা চাপাইলেও পুরুষদের পক্ষে ঐ আদর্শ যে একান্ত অপ্রয়োজনীয় তাহা সেকালের chivalryতে বিশ্বাসী নাইটদের, **মুখে** নারীকে সম্মান আর **কার্যে** পরস্ত্রীভোগ, হইতেই প্রমাণিত হয়। "Love, in its chivalrous sense, was largely Platonic ; as a rule, only a Virgin or another man's wife could be the chosen object of chivalrous love." [১৭] [নিজের স্ত্রীকে বাদ দিবার অর্থ কি ? তিনি অপরের Lady of the Heart হইতে পারেন কিন্তু নিজের স্বামীর নহে।] কিন্তু এই সংজ্ঞা হইতেই বুঝিতে কষ্ট হয় না ইহা কতখানি Platonic এবং Platonic হইলেও তাহার মধ্যে একনিষ্ঠতার তত্ত্বের ও উচ্চ আদর্শের নামগন্ধ নাই। Platonic যে উহা একেবারেই ছিল না, ব্যক্তিভিত্তিক পারস্পরিক আকর্ষণই যে উহার মূলে ছিল তাহা Engels সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন : And the first form of sex love that historically emerges as a passion in which any person (at least of the ruling classes) has a right to indulge, as the highest form of the sexual impulse—which is precisely its specific feature—this its first form

viz., the chivalrous love of the Middle Ages, *was by no means conjugal love.* On the contrary in its classical form, among the Provencals, it steers under full sail towards adultery, the praises of which are sung by their poets. The *'Albas'* (Songs of the Dawn) are the flower of Provencal love poetry. They describe in glowing colours how the knight lies with his love—the wife of another—while the watchman stands guard outside calling him at the first faint streaks of dawn (alba) so that he may escape unobserved........There is still a wide gulf between this kind of love, which aimed at breaking up matrimony and the *love* destined to be its foundation, a gulf never completely bridged by the age of chivalry. [১৮] এবং মধ্যযুগে বিবাহ সম্পর্কে Engels বলিতেছেন: "As a rule the bride of a young prince is selected by his parents ; if these are no longer alive, he chooses her himself with the counsel of his highest vassal chiefs, whose word carries weight in all cases. Nor can it be otherwise. For the knight, or baron, just as for the prince himself, marriage is a political act, an opportunity for the extension of power through new alliances : the interests of the *House* and not individual inclination are the decisive factor. How can love here hope to have the last word regarding marriage ?........Up to the end of the Middle Ages, therefore, marriage, in the overwhelming majority of cases, remained what it had been from the commencement, an affair that was not decided by the two principal parties........The idea that the mutual inclinations of the principal parties should be the over-riding reason for matrimony had been unheard of in the practice of the ruling classes from the very beginning. Such things took place, at best, in romance only, or among the oppressed classes, which did not count." [১৯] এই প্রথাকেই

রেনেসাঁর মুখপাত্র Shakespeare ব্যঙ্গ করিয়াছেন তাঁহার নাটকে : পিতা নিজের নির্বাচিত পাত্রকে বিবাহ করিতে বলায় নূতন যুগের মেয়ে Hermia বলিতেছে :

"I would my father looked but with my eyes"[২০]

এবং পরে Hermiaর প্রেমপাত্র Lysander,

Hermiaর পিতার প্রিয়পাত্র Demetriusকে, বলিতেছে :

"You have her father's love, Demetrius,

Let me have Hermia's. *Do you marry him*"[২০]

নরনারীর সম্পর্কের এই পরিবর্তন, তাহাদের একনিষ্ঠ প্রেমের অধিকারকে স্বীকার করার অর্থই হইল নারীর ব্যক্তিহিসাবে মূল্য স্বীকার করা, নরনারীর পরস্পরকে বাছিয়া লইবার অধিকারকে স্বীকার করা, অন্তত প্রেমের ক্ষেত্রে নারীর ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্বীকার করা। Opheliaর এই ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে গ্রহণ করিবার অক্ষমতাই Hamlet এর ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইয়াছিল। সত্য বলিতে কি Hamletই Shakespeare এর হাতে আধুনিক যুগের মহৎ সম্ভাবনায় উজ্জ্বল মানুষের প্রথম সার্থক রূপায়ণ। কিন্তু Hamlet tragic নাটক। নূতন মানবতাবাদের নীতিবোধে উজ্জ্বল, সুন্দরতর ঐহিক জীবনের সম্ভাবনাময়, কোনো ব্যক্তিত্ব যখন দেখে যে পুরাতনের মুষ্টি তখনও সমাজ-মানসে প্রবল, তখন সেই ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মূমূর্ষু অথচ দৃঢ়মূল সেই পুরাতন সামাজিক শক্তিগুলির বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। ব্যক্তির মনে সেই সংঘাত, যুগের আগে আগাইয়া-চলা মানুষের সঙ্গে নূতন বিমুখ মানুষের [পুরাতন জীবন-ধারায় আস্থাবান মানুষের] বিরোধ হিসাবেই প্রতিভাত হয়। সেই বিরোধে আগাইয়া-চলা মানুষের নাশও অবশ্যম্ভাবী, কেন না প্রগতি তখনও সমাজের বৃহত্তর শক্তি হইয়া উঠে নাই—শুধু চেষ্টা করিতেছে মাত্র। তাই হ্যামলেটের উক্তিই হ্যামলেট ট্র্যাজেডির মূল সূত্র ধরাইয়া দিতেছে :

"The time is out of joint: o cursed spite,

That ever I was born to set it right."[২১]

ব্যক্তি এখানে তাহার দায়িত্ব স্বীকার করিতেছে কিন্তু সেই দায়িত্ব পালন করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ইহাই আসল tragic motif। রেনেসাঁ যুগ যে সমস্ত সম্ভাবনার সৃষ্টি করিল সেগুলি পূর্ণ হইবার বাস্তব অবস্থা তখনও আসিল না; কিন্তু মানুষের মন হইয়া উঠিল অধীর। অন্য পক্ষে সমস্ত সম্ভাবনাগুলি সার্থক হইবার অবস্থা সৃষ্ট হইবার আগেই সমাজের অর্থনৈতিক গতি এমন খাতে প্রবাহিত হইতে শুরু করিল যে, আবার আসিয়া জুটিল

নূতন সমস্যা এবং সেগুলি পুরাতন সমস্যাগুলির সঙ্গে একীভূত হইয়া সৃষ্টি করিল জটিল হইতে জটিলতর পরিস্থিতির। Sir Thomas More Utopia (১৫১৬ খ্রীঃ লাতিনে লেখা, অনূদিত হয় প্রায় ৫০ বৎসর পরে)-তে যে সাম্যের জয়গান করিলেন তাহা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবার আগেই শুরু হইল Colonia -lism (উপনিবেশ-বাদ) এবং Capilalism (ধনতন্ত্রের) এর শোষণ ও অসাম্য। অন্যদিকে Reformation এর গোঁড়ামি রেনেসাঁর মুক্ত বিহঙ্গের পাখা দিল বাঁধিয়া। Grierson বলিতেছেন : "The conflict between the spirit or temper of the Renaissance and that of the Reformation, seen in its full power in the fanaticism of English Puritanism, had affected our literature in a deeper and more complex manner than our histories always made quite clear ; it had, as I thought, limited the range and fulness of Shakespeare's dramatic achievement."[২২] কিন্তু আবার এ কথাও ভুলিলে চলিবে না যে, সামন্তবাদের নিগড় ভাঙিতে গিয়াই উদীয়মান ধনতন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছিল এই নূতন মানবতাবাদের, নূতন ব্যক্তি-স্বাধীনতার, একনিষ্ঠ প্রেমের, এবং অশ্রুতপূর্ব ঐহিকতাবাদের (secularism)। Original sin এর ভার হইতে মানবাত্মা মুক্ত হইল ; মুক্ত হইল কুসংস্কারাত্মক ধর্মের নাগপাশ হইতে ; নারী নরকের দ্বার হইবার বদলে হইল :

"It is the East, and Juliet is the sun.....
It is my lady, O it is my love....
The brightness of her cheek would shame those stars,
As day light doth a lamp........
See how she leans her cheek upon her hand.
O that I were a glove upon that hand.
That I might touch that cheek."[২৩]

একনিষ্ঠতা হইল প্রেমের নিরিখ ; আচারের বদলে বিচার, সংস্কারের বদলে যুক্তি, বিশ্বাসের স্থলে বিজ্ঞান আর আনুগত্যের (feudal loyalty) বদলে আসিল স্বাধীন সর্ত (free contract)। এ সবই যে পুরাপুরি আসিয়া গেল তাহা নহে কিন্তু আসিতে থাকিল।

ইহাই হইল ইংলণ্ডের রেনেসাঁ—তাহার ভিত্তি হইল সামন্ততন্ত্রের ভগ্ন দুর্গের উপর ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা আর জাতীয় স্বাধীনতার বনিয়াদে জাতীয়-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা।

[আজকাল অনেক পণ্ডিত যথা Arnold Hauser [২৪], রেনেসাঁকে ইতিহাসের একটি স্তর বলিয়া স্বীকার করেন না ; বলেন যে, ইহা শিল্প-সৃষ্টির একটি যুগবিভাগ মাত্র। কিন্তু এই মতবাদীরা কোনো সম্পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশ করেন নাই এবং যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে এইটুকুই প্রমাণিত হয় যে, রেনেসাঁ যুগেও মধ্যযুগীয় চেতনা প্রচুর পরিমাণে ছিল এবং অনেক জিনিষ যাহা রেনেসাঁ যুগেরই বৈশিষ্ট্য বলিয়া স্বীকার করা হয় তাহা মধ্যযুগেই শুরু হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম যুক্তিটি সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিতে মোটেই তাত্ত্বিক ব্যতিক্রম প্রতিষ্ঠা করে না আর দ্বিতীয়টিও আপাত—দৃষ্টিতে কিছুই প্রতিষ্ঠা করে না এইজন্য যে, সামাজিক পরিবর্তনের যুগবিভাগ কখনও ব্যক্তির জন্ম-মৃত্যুর তারিখের মত যথাযথ হইতে পারে না। তৃতীয়ত এই সমালোচকেরা কেহই রেনেসাঁকে সামন্ততন্ত্রের অবসান ও নূতন জাতীয়তাবাদী গণতন্ত্রের আবির্ভাব হিসাবে দেখেন নাই। অতএব আমরা এক্ষেত্রে Symonds[২৫] এবং Burckhardt[২৬] এর নব জাগরণের মতকেই অনুসরণ করিয়াছি।]

(খ)

বাংলাদেশে যে নবজাগৃতি আসিল উনিশ শতকের মাঝামাঝি, যাহার জন্মকাল শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে '১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত,' [২৭] যাহা 'প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষণ ও ঘোর সামাজিক বিপ্লবের সূচনা' [২৮], তাহা কিন্তু ঘটিয়াছিল, পরাধীন বাংলায় শুধু নয়, পরাধীন ভারতবর্ষে, এবং বাংলাদেশ তাহার স্বাধীনতা হারাইবার প্রায় একশত বৎসর পরেই বলা চলে। ইংলণ্ডীয় রেনেসাঁর সঙ্গে এইখানেই বাংলার নবজাগৃতির মূল এবং সর্বপ্রধান পার্থক্য। দ্বিতীয়ত ইংলণ্ডে এই রেনেসাঁর অর্থনৈতিক বনিয়াদ হইল তাহার ক্রম-বিস্তারশীল বহির্বাণিজ্য ও সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ এবং তাহার আনুষঙ্গিক হিসাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর (বণিক্ বা ব্যবসাদার) উদ্ভব। বাংলাদেশে এবং সারা ভারতেও ব্রিটিশ প্রভুরা সামন্ততন্ত্রকেই মূলত বজায় রাখিয়াছিলেন এবং ভারতের বহির্বাণিজ্য ইংরেজের আমলে কখনই বিস্তার লাভ করে নাই। অর্থাৎ জীবনের বাস্তবক্ষেত্রে স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা যতপ্রকারে নিজের সার্থকতা খুঁজিয়া পাইতে পারে তাহার সমস্ত পথই এই দেশে বন্ধ ছিল। ইংরাজ তাহার উপর প্রথম প্রথম আসিয়া যত প্রকারে পারে ভারতবর্ষের ধন লুণ্ঠনই করিয়াছে দ্বিধাহীন চিত্তে। এখান হইতে যাহা পার লইয়া যাও ইহাই ছিল অভিযাত্রী ইংরাজের একমাত্র উদ্দেশ্য। ওয়ারেণ হেষ্টিংস যে পার্লামেণ্টের কাছে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহা কোনো কোনো মহদাশয়

ইংরাজের মহত্ত্বের পরিচায়ক হইতে পারে কিন্তু তিনি যে নির্দোষ প্রমাণিত হইয়াছিলেন ইহাই ভারতীয়ের পক্ষে মনে রাখিবার মত কথা এবং এই কথা অনুধাবন করিয়া মনে রাখিবার কথা যে, হেষ্টিংস ভারতে যাহা করিয়াছেন ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট তাহাকেই ভারতে ইংরেজের কর্তব্য বলিয়া নির্ধারিত করিয়াছিল। শুধু যে হেষ্টিংস, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে উজাড়-হইয়া-যাওয়া বাংলাদেশ হইতে বহুগুণ বেশী রাজস্ব আদায় করিয়াছিলেন তাহা নহে, এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েও ব্রিটিশেরই প্রয়োজনে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে এই বাংলাদেশেই লক্ষ লক্ষ মানুষ মরিয়াছে। বাংলাদেশের এবং পরে সারা ভারতের ক্রমান্বয়ে এই দুর্দশার জন্য ইংরাজই যে দায়ী তাহা ইংরাজেরা নিজেরাই স্বীকার করিয়াছে। ক্লাইব নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহারা যখন এই দেশে প্রথম আসেন তখন বাংলা ছিল 'inexhaustible riches'[২৯] এর দেশ। এই দেশেও ইংরাজ আসিবার আগে স্বেচ্ছাতন্ত্রই ছিল কিন্তু তাহার সম্বন্ধে Macaulay র উক্তি স্মরণীয়ঃ "They had been accustomed to live under tyranny, but never under tyranny like this. They found the little finger of the Company thicker than the loins of Surajah Dowlah. Under their old master they had at least one resource; when the evil became insupportable, the people rose and pulled down the government. But the English government was not to be shaken off. That government, oppressive as the most oppressive form of barbarian despotism, was strong with all the strength of civilisation."[৩০] এবং ক্লাইব নিজে বলিয়াছেন : "I can only say that such a scene of anarchy, corruption, and extortion was never seen or heard of in any country but Bengal.......under the absolute management of the Company's servants"[৩১]। কিছু পরে Lord Cornwallis মন্তব্য করিতেছেন : "I am sorry to be obliged to say that agriculture and commerce have for many years been gradually declining; and that at present, excepting the class of Shroffs and Banyans, who reside almost entirely in great towns, the inhabitants of these provinces were advancing hastily to a general state of poverty and wretchedness. In this description I must even include almost

every Zamindar in the Company's territories ;" ৩২। ইহার পর ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হেষ্টিংস্-এর minuteএ নিম্নোক্ত মন্তব্য এবং তাহার উপর দাদাভাই নওরোজীর মন্তব্য পড়িলেই বুঝা যায়•ইংরাজ শাসনের কোনও সুফলই এদেশে তখনও পর্যন্ত ফলিতেছিল না : "A new progeny has grown up under our hand ; and the principal features which show themselves in a generation thus formed beneath the shade of our regulations . are a spirit of litigation which our judicial establishments cannot meet and a morality certainly deteriorated. If in the system, or the practical execution of it, we should be found to have relaxed many ties of moral or religious restraint, or the conduct of individuals to have destroyed the influence of former institutions without substituting any check in their place—to have given loose to the most forward passions of human nature, and deprived the wholesome contact of public opinion and private censure, we shall be forced to acknowledge that our regulations have been productive of a state of things which imperiously, calls on us to provide an immediate remedy for so serious a mischief."

'This was the judgment of a governor-general upon the effect produced by our judicial regulation upon the character of the people ; and with respect to the protection of person and property, we have it stated upon competent authority, that it is at this moment just as it has been for the last fifty years, viz., so bad that no men of property within a circle of sixty or seventy miles round Calcutta "can retire to rest with the certainty that he shall not be robbed of it again before morning" ; and yet, with all this evidence before us, evidence that, notwithstanding our best intention, "our administration," as the Governor-General Lord W.

Bentinck admitted, "had in all its branches, revenue, judicial, and police, been a failure." We boast of progress —of Indian progress!'[৩৩] ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম দিকের এই প্রকৃতি সম্পর্কে Sir Thomas Munroর মন্তব্য দিয়াই আমরা এ প্রসঙ্গের শেষ করি: "It would be more desirable that we should be expelled from the country altogether, than that the result of our system of government should be such an abasement of a whole people." [৩৪]

অতএব এ কথা স্পষ্ট যে, ১৮২৫ খ্রীঃ পর্যন্ত বাঙালীর জীবনে সরকারী প্রচেষ্টায় এমন কোনও পরিবর্তন ঘটে নাই যাহাকে ইংরাজ শাসনের সুফল বলা চলে। বাঙালীর জীবনে রেনেসাঁর সূত্রপাত তখনও হয় নাই। বরং যে ধারায় জীবন ব্রিটিশের আসার আগেই চলিতেছিল তাহার ক্রমান্বয়ে অধোগতিই ঘটিতেছিল; শুধু সুখে ছিল কয়েকজন মুৎসুদ্দি, বেনিয়ান, এ কথা লর্ড কর্ণওয়ালিসের পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্যেই উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রিটিশ রাজত্বের এই রূপকেই মার্কস বলিয়াছেন ভাঙনের রূপ—কৃষিভিত্তিক স্বয়ং-সম্পূর্ণ ভারতীয় গ্রাম-সমাজের অতি দ্রুত ধ্বংস-সাধন কিন্তু তাহার শূন্য স্থানে প্রগতিশীল কোন সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া না তোলা। [৩৪ক]। এমন কি ১৮১৩ খ্রীঃ যখন কোম্পানীর সনদে পুনর্মঞ্জুরী দান করা হয় তখন ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কোম্পানীকে যে নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, এক লক্ষ টাকা আলাদা করিয়া রাখিতে হইবে 'for the revival and improvement of literature and the encouragement of the learned natives of India and for the introduction and promotion of knowledge of the sciences among the inhabitants of British territories in India."[৩৫] সে নির্দেশও পালন করা হয় নাই প্রায় ১০ বৎসর, এবং যখন পালন করা হইল তখনও শুধু পুরাকালীয় ধরণে সংস্কৃত ও ফারসী লেখা-পড়ার পুনরুজ্জীবনের জন্য। (সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করা হয় ১৮২৪ খ্রীঃ)। ১৮৩৩এর সনদে ছিল "no native of the said territories, nor any natural-born subject of His Majesty resident therein, shall, by reason only of his religion, place of birth, descent, colour or any of them, be disabled from holding any place or employment under the said Company ;[৩৬] এই প্রতিশ্রুতি কি করিয়া পালন করা হইতেছিল সে সম্পর্কে

লর্ড লিটনের নিম্নলিখিত বক্তব্য পাপের স্বীকৃতি হিসাবেই স্মরণীয়: "No sooner was the Act (1833) passed than the Government began to devise means for practically evading the fulfilment of it.....I do not hesitate to say that both the Governments of England and of India appear to me up to the present moment unable to answer satisfactorily the charge of having taken every means in their power of breaking to the heart the words of promise they had uttered to the ear."৩৭

এই লুণ্ঠন, বঞ্চনা ও অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া হিসাবে জাগিতে পারিত জাতির ক্রোধ কিন্তু সেই ঘনিষ্ঠ জাতীয়তা-বোধ তখনও বাঙালীর জাগে নাই ; তাই ইতস্তত অশান্তি এবং তখনও পর্যন্ত ব্রিটিশের কাছে নতি স্বীকার করে নাই এমন সব ছোট ছোট রাজ্যের পুনরাত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষণ-ক্ষণান্তরে চেষ্টা সত্ত্বেও, কোন সামগ্রিক প্রতিক্রিয়ায় ইংরাজ ক্ষমতাচ্যুত হইয়া ভারত হইতে বিতাড়িত হয় নাই ; বরং প্রত্যেকটি বিক্ষোভ ইংরাজকে সতর্ক হইতে সতর্কতর করিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত ১৮৫৮ সালে কোম্পানীর গোষ্ঠীগত লুণ্ঠন সমগ্র ব্রিটিশ শোষক শ্রেণীর লুণ্ঠনে পরিণত হইয়াছে মহারাণীর শাসনভার-গ্রহণের নামে।

কিন্তু যেমন চীনে তেমনি ভারতবর্ষে, ইংরাজ তাহার লুণ্ঠনকেই সুসম্পন্ন করিবার জন্য এমন কতকগুলি পরিবর্তন বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে সাধন করিতে বাধ্য হইয়াছিল, যে গুলির মধ্যে ছিল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা। অবশ্য ইংরাজ থাকিতে সেই সম্ভাবনাগুলি যে সার্থক হইবে তাহা নয়, কিন্তু ইংরাজের বজ্রমুষ্টি শিথিল হইলে সেই সম্ভাবনাগুলি পরিপূর্ণতা পাইতে পারে। এই জন্যই ভারতবর্ষে আগত ইংরাজকে ঐতিহাসিক 'unconscious tool of history' ৩৮ আখ্যা দিয়াছেন। এই পরিবর্তনগুলির মধ্যেই নিহিত আছে বাংলাদেশে উনবিংশ শতকে রেনেসাঁর মূল উৎসটি। ইহার জন্য একটুও গৌরব ইংরাজের প্রাপ্য নহে—প্রাপ্য সেই বাঙালীর যে বাস্তব জীবনে পদে পদে ব্যাহত হইয়াও মানস জীবনে এই সোনার ফসল ফলাইয়া গিয়াছে এবং সেই ফসল প্রথম যিনি দুই হাতের অঞ্জলি ভরিয়া ভরিয়া ভাণ্ডারে তুলিয়াছেন তিনি মধুসূদন দত্ত।

এই পরিবর্তনগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম হইল বাংলার গ্রাম্য, স্বয়ং-সম্পূর্ণ অর্থনীতির পুরাপুরি ধ্বংস-সাধন এবং বাংলার ও পরে ভারতবর্ষের

গ্রামগুলিকে ইংরাজের ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির লেজুড়ে পরিণত করিয়া তাহাদের দ্বার নির্মম হস্তে ইংরাজ বণিকের সামনে খুলিয়া ধরা। ইংরাজের চড়া দরে পণ্য বেচিবার ও কাঁচা মাল সস্তা দরে কিনিবার কেন্দ্র হইল এই গ্রামগুলি। অবশ্য এই গ্রামগুলি যে কোনো মহৎ জীবনযাত্রার আদর্শ ছিল তাহা নহে। জাতিভেদে খণ্ডিত, কূপমণ্ডুক, অদৃষ্টের উপরে সম্পূর্ণ আস্থাশীল, অত্যাচারী রাজা-বাদশাদের সহজ লুণ্ঠনের ক্ষেত্র এই গ্রামগুলি যে প্রাণচঞ্চল, প্রসারশীল, সৃষ্টিশীল, কর্মমুখর ছিল এ কথা কোনক্রমেই বলা চলে না। অবশ্য ভারতের এই গ্রামজীবনের স্বয়ং-সম্পূর্ণতা লইয়া উচ্ছ্বাস অনেকেই করিয়াছেন—এমন কি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত (শরৎচন্দ্র অবশ্য করেন নাই)। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রাম-গুলিকে তানপুরার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন—যাহার চারটি তারে নাকি সব সুরই ধ্বনিত হইতে পারে। কিন্তু সেই গ্রামের তানপুরাগুলিতে সুর কি আর আদৌ বাজিত? হয়ত মানুষ কিছু ভালো খাইতে পরিতে পাইত, কিন্তু জীবনকে আরও ঐশ্বর্যবান, আরও সুন্দর করিবার জন্য তাহার ক্রিয়া কি বহুদিন আগেই বন্ধ হইয়া যায় নাই? সেই গ্রাম কি সৃষ্টিশীলতা হারায় নাই? দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ললিত কলা—কোন্ ক্ষেত্রে সে নূতন কিছু যোজনা করিতেছিল? তাহার স্বয়ং-সম্পূর্ণতা কূপের মধ্যে মণ্ডুকের স্বয়ং-সম্পূর্ণতা। সামন্ততান্ত্রিক এই গ্রামজীবনের সত্য প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়াছেন Karl Marx। এ বিশ্লেষণ আমাদের ভাবপ্রবণ মনে আঘাত দিতে পারে, কিন্তু এই বিশ্লেষণও আমাদের গ্রামজীবনের স্বয়ং-সম্পূর্ণতার তত্ত্ব মানিয়া লইয়াই তাহার অন্তর্নিহিত গোষ্পদ-মণ্ডুকতা ও সৃষ্টি-প্রেরণাহীন দিনযাপনের গ্লানি প্রদর্শন করিয়াছে: "Those small and extremely ancient Indian communities, some of which have continued down to this day, are based on possession in common of the land, on the blending of agriculture and handicrafts, and on an unalterable division of labour, which serves, whenever a new community is started, as a plan and scheme ready cut and dried. Occupying areas of from 100 up to several thousand acres, each forms a compact whole producing all that it requires. The chief part of the products is destined for direct use by the community it-self, and does not take the form of a commodity. Hence, production here is independent of that division of labour

brought about, in Indian society as a whole, by means of the exchange of commodities.....

"The constitution of these ancient communities varies in different parts of India. In those of the simplest form the land is tilled in common and the produce divided among the members. At the same time, spinning and weaving are carried on in each family as subsidiary industries. Side by side with the masses thus occupied with one and the same work, we find the 'chief inhabitant', who is judge, police and tax-gatherer in one; the book-keeper who keeps the accounts of the village and registers everything relating thereto; another official, who prosecutes, protects strangers travelling through, and escorts them to the next village; the boundary man, who guards the boundaries against neighbouring communities; the water-overseer who distributes the water from the common tanks for irrigation; the Brahmin who conducts the religious services; the schoolmaster, who on the sand teaches the children reading and writing; the calendar Brahmin or astrologer, who makes known the lucky or unlucky days for seedtime and harvest, and for every other kind of agricultural work; a smith and a carpenter, who make and repair all the agricultural implements; the potter who makes all the pottery of the village; the barber, the washer-man, who washes clothes, the silversmith, here and there the poet, who in some communities replaces the silversmith in others the schoolmaster. This dozen of individuals is maintained at the expense of the whole community. If the population increased, a new community is founded, on the pattern of the old one....

"The simplicity of the organisation for produc-

tion in these self-sufficing communities that constantly reproduce themselves in the same form, and when accidentally destroyed, spring up again, on the spot and with the same name—this simplicity supplies the key to the secret of *the unchangeableness of Asiatic societies, an unchangeableness in such striking contrast with* the constant dissolution and refounding of Asiatic States, and the never-ceasing changes of dynasty. The structure of the economical elements of society remains untouched by the storm-clouds of the political sky"[৩৯]। এই সামাজিক ব্যবস্থায় কি প্রকারের মানুষ আর ভাবলোক তৈয়ারী হইতেছিল সে সম্পর্কে Marx বলিতেছেন: "....*these idyllic* village communities, inoffensive though they may appear, had always been the solid foundation of oriental despotism,....they restrained the human mind within the smallest possible compass, making it the *unresisting tool of superstition, enslaving it beneath traditional rules, depriving it of all grandeur and historical energies.* We must not forget the barbarian *egotism* which, concentrating on some miserable patch of land, had quietly witnessed the ruin of empires, the perpetration of unspeakable cruelties, the massacre of the population of large towns with no other consideration bestowed upon them than on natural events, itself the helpless prey of any aggressor who deigned to notice it at all. We must not forget that this *undignified, stagnatory aud vegetative life,* that this *passive sort of existence* evoked on the other part, in contradistinction, wild, unbounded forces of destruction and rendered murder .itself a religious site in Hindustan. We must not forget that these little communities were contaminated by distinctions of caste and by slavery, that they *subjugated* man to external circumstances, instead of

elevating man the sovereign of circumstances, that they transformed a *self-developing social state* into *a never-changing natural destiny*, and thus brought about a brutalising worship of nature, fell down on his knees in adoration of Hanuman, the monkey, and Sabala, the cow."[৪০]

কিন্তু ব্রিটিশের অশুভ আবির্ভাবে এই গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তন কোন্ দিকে চলিতেছিল তাহাও মার্কস অনুধাবন করিয়াছেন: "These small stereotype forms of social organism have been to the greater part dissolved, and are disappearing, not so much through the brutal interference of the British tax-gatherer and the British soldier, as to the working of English steam and English free trade. Those family communities were based on domestic industry, in that peculiar combination of hand-weaving, hand-spinning and hand-tilling agriculture which gave them self-supporting power. English interference having placed the spinner in Lancashire and the weaver in Bengal, (on a par) or sweeping away both Hindu spinner and weaver, dissolved these small semi-barbarian, semi-civilised communities, by blowing up their economical basis and thus produced the greatest, and to speak the truth, the only **Social Revolution** ever heard of in Asia."[৪০] এই সামাজিক বিপ্লবের মূল কথা হইল, ইংলণ্ডের এবং তাহার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের ধনতান্ত্রিক বাজারের সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক পশ্চাৎপদ ভারতের গ্রামগুলিকে বাঁধিয়া দেওয়া। কিন্তু বিশ্বের বাজারে নিজের পণ্য ভারত তখন কি বিক্রয় করিবে? তাহার না আছে কলকারখানা, না আছে যন্ত্রোৎপাদিত পণ্য। সে কোনো রকমে এ পর্যন্ত, কড়ি দিয়া কিনিয়াছে আর কড়ি দিয়া বেচিয়াছে; তাহার ঢেঁকিতে কোটা চাল আর হাত-তাঁতে বোনা কাপড়—তাহাও শুধু, যাহারা কুটিতে ও বুনিতে পারে না তাহাদের কাছেই। সে নিজের দৈন্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ ছিল এমন এক জগতে যে জগৎ দ্রুতগতিতে আগাইয়া চলিয়াছে ধন-তান্ত্রিক গণতন্ত্রের দিকে। আবার এই অগ্রগতিও ঘটিতেছে এশিয়াতে নহে,

ইউরোপে। ফলে ভারতবর্ষ বিক্রয় করিতে পারিল না, কিনিতে লাগিল ; চড়া দরে খেলো জিনিষই শুধু কিনিতে লাগিল না, তাহার হস্তচালিত শিল্পগুলিও জলাঞ্জলি দিল। এদিকে সে বেচিল বটে কিন্তু বেচিল তাহার নিজেরই গৃহনির্মাণের সামগ্রী। বেচিল সস্তায় কিনিল আক্রায়—ইহাই সে মোটামুটি করিয়া আসিয়াছে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত।

ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র যে গ্রাম সেই গ্রাম মরিল ; গ্রাম্য ও কৃষি-প্রধান জীবনকে কেন্দ্র করিয়া যে কৃষ্টি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা মরিল ; যে ভূস্বামী এই কৃষ্টির পৃষ্ঠপোষক ছিল সে মরিল ; আর গ্রামীণ ভদ্রলোকেরা কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজী শিখিয়া ইংরাজের কর্ম করিয়া নূতন জগতের পারানির কড়ি—অর্থাৎ টাকা উপার্জনে মন দিতে লাগিল। বাংলা এবং ভারতবর্ষ চাকুরি বুঝিল আর ইংরাজ তাহাদের চাকুরি দিল। তাহা হইলে বাংলাদেশে উনিশ শতকের মাঝখানে রেনেসাঁ আসিল কি করিয়া আর আনিলই বা কাহারা ?

(গ)

আনিল তাহারা, যাহারা ইংরাজী শিখিয়া চাকুরী করিতে আসিল : ডেস্কে বসিয়া চাকুরী করিল যে কলম দিয়া, সেই কলম দিয়াই লিখিল তাহার মনের কথা—হয়ত জানিয়া-শুনিয়াই যে, সে মনের কথা কাজের কথা কোনোদিন হইবে না। এই নবোদিত চাকুরীজীবী মধ্যবিত্তশ্রেণী ইংরাজের প্রয়োজনের সৃষ্টি। কিন্তু মানুষ যে বিশেষ প্রয়োজনে যে জিনিষ সৃষ্টি করে প্রয়োজন শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই বিশেষ সৃষ্টিটি শেষ না হইতেও পারে,—বিশেষ করিয়া সেই বিশেষ সৃষ্টি যদি জীবন্ত প্রাণী হয়,—এবং সে প্রাণী যদি আবার জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ হয়। তাই যে প্রয়োজনে সেই মানুষের গোষ্ঠীকে সৃষ্টি করা হয় সেই গোষ্ঠী সেই প্রয়োজনটুকুর দ্বারাই সীমিত হয় না—তাহাকে অতিক্রম করিয়া সে যাইবেই। কারণ মানুষ যন্ত্র নয় ; যাহারা তাহাকে যন্ত্র বলিয়া ভাবে এবং হাজার বাঁধনে বাঁধিয়া যন্ত্র বানাইতে চায়, তাহারা অনেক মূল্য দিয়া এই সত্যটিকে শিখে। ইংরাজ ভালোবাসিয়া ইহাদের সৃষ্টি করে নাই, করিয়াছে তাহাদের শ্রম সস্তায় কিনিবার জন্য। "From the Indian natives, reluctantly and sparingly educated at Calcutta, under English superintendence, a fresh class is springing, endowed with the requirements for Government and imbued with European science."[৪১] এই শ্রেণীর উদ্ভব, আশা-

নিরাশা ও ভুল-ভাঙার সঙ্গেই উনিশ শতকের রেনেসাঁ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মধুসূদনে এই মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর চেতনার পূর্ণ বিকাশ;—তাহার উচ্চাবচ নব-নির্মীয়মান মানস-সৈকতের। এই শ্রেণীর উদ্ভব এবং বিকাশের বিশ্লেষণ প্রয়োজন। ইহার মানসিক বিবর্তনের ইতিহাস মধুসূদনের কবি-মানসের পটভূমি—কেননা ব্যক্তিই ত সমাজ-মানসের আধার। এই শ্রেণীর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, দেশের অর্থনৈতিক সর্বনাশের মাত্রা যে কমিতেছিল তাহা নহে। রামমোহন যখন নবজীবনের সূর্যকে আবাহন করিতেছেন তখনই কিন্তু ঢাকায় তাঁতিদের হাড়ে মাঠ উর্বরা হইতেছে: "The misery hardly finds a parallel in the history of commerce. The bones of the cotton-weavers are bleaching the plains of India" (Lord Bentinck reporting in 1834-35, quoted in Marx's Capital, Vol. 1, ch. xv, sec. 5); এবং Sir Frederick John Shore ১৮৩৭ সালে লিখিতেছেন: "But the halcyon days of India are over; she has been drained of a large proportion of the wealth she once possessed, and her energies have been cramped by a sordid system of misrule to which the interests of millions have been sacrificed for the benefit of the few."[৪২]

এইজন্যই পূর্বে বলা হইয়াছে যে, বাঙালীর কিংবা ভারতীয়ের জীবনের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ভিত্তির উপর এই রেনেসাঁর মানস-সৌধ গড়িয়া উঠে নাই। কিন্তু সামগ্রিক পুনর্গঠনের কোনো লক্ষণ দেখা না গেলেও যে শ্রেণীটি শুধু ইংরাজের আগমনের ফলেই সৃষ্ট ও বর্ধিত হইতেছিল সে শ্রেণীটি ইংরাজের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইবার ফলে, এবং ইংরাজের (অর্থাৎ প্রতীচ্যের) উচ্চতর সভ্যতার ও সৃষ্টিশীল মননের ঘনিষ্ঠতম সান্নিধ্যে আসিবার ফলে, সেই নবজাত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থনৈতিক সচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মানস-লোকও নবভাবে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতেছিল। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে পড়েন প্রিন্স দ্বারকানাথ হইতে আরম্ভ করিয়া, এমন কি রাজা নবকৃষ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া 'মুচিরাম গুড়' [৪৩] পর্যন্ত; ইহাদেরই বিকৃত রূপকে বঙ্কিমচন্দ্র 'বাবু' নামে আখ্যাত করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র-কথিত এই বাবুরা অতি হেয় ও ইংরাজ-প্রসাদপ্রার্থী; সুখ ও চাকুরী-সর্বস্ব। বাবুদের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি বঙ্কিমের চিত্রে অতি নগ্ন ও চূড়ান্তরূপে প্রকট হইলেও এইগুলিই সূক্ষ্মতর রূপে ও শোভনতর বাহ্যিক প্রকাশে, জন্মকাল হইতেই এই বাবু বা মধ্যবিত্তের

বৈশিষ্ট্য। রামমোহনের বা দ্বারকানাথের বা মতিলাল শীলের অর্থ-প্রাচুর্যের পিছনের ইতিহাসই এই। কিন্তু একই ভূমিতে যেমন সুগন্ধ পুষ্পও জন্মায় আবার কাঁটা গাছও জন্মায় তেমনিই একই উনিশ শতকী ভূমিতে বিদ্যাসাগর আর বিদ্যাসাগরকে যাহারা ঠকাইয়াছিল তাহারা, রেনেসাঁর মুখপাত্র রামমোহন এবং মহাজন রামমোহন জন্মাইয়াছিলেন এবং পরিপুষ্ট হইয়াছিলেন।

এই চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত নিজের চাকুরীটুকু ছাড়া আর কিসের আশায় প্রতীচ্যের বার্তাবহ ইংরাজের আত্মিক শিষ্যত্ব স্বীকার করিল? এই চাকুরীজীবী শ্রেণীকে সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের অধিকার কায়েম করিবার জন্য আরও কতকগুলি পরিবর্তন ইংরাজ এখানে সাধন করিতেছিল এবং সেই পরিবর্তনগুলি প্রত্যক্ষভাবে ভারতের জনগণের কোনো উপকার সাধন না করিলেও পরোক্ষভাবে ভারতীয়দের ভবিষ্যৎ উন্নতির ভিত্তি স্থাপন করিতেছিল। প্রথমত ইংরাজ ত প্রাচীন স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্য অর্থনীতি ভাঙিলই, জন্ম দিল এক ভূস্বামী শ্রেণীর যাহারা কর আদায় করিতে এবং আধুনিক বিলাস-ব্যসনে দিন কাটাইতেই ব্যস্ত—গ্রামের জীবনের সঙ্গে যাহাদের যোগাযোগ নাই বলিলেই চলে; কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরাজ সৃষ্টি করিল ভূমিতে ব্যক্তিগত স্বত্ব। দান-বিক্রয়ের অধিকার সমেত ভূমিতে ব্যক্তির মালিকানা যে মুহূর্তে আসিল সেই মুহূর্তেই গ্রামের গোষ্ঠীগত জীবনের অবসান ঘটিল এবং ব্যক্তি-স্বতন্ত্র অথচ আপন ভূমিখণ্ডের উপর একান্ত নির্ভরশীল, স্বত্ব লইয়া কলহ-পরায়ণ, উচ্চাশাবিহীন, প্রেরণাহীন এক জীবনযাত্রা সুরু হইল। এই অগণ্য সাধারণ মানুষ এখনও ভারতবর্ষে প্রায় সেই একই সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থায় রহিয়াছে। কিন্তু ইহাদের মধ্যেই যাহারা আগে মুসলমান আমলে অর্থ ও প্রতিপত্তি সঞ্চয় করিয়াছিল, অথবা দুই-এর একটি; যাহারা বা ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ইংরাজের অর্থ-লুণ্ঠনে নানাভাবে সাহায্য করিয়া ঐ দুইটি পদার্থই অর্জন করিয়াছিল; যাঁহারা ছিলেন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এবং শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় আধুনিক কালে ধনাগমের উৎসটি সঠিক ধরিতে পারিয়াছিলেন—তাঁহারাই ইংরাজের নবসৃষ্ট মধ্যবিত্ত বা বাবু সম্প্রদায়ের মূল-স্বরূপ। ইহাদের সৃষ্টি করিবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলিও এই দেশে সাধন করিল:

(১) মুঘলদের আমলেও ভারতবর্ষের সমগ্র অঞ্চলের যে রাজনৈতিক ঐক্য সাধিত হয় নাই সেই রাজনৈতিক ঐক্যের প্রতিষ্ঠা। সমগ্র ভারতবর্ষের ব্রিটিশ ভারতবর্ষে রূপান্তর। সিপাহী বিদ্রোহের অবসানের সঙ্গে এই রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠাও সম্পূর্ণ হয়।

(২) স্বদেশীয় সৈন্যবাহিনীর সৃষ্টি। (অবশ্য ১৮৫৭র পরে এই নীতি পরিবর্তিত হয়)।

(৩) এশীয় সমাজে প্রথম স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্রের এবং সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা। (মাঝে মাঝেই এই স্বাধীনতা বহুধা খণ্ডিত হইয়াছে এবং ১৮৫৭ ও ১৮৭২ সালের পরে বিশেষ করিয়া)।

(৪) বাষ্পীয় পোতের সাহায্যে ইউরোপের সঙ্গে দ্রুততর এবং নিয়মিত যোগাযোগ।

(৫) ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজীর মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা। এবং তাহার ফলে, এদেশে তখন প্রয়োগের সম্ভাবনা না থাকিলেও, প্রতীচ্যের নবলব্ধ বিজ্ঞান, রাজনৈতিক গণতন্ত্রের তত্ত্ব, ব্যক্তি-স্বাধীনতাবাদ এবং ঐহিকতা (secularism) প্রভৃতির এদেশের মানস-লোকে প্রতিষ্ঠা।

(৬) টেলিগ্রাফ এবং ট্রেণ চালু হইবার ফলে আঞ্চলিক যোগাযোগের এবং তাহার প্রত্যক্ষ—সুফল নগরে-গ্রামে যোগাযোগ, মানুষে-মানুষে দৃঢ়তর সম্পর্ক স্থাপন এবং বাণিজ্যের নগর-মুখিতা ও নগর-কেন্দ্রিকতা।

(৭) ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতিষ্ঠার ফলে ব্যক্তির হাতে ধন-সঞ্চয় ও সমৃদ্ধতর ব্যক্তিজীবনের সম্ভাবনা—সমাজে ব্যক্তিহিসাবে ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা—'বাবু'-দের আবির্ভাবের ভিত্তি স্থাপন।

(৮) ইংরাজেরই নিজের প্রয়োজনে এই নব-শিক্ষিত বাবুদের সৃষ্টি হইলেও এবং ইংরাজের খোসামোদ করিয়া ইহারা অর্থোপার্জন করিলেও ইহাদের মনে যে প্রতীচ্য গণতন্ত্রের, ব্যক্তি-স্বাধীনতার ও ব্যক্তি-সাধ্য উচ্চাকাঙ্ক্ষার বীজ উপ্ত হইল তাহা ত ইংরাজের ক্ষমতা ছিল না নষ্যাৎ করে। বাস্তবজীবনে ও মানসজীবনে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হইল এইখানে এবং তাহা আজিও আমাদের সাহিত্যের মূল উপজীব্য। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সরকার করিয়াছিলেন নিজের প্রয়োজনে, রায়তের সুখের জন্য নহে। তাহারও পর হেষ্টিংস বা অন্যান্যেরা ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যাহা কিছু সংস্কারমূলক কাজে হাত দিয়াছেন তাহা নিজেদেরই স্বার্থে। কিন্তু ১৮০০ হইতে ১৮৩৫ এই কালের মধ্যে বেসরকারী ইংরাজ ও ভারতীয়ের চেষ্টায় শিক্ষা বা অন্যান্য ক্ষেত্রে যে সংস্কারগুলি সাধিত হইয়াছে, সেইগুলিই বাঙ্গালীর নবজাগরণের প্রত্যক্ষ বুনিয়াদ। অবশ্য সরকারী কার্যকলাপ পরোক্ষভাবে আমাদের কাজে লাগিয়াছে।

(ঘ)

১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস কলিকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন আর ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে যোনাথান ডানকানের উদ্যোগে কাশীতে সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। তখন কর্তৃপক্ষ একদিকে আরবী-ফারসী-জানা আমলার প্রয়োজন বোধ করিতেছেন, অন্যদিকে প্রাচ্যবিদ্যার অনুশীলনের দ্বারা প্রাচ্যবাসীদের শিক্ষার প্রসারের কল্পনা করিতেছেন। কিছুকাল পরে যখন এদেশীয়দের শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডীয় প্রভুরা বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিলেন তখন স্থির হইল যে, এই টাকা ব্যয়িত হইবে প্রাচ্যবিদ্যার অনুশীলনে এবং সংস্কৃতের মাধ্যমেই যথাসম্ভব প্রতীচ্যের জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইবে। কিন্তু বলা যাইতে পারে যে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সঞ্চিত অর্থের বিশেষ কোন ব্যবহারই করা হয় নাই। অর্থাৎ এ দেশীয়দের শিক্ষার কোনো প্রয়োজন এদেশের যাঁহারা প্রত্যক্ষ শাসক তাঁহারা একেবারেই বোধ করিতেছিলেন না। কারণ তাঁহাদের বেশ চলিয়া যাইতেছিল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমানের (সেকালেরও) Writers' Buildingsএ Fort William কলেজ স্থাপিত হইল, সাহেব চাকুরিয়াদের আঞ্চলিক ভাষা শিখাইবার জন্য। আর মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত কলেজ ও স্কুলে এদেশীয়রা কিছু কিছু ইংরেজী পড়িয়া ইংরাজের কেরাণী ও মুৎসুদ্দিগিরি করিবার অধিকার লাভ করিতেছিলেন। কিন্তু এই কেরাণীদের প্রয়োজনও বাড়িতে লাগিল; লোকেরা বুঝিল ইংরাজী না শিখিলে না ঘরকা না ঘাটকা হইয়া থাকিতে হইবে। এবং ১৮৩৩এর পরে উচ্চতর সরকারী পদে এদেশীয়দিগের নিয়োগের প্রতিশ্রুতির ফলে ইংরাজী স্কুলে পড়ুয়াদের সংখ্যাও গেল বাড়িয়া। কিন্তু ১৮৩৩এর আগেই এই কলিকাতায় এবং বাংলাদেশে নূতনতর শিক্ষা দিবার প্রতিষ্ঠান অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। শিক্ষা-বিস্তারের এবং **আধুনিক** শিক্ষা-বিস্তারের প্রাথমিক কৃতিত্ব কিন্তু সবই মিশনারীদের কিংবা উদারচেতা সাহেবদের এবং কিছু বাঙালীদের। মিশনারীরা হয়ত খ্রীষ্টের বাণীর ব্যাপকতর প্রচারের আশায় স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু হেয়ার সাহেবের আমরণ অক্লান্ত প্রচেষ্টার মূলে এক মানব-হিতৈষণা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

১৮১৫ সালে শ্রীরামপুরে মিশনারীদের বিখ্যাত কলেজ স্থাপিত হয় এবং তাহার দুই বৎসর পরে হেয়ার ও রামমোহনের চেষ্টায় **হিন্দু** কলেজ স্থাপিত হয় ১৮১৭ খ্রীঃ ২০শে জানুয়ারী। ইহার আগেই ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া ১৮১৪ সনে জয়নারায়ণ ঘোষাল মিশনারীদের হাতে, ইংরাজী শিক্ষা প্রচারের জন্য ২০ হাজার টাকা তুলিয়া দেন। আবার ঐ

১৮১৭ খ্রীঃ প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ ও বিস্তারকল্পে হেয়ার সাহেবের উদ্যোগে জন্মলাভ করে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি এবং কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি। প্রথমটির তত্ত্বাবধানে চলিতে থাকে কলিকাতায় মোট ১৬৬টি পাঠশালা এবং দ্বিতীয়টির একক প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষায় প্রথম (ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত মহাশয়দের গ্রন্থগুলির কথা ধরিলে অবশ্য নহে) স্কুলপাঠ্য নানাবিষয়ক গ্রন্থ বাংলাভাষায় লিখিত হইতে থাকে। সত্যকথা বলিতে কি পরিভাষা-রচনায় এবং প্রকাশ-সৌকর্যে এই গ্রন্থগুলি এখনও আমাদের হিংসার উদ্রেক করিতে পারে। এই সকল পাঠশালায় অবশ্য শিক্ষার মাধ্যম ছিল বাংলা, ইংরাজী নহে। ১৮১৭ সালের আগেও কিন্তু পাঠশালায় শিক্ষার আমূল পরিবর্তন সাধন করিতেছিলেন ১৮১৪ সালের জুলাই মাস হইতে রবার্ট মে। চুঁচুড়ায় তাঁহার স্থাপিত পাঠশালাগুলি মে সাহেবের পাঠশালা নামে পরিচিত ছিল। স্কুল সোসাইটি চাহিয়াছিলেন এদেশীয় পাঠশালাগুলিকে বাঁচাইতে আর মে বা তাঁহার কিছু পরে বর্ধমানে ক্যাপটেন জেম্‌স স্টুয়ার্ট সৃষ্টি করিতেছিলেন ইংরেজীপ্রধান পাঠশালা। অন্যদিকে শ্রীরামপুরের বিখ্যাত পাদ্রী জোশুয়া মার্সম্যান ১৮১৩ সাল হইতেই নূতন ধরণের পাঠশালা প্রতিষ্ঠায় তৎপর হইয়া উঠেন।

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, হিন্দু কলেজের জুনিয়ার বিভাগ ছাড়াও, অন্তত আরও তিনটি ১৮১৭ সালের আগেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—ড্রমণ্ড, শার্বোর্ণ এবং ভবানীপুরে জগমোহন বসুর স্কুল। শেষোক্ত বিদ্যালয়টিই বোধ হয় একালে ইংরাজী শিক্ষার প্রথমতম স্কুল,—প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৯৩ সালে[৪৪]। ১৮১৭ সালের পরেই স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। রামমোহন তাঁহার বিখ্যাত এ্যাংলো-হিন্দু বিদ্যালয় স্থাপন করেন আর ডেভিড হেয়ারও খোলেন পটলডাঙায় সেকালের সর্বাপেক্ষা নাম-করা স্কুল।

এইরূপে নূতন সৃজ্যমান জীবনধারার সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিবার জন্য বাঙালী ও বেসরকারী সাহেবেরা মিলিয়া শুধু উদ্যোগপর্বই সমাধা করিলেন না, নূতন শিক্ষার প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত করিয়া ফেলিলেন, এমন কি মিস কুক হইতে আরম্ভ করিয়া বেঙ্গল লেডিজ সোসাইটি পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষার জন্য বহু স্কুল খুলিয়া ফেলিলেন[৪৫]। ইহার প্রায় ৬ বৎসর পরে ১৮২৩ সালে স্থাপিত হইল সরকারী জেনারেল কমিটি অব পাব্‌লিক ইন্‌স্ট্রাকশন্ এবং হোরেস হেম্যান্ উইলসন্ প্রভৃতি প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্‌দের আধিপত্যের ফলে দেশের লোক প্রতীচ্যের জ্ঞান ও ভাষা শিখিতে চাহিলেও, ঐ কমিটি হিন্দু কলেজকে অর্থসাহায্য না করিয়া ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপন করিলেন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ। নূতন

করিয়া এই অতীতে ফিরিয়া যাইবার বিরুদ্ধে, এদেশীয়কে পুরাপুরি কূপের মণ্ডুক বানাইবার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে, রামমোহনের প্রতিবাদ নানা কারণেই স্মরণীয়। তাঁহার আপত্তি প্রধানত শিক্ষার মাধ্যমের বিরুদ্ধে নহে, শিক্ষণীয় বস্তুর বিরুদ্ধে। প্রাচীন ভারতের যে শিক্ষা টোল, চতুষ্পাঠিতে দ্বাদশ বৎসর কাটাইয়া শিক্ষার্থীরা অর্জন করিত, সে শিক্ষার সংগে তৎকালীয় ব্যবহারিক জীবনের যে একান্ত বিরোধ তাহাই নহে, সেই ন্যায়-ব্যাকরণ-বেদান্ত-কাব্যের গতানুগতিক শিক্ষা দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং শিল্পবিপ্লবে মুখর তৎকালীয় জগতে মানুষকে শুধু পিছন পানে মুখ ফিরাইতেই শিখাইত। রামমোহন এই শিক্ষা সম্পর্কে লর্ড আমহার্স্টকে লিখিয়াছিলেন, রেনেসাঁ যুগে ইংরাজেরা স্বসমাজে যে নূতন শিক্ষার ধারা প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া, "If it had been intended to keep the British nation in ignorance of real knowledge, the Baconian philosophy would not have been allowed to displace the system of the schoolmen which was the best calculated to perpetuate ignorance. In the same manner, the Sanskrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness, if such had been the policy of the British Legislature. But as the improvement of the native population is the object of the governments, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy, with other useful sciences" [৪৫ক]। ভারতেও প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতির কি ফল হইতেছে তাহাও রামমোহন চূড়ান্ত ভাষায় নির্দেশ করিতেছেন: "Neither can much improvement arise from such speculations as the following which are the themes suggested by the Vedanta;—In what manner is the soul absorbed in the Deity? What relation does it bear to the Divine Essence? Nor will youths be fitted to be better members of Society by the Vedantic doctrines which teach them to believe that all visible things have no real existence, that as father, brother etc. have no actual entity, they consequently

deserve no real affection, and therefore the sooner we escape from them and leave the world the better"[৪৫খ]। ১৮৩৫ সালে যখন ইংরাজী মাধ্যম স্বীকৃত হইল তখন কিন্তু বাস্তবিক রামমোহনের দাবী যে স্বীকৃত হইল তাহা নহে—রামমোহন তাঁহার চিঠিতে শিক্ষার বাহনের কথা কিছুই বলেন নাই; শুধু বলিয়াছিলেন বিষয়বস্তুর কথা। এবং তাঁহার সে মনোবাসনা ১৮৩৫ সনের আগেই আংশিক পরিপূর্ণ হইয়াছিল বেসরকারী উৎসাহের ফলে,—রবার্ট মে-র পাঠশালা হইতে শুরু করিয়া হেয়ার সাহেবের পটলডাঙার স্কুল, তাহার পর ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী, মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন প্রভৃতির মাধ্যমে। মেকলের বিখ্যাত মিনিট শুধু দেশবাসীরা বাস্তবে যাহা করিতেছিলেন তাহাকেই আনুষ্ঠানিক রূপ দিয়াছিল—দেশবাসী বলিতে অবশ্য নবসৃষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণী। নব্যশিক্ষিত এই মধ্যবিত্তের ইংরাজী-প্রীতির বিজাতীয় আধিক্য সম্পর্কে অনেক উপকথা চলিত আছে: মধুসূদনের দৃষ্টান্তটি একেবারে চূড়ান্ত। নবাভিষিক্তের এই আতিশয্য অতি স্বাভাবিক। কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে এই নবোৎসাহীদের শুধু যে ইংরাজী ভাষাতেই অভাবিত ব্যুৎপত্তি ঘটিয়াছিল তাহা নহে, প্রতীচ্যের ভাবধারাও তাঁহারা পুরাপুরি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। ১৮১৭ সালে যদি ইংরাজী শিক্ষার প্রথম সুব্যবস্থা হইয়াছিল ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে সেই শিক্ষার অতি দ্রুত উন্নতির একটা ধারণা পাওয়া যায় কাশীপ্রসাদ ঘোষের দৃষ্টান্ত হইতে। ১৮৩০ সালে কালীপ্রসাদই প্রথম বাঙ্গালী কবি যাঁহার কবিতার মাধ্যম ছিল ইংরেজী। "The first Hindu who has ventured to publish a volume of English poems." (Preface to 'Shair and other Poems')। গ্রন্থখানি লর্ড Bentinckকে উৎসর্গ করা। ইহার আগে Derozio স্বভাবতই ইংরেজীতে কবিতা লিখিয়াছিলেন। কিন্তু যুগমানসের প্রভাবে দুই জনেরই কাব্যের অনুপ্রেরণা হইল, এক কথায় বলিতে গেলে, স্বদেশপ্রেম। **লোকে শিখিল ইংরেজী এবং আত্মস্থ করিল প্রতীচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পদ অথচ হইয়া উঠিল দেশ-প্রেমিক—ইহাই হইল উনবিংশ শতকে বাঙালীর নব-জাগরণের মূলীভূত অন্তর্দ্বন্দ্ব।** কাশীপ্রসাদের 'The Shair and other Poems' এর একটি অংশ হইল হিন্দু পালা-পার্বণের উপর। তাহার পরে রহিয়াছে পুরু ও উর্বশীর দেশীয় কাহিনী অবলম্বনে রচিত কবিতা। তাহার পর হিন্দুর রাসযাত্রার উপর কবিতা। অর্থাৎ ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরগুপ্ত বা দাশু-রায়ের ভাষায় কবিতা লেখা যায় না বলিয়াই ইংরেজীতে লিখিতে হইতেছে; তাহা না হইলে আর সবই ত এদেশেরই খাঁটি জিনিষ। Derozio র ব্যাপার আরও

চমকপ্রদ। তিনিই বোধ হয় সে যুগে একমাত্র "ট্যাঁশ-ফিরিঙ্গি" যিনি ভারতবর্ষকেই স্বদেশ ভাবিয়া ভারতের অতীত-গৌরবে গৌরববোধ করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তাই Derozioকে শুধু ছেঁদো কথায় romantic বলিলে চলিবে না—বুঝিতে হইবে তাঁহার রোমান্টিক স্বপ্ন কাহাকে ঘিরিয়া রচিত হইয়াছে। সে তাঁহার স্বদেশ। সেই স্বদেশের দুরবস্থায় তিনি বিষণ্ণ।

তাই বলিতেছিলাম যে ১৮৩৫ সালে শিক্ষা সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষ লইলেন সে সিদ্ধান্ত দেশবাসী আগেই লইয়াছে এবং সেই সিদ্ধান্তের ফলাফল ফলিতে শুরু করিয়াছে। ইংরাজী শিখিয়া, ইংরাজের চাকুরী করিয়া, বাংলা ভুলিয়া যাইবার অপ-গৌরব করিয়াও কিন্তু তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালী চোখ মেলিয়া সব কিছু দেখিতে শিখিতেছে এবং স্বদেশের দুরবস্থায় বিষণ্ণ হইয়া ভাবিতেছে বোধ হয় সর্বাঙ্গীণ উন্নতির মূল নিহিত আছে পুরা প্রতীচী-ভবনে। সকলেই যে ঠিক ইহা ভাবিতেছেন তাহা নয়। যাঁহারা দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন যেমন রামমোহন, হেয়ার, রাধাকান্ত দেব (তাঁহার প্রতিক্রিয়াশীলতা সত্ত্বেও), মতিলাল শীল, রাজেন্দ্র দত্ত, কৃষ্ণমোহন, এবং পরে বিদ্যাসাগর—তাঁহারা ভাবিতেছিলেন সমন্বয়ের কথা। (অতএব বঙ্কিমের আনন্দমঠের তত্ত্ব শুধু এই ভাবধারার বিলম্বিত সাহিত্যিক প্রতিফলন মাত্র)। কেহ কেহ যে উগ্রতার মাত্রা বাড়াইয়া দিবে তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই; এমন কি পরবর্তী কালের কোনো ধীর নেতাই হয়ত যৌবনে উগ্রতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এই সাময়িক উচ্ছৃঙ্খলতাকে আমরা সাধারণত যে চোখে দেখিয়া থাকি সেই চোখ যে একান্ত পক্ষপাতদুষ্ট ও ঐতিহাসিক দৃষ্টি-বিহীন তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না যখনই American War of Independence বা French Revolution বা ইংলণ্ডের তথাকথিত Glorious Bloodless Revolutionএর কথা ভাবি। ইংলণ্ডে ১৬৪৯ হইতে ১৬৮৮ পর্যন্ত, ফ্রান্সে ১৭৮৯ হইতে ১৭৯৫ পর্যন্ত এবং আমেরিকায় যুদ্ধে যে রক্তপাত হইয়াছিল, স্বাধীনতা ও স্বাধিকার অর্জনের জন্য, তাহার তুলনায় বাঙালীর নবজাগরণের মরশুমে কেহ যদি একটু ব্রাণ্ডি বা মুসলমানের দোকানের মাংস খাইয়াই থাকে, তাহাতে চোখ লাল করিয়া তাড়া করিবার ত কিছু নাই-ই বরং এই কথা ভাবিবার আছে যে, যে মোহমুক্তি ও নূতন জীবনদর্শন বাঙালী লাভ করিতেছিল তাহার তুলনায় এই উচ্ছৃঙ্খলতা কত অকিঞ্চিৎকর। তাহার উপর এই নবজাগরণের যাহারা পুরোহিত—Derozio হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যাসাগর পর্যন্ত,—তাঁহাদের সঙ্গে ব্রাণ্ডির এবং বিফের সম্পর্ক কতটুকু। আসলে দেখা দরকার যে, ব্রাণ্ডির সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ আরও কি কি আনিল। আরও সহজ করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় যে,

প্রতীচ্য সভ্যতার কোন্ বিশেষ তত্ত্বগুলি এই নবজাগ্রত বাঙালীর মনকে সঞ্জীবিত করিতেছিল। এখানে একটি তথ্য পরিবেশন করিলেই ব্যাপারটি স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। যে বাঙালী এতদিন পর্যন্ত নব্যন্যায়ের কাল্পনিক চুল শতধা চিরিতেছিল, আর কাব্য বলিতে বুঝিতেছিল আদিরস, সেই বাঙালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের হিন্দুকলেজে-পড়া সন্তানেরা হঠাৎ সে সকল ছাড়িয়া দিয়া Tom Paine-এর Rights of Man, Age of Reason, যদি পড়িতে আরম্ভ করে, যদি তাহারা রঘুনন্দন ছাড়িয়া একদিকে Hume ও Locke, এবং অন্যদিকে Voltaire, Diderot ও Rousseau পড়িতে থাকে, তাহা হইলে প্রাকৃতজনেরা তাহাদের মাথা বিগড়াইবার জন্য ব্রাণ্ডির ঘাড়ে দোষ চাপাইতে পারেন কিন্তু পাদ্রি Alexander Duff ধরিয়াছিলেন রোগ কোথায়। তাঁহার ধর্মভীরু মনের কাছে ইয়ং বেঙ্গলকে কালাপাহাড় মনে হইয়াছিল। তিনি লিখিতেছেন, "Their great authorities....were Hume's *Essays* and Paine's *Age of Reason*. With copies of the latter, in particular, they were abundantly supplied. ....It was some wretched bookseller in the United States of America who, basely taking advantage of the reported infidel leanings of a new race of men in the East and apparently regarding no God but his silver dollars despatched to Calcutta a cargo of that most malignant and pestiferous of all anti-christian publications. From one ship a thousand copies were landed, and at first were sold at the cheap rate of one rupee per copy; but such was the demand that the price soon rose, and after a few months, it was actually quintupled. Besides the separate copies of the *Age of Reason*, there was also a cheap American edition, in one thick Vol. 8vo. of all Paine's works including the *Rights of Man*, and other minor pieces, political and theological."[৪৬]

এই সকল গ্রন্থকারেরাই হইলেন নবযুগের দীক্ষাগুরু। ইহারাই মানুষকে আত্মশক্তি সম্বন্ধে সচেতন করিয়া স্বাধিকার-অর্জনে উদ্বুদ্ধ করিতেছিলেন। এই নূতন দর্শন ও রাজনীতিতে নব্যবঙ্গ পাঠ ত লইতেছিলই, সে আরও পাঠ লইতেছিল Adam Smith এবং পরবর্তীকালে John Stuart Mill-

এর নিকট হইতে। যন্ত্রবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে প্রাকৃতিক শক্তি সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আত্মশক্তিতে প্রত্যয় বাড়িতেছিল। হিন্দু কলেজের পাঠক্রম দেখিলেই বুঝা যাইবে বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যবস্থা সেখানে সাহিত্য-পাঠনের ব্যবস্থার চেয়ে কোনো অংশে হীন ছিল না। এই কলেজেরই ছাত্র রাধানাথ শিকদার প্রথম Mt. Everest পরিমাপ করেন। এই কলেজেরই মধুসূদন গুপ্ত প্রথম শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়া মৃতদেহ সম্পর্কে নানা কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদে অগ্রণী হন। এই সকল মন্তব্যের অর্থ ইহা নহে যে বিজ্ঞান-শিক্ষা প্রত্যক্ষভাবে আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে আক্রমণ করে। বিজ্ঞান শিখিলেই মানুষ নাস্তিক হইয়া উঠে না। কিন্তু বিজ্ঞান যে যুক্তির উপরে দাঁড়াইয়া আছে, সেই যুক্তি বা Reason মানুষকে কার্য-কারণ-সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিয়া তাহাকে আচার-পরায়ণ হইবার বদলে বিচার-পরায়ণ হইতে বলে এবং প্রাকৃতিক শক্তিকে ক্রমান্বয়ে মানুষের বশে আনয়ন করিয়া মানুষের অসহায়তা এবং দৈব-নির্ভরতা দূর করে। এই কারণেই Locke, Hume, Tom Paine বা Diderot নব্য-বঙ্গকে নাস্তিক করিয়া তুলিয়াছিলেন। এবং ইঁহাদের প্রভাবেই নব্য-বঙ্গ ঈশ্বর ও পরলোকের স্থলে মানুষ এবং ইহলোককে স্থাপন করিয়াছিল। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই রামমোহন শুধু স্বদেশে নয়, বিদেশেও (ফ্রান্স এবং স্পেন) মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা দেখিলেই অভিনন্দন জানাইতেন। এইজন্যই রামমোহন আমাদের দেশের প্রথম আন্তর্জাতিকাবাদী।

সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নব্য-বঙ্গ যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতেছিল, তাহাও মানবতা-বাদেরই আদর্শ। শেক্সপীয়র, মিল্টন হইতে আরম্ভ করিয়া স্কট্, বায়রন্ পর্যন্ত সকল মহৎ সাহিত্যিকের দানেই নব্য-বঙ্গের মন পরিপুষ্ট হইয়াছিল। শেক্সপীয়রের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও মানব-চরিত্রের উচ্চাবচতার অপূর্ব বিশ্লেষণ, মিল্টনের উত্তুঙ্গ নৈতিকতা ও মানব-প্রেম এবং বায়রণের অভূতপূর্ব্ব আত্মম্ভরিতা সবই আসিয়া মিশিয়াছিল এই বাঙালীর মনে। আবার সেই সঙ্গে ড্রাইডেন্, এ্যাডিসন্ ও পোপও বাদ যান নাই—অর্থাৎ নব্য-বঙ্গের মুখপাত্র মধুসূদনও বটেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও বটেন; আর নব্য-বঙ্গের Hume হইলেন অক্ষয়কুমার দত্ত।

যাঁহারা এই সমস্ত জ্ঞান ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করিতেছিলেন তাঁহাদের পুরোধা হইলেন Derozio। নব-চেতনাদীপ্ত বাংলার প্রথম প্রবক্তারা এই মহাত্মার কাছে পাঠ লইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি শিক্ষক ছিলেন এ কথা বলিলে Derozio সম্পর্কে কিছুই বলা হইল না। তিনি ছিলেন

নব-বঙ্গের গুরু। তাঁহার মধ্যে ছাত্রেরা প্রথম লক্ষ্য করিল বাক্যে এবং কর্মে পরিপূর্ণ ঐক্য। এই একটি মানুষ যে যাহা বলে তাহাই করে; অথচ বয়সে সে তখনও তারুণ্যের কোঠা পার হয় নাই। Derozio নাস্তিক ছিলেন কি আস্তিক ছিলেন এ কথার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তিনি ছিলেন Age of Reasonএর প্রতীক (Popeএর Reason নহে, Tom Paine বা Hume এর Reason)। পুরাতন আচার ও কুসংস্কারের মোহজাল ছিন্ন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াই যেন তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সেই দীপ্ত তেজ ও অকুতোভয়তা, সেই বিচারশীলতার উত্তরাধিকার তিনি দান করিয়া গেলেন তাঁহার শিষ্যদের—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, প্যারিচাঁদ মিত্র প্রভৃতিদের। Derozioই প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে নব্যবঙ্গের প্রথম শহীদ। কিন্তু ইহা ত অবশ্যম্ভাবী। নবাঙ্কুর প্রাচীন বনস্পতির ভার সহিতে পারে না; কিন্তু সে নবাঙ্কুর একদিন আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ই। Deroziর আগেও যাঁহারা বাঙালীকে নূতন পথে হাত ধরিয়া ধরিয়া চলিতে শিখাইয়াছিলেন তাঁহারা অবশ্যই রামমোহন ও ডেভিড হেয়ার। কিন্তু ইহাদের পরে যিনি সকল বাধা, শুধু যুক্তির জোরে নহে পদাধিকার বলে, নস্যাৎ করিয়া প্রতীচ্যকে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করিলেন তিনি লর্ড মেকলে। ইহার অতিশয়োক্তি সর্বজনবিদিত। কিন্তু তিনি না হইলে হয়ত শেষ বাধাটুকু অপসৃত হইত না; একটুখানির জন্য সব পণ্ড হইত।

(৬)

শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু আরও কতকগুলি সমাজ-সংস্কারমূলক কাজ সরকার করিয়া ফেলিয়া নব্যবঙ্গের মনে আরও প্রত্যয়, আরও আশার সৃষ্টি করিলেন। এই সমাজ সংস্কারের ফলে প্রতীচ্যের নৈতিক superiority ইয়ং বেঙ্গলের মনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহের আগে পর্যন্ত যে ব্রিটিশ-শাসনের (কোম্পানী শাসনের) যুগ তাহাকে Thomson and Garrat[৪৭] Era of Reforms and Suppression of Inhumanitiesএর যুগ বলিয়াছেন। যদিও ঊনবিংশ শতকের প্রথমে কোম্পানী মার্শম্যান ও কেরীকে, এদেশীয়দের ধর্মে পাছে আঘাত লাগে এই ভয়ে, কলিকাতায় আসিতে না দিয়া দিনেমারদের রাজত্ব শ্রীরামপুরেই থাকিতে বাধ্য করিয়াছিলেন, তবু উদারমতাবলম্বী বিভিন্ন গভর্ণর-জেনারেল বিভিন্ন সামাজিক গ্লানি ও কুসংস্কার দূর করিতে অগ্রণী হইয়াছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের পরে, রাজত্বে কায়েম হইয়া বসিয়া, ব্রিটিশ

সরকার আর এমন কোনো কাজে হাতে দেন নাই যাহাতে দেশের প্রতিক্রিয়াশীলেরা চটে। কারণ নব্যবঙ্গের ইয়ং বেঙ্গলদের মোহভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিক্রিয়াশীলেরাই ব্রিটিশ শাসনের প্রধান স্তম্ভ হইয়া উঠিয়াছিল।

সরকারের সমাজ-কল্যাণমূলক এই কাজগুলি বিশেষ করিয়া মনে রাখা দরকার। এইগুলিই বাঙালীর মনে আশার সঞ্চার করিয়াছিল। অর্থনৈতিক উৎপীড়ন এবং অধঃপতন সত্ত্বেও [৪৭ক] সমাজের উপরিতলে এই সংস্কার-সাধন শিক্ষিত বাঙালীর মনে রেখাপাত করিয়াছিল ঃ

১৮২৩—এডুকেশন কাউন্সিল স্থাপন।

১৮২৪—সংস্কৃত কলেজ স্থাপন।

১৮২৮-২৯—সতীদাহ নিবারণ; ঠগীদমন।

১৮৩৩—কোম্পানীর নূতন সনদের ৮৭ ধারা মতে এদেশীয়দের উচ্চতর রাজপদে নিয়োগের আশ্বাস। ইহারই প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে ১৮৩৪ সালের পর হিন্দু কলেজের কৃতবিদ্য যুবকগণকে ডেপুটি কলেক্টরের পদ দেওয়া হইতে লাগিল। (কিন্তু ১৭পৃঃ Lord Lyttonএর উক্তিও এই সঙ্গেই স্মরণীয়)।

১৮৩৫—শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার; মেকলের সুবিখ্যাত 'মিনিট'।

১৮৩৫—কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন।

১৮৩৫—লর্ড মেটকাফের মুদ্রাযন্ত্রকে স্বাধীনতা প্রদান। এই সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিতেছেন, "মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা হইলেই বঙ্গদেশে এক নবযুগের সূত্রপাত হইল। নূতন নূতন সংবাদপত্র সকল দেখা দিতে লাগিল; নবপ্রাপ্ত স্বাধীনতার ভাব সর্বশ্রেণীর মানুষের মনে প্রবিষ্ট হইয়া চিন্তা ও কার্যে এক নূতন তেজস্বিতা প্রবিষ্ট করিল; এবং সর্বপ্রকার উন্নতিকর কার্যের উৎসাহ যেন দশগুণ বাড়িয়া গেল। সেই নব উৎসাহ ও নব উত্তেজনাতে ডিরোজিওর শিষ্যদল নানা বিভাগে নানা কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। বলা বাহুল্য যে এই সময়ে জুরি-বিচার প্রবর্তিত করিবার জন্য, মরীশশ দ্বীপের কুলীদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারণের জন্য ও মফঃস্বল আদালত সকলে ওকালতিতে পারস্যভাষার পরিবর্তে ইংরাজী ভাষা প্রচলিত করিবার জন্য, হেয়ার যে সকল চেষ্টা করিয়াছিলেন, যুবকদল সে সকল বিষয়ে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।"[৪৮]

১৮৪০—লর্ড অকল্যাণ্ড সাহেবদিগের হিন্দু দেব-দেবীদের স্থানে পূজা বা ভেট দিবার প্রথা রহিত করেন।

১৮৪৩—ক্রীতদাস প্রথার বিলোপসাধন।

১৮৪৬—কৃষ্ণনগরে কলেজ স্থাপন।

১৮৪৯-৫০—বেথুনের উদ্যোগে ইংরাজদিগকেও সাধারণ ফৌজদারী দণ্ড-বিধির অধিকারে আনিবার জন্য যে আইনের খসড়া রচিত হইল ইংরাজেরা সেগুলিকে Black Acts নাম দিয়া সেগুলি প্রবর্তনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করিলেন। ইহাতে নব্য বাঙালীর ইংরাজ-প্রীতিতে আঘাত লাগিল; জাতীয় চেতনা উদ্দীপ্ত হইল; রামগোপাল ঘোষ লেখনী ধারণ করিলেন বিধি-গুলির স্বপক্ষে।

১৮৫৩—বম্বেতে প্রথম রেলপথ স্থাপন।

১৮৫৪—বিলাত হইতে কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ ভারতবর্ষে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরামর্শ দিলেন।

১৮৫০-৫৬—লর্ড ডালহৌসীর স্বত্বলোপ নীতি। ইহাতে দেশীয় রাজন্যেরা চটিতেছিলেন কিন্তু পরোক্ষভাবে এই নীতির ফলে ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হইতেছিল।

১৮৫৬—বিধবা-বিবাহ বৈধকরণ।

১৮৫৭—কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন।

১৮৫৮—ভারতবর্ষ বৃটিশ সরকারের খাসমুলুকে পরিণত হইল। তাহাতে ভারতবর্ষীয়ের কোনো বাস্তব ক্ষতি-বৃদ্ধি ঘটিল না; তবে ভারতীয় বাহিনীগুলি ভাঙিয়া দেওয়া হইল।

উপরে উল্লিখিত সামাজিক বা রাজনৈতিক সংস্কারগুলি সবই সরকার-প্রবর্তিত। এগুলির সঙ্গে যোগ করিতে হইবে আভ্যন্তরীণ ও ভারতের বাহিরে বহু যুদ্ধের ফলাফল—যেগুলির ফলে ইংরাজের রাজত্ব সারা ভারতে বিস্তৃত হইয়াছিল এবং ইংরাজের শৌর্যে ও অপরাজেয়ত্বে জনগণের বিশ্বাসের মূল দৃঢ় হইয়াছিল। শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত কিন্তু ইংরাজের শৌর্য অপেক্ষা কৃষ্টি ও মননেই বেশী মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের কাছে ইংরাজ হইয়া উঠিয়াছিল শেক্সপীয়র, মিলটন, নিউটন, দিদিরো বলতেয়ারের প্রতিভূ।

নবোৎসাহিত বাঙালীও তাই ১৮৫৭ পর্যন্ত অর্ধ-শতাব্দী ধরিয়া নিজের দায়িত্বে এবং আগ্রহাতিশয্যে বহু-বিচিত্র সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হইল। বাঙালী অতি দ্রুতবেগে নিজের জাগরণের উষাকাল কাটাইয়া উজ্জ্বল মধ্যাহ্নে উপনীত হইল; অবশ্য সে মধ্যাহ্নের উজ্জ্বলতার পশ্চাৎপটে ছিল পরাধীনতা এবং ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের ঘনাবলেপ।[৪৯] তাই পরাধীনতা ও দারিদ্র্যের ক্ষোভও যে মাঝে মাঝে প্রকট না হইয়াছে এমন নহে।

১৮০২ সালে যখন প্রথম বাঙালী পীতাম্বর সিং খ্রীষ্টান হইলেন তাহার

আগেই যে দেশে খ্রীষ্টের বাণী প্রচারিত হইতে পারিয়াছিল তাহার প্রধানতম কারণ হইল বেসরকারী প্রচেষ্টায় দেশী মুদ্রাযন্ত্রের স্থাপন। বেসরকারী বলিতে একটুকুই বুঝায় যে সরকার প্রত্যক্ষভাবে অর্থ ও লোক নিয়োগ করেন নাই; ইহার বেশী কিছু নয়। কেন না চার্লস উইলকিন্স্ যে বাংলা অক্ষরের প্রথমে নিজ হাতে ছেনি কাটেন সে ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেবেরই অনুরোধে। তাঁহার সহকারী ছিলেন বাঙালী কর্মকার পঞ্চানন। এই প্রথম তৈয়ারী অক্ষরেই প্রথম বই ছাপা হয় হ্যালহেডের A Grammar of the Bengal Language ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। তাহার পরে শ্রীরামপুরে মিশনারী সাহেবদের হাতে এই মুদ্রাযন্ত্রের উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে থাকে।

মুদ্রাযন্ত্র যে আধুনিক সভ্যতা ও গণতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তি এ কথা আজ সর্বজনস্বীকৃত। এই মুদ্রাযন্ত্রের অগ্রগতি না হইলে, যে প্রতীচ্য ভাবধারায় অবগাহনের ফলে বাঙালী সেকালে যুগের আহ্বানে সাড়া দিতে পারিয়াছিল, সেই সাড়া তাহার পক্ষে দেওয়া ত সম্ভবই হইত না, বাঙালীর নবজাগরণ এই রূপ পরিগ্রহ করিত কি না সন্দেহ। হয়ত আমাদের সেই কথকতা আর পাঁচালীগানের যুগেই আরও বহুদিন থাকিতে হইত। চার্লস উইলকিন্স বাংলা টাইপের সৃষ্টি প্রত্যক্ষত আমাদের উপকারের জন্য করেন নাই। "অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলাদেশে ইংরাজশাসন সুপ্রতিষ্ঠ হইবার পর ইংরাজেরা এদেশের ভাষা শিখিবার প্রয়োজন অনুভব করিতে আরম্ভ করেন।....১৮০০ সনে শ্রীরামপুরে কেরী, ওয়ার্ড, মার্শম্যান প্রভৃতি মিশনারীরা ব্যাপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠিত করিয়া নানা উপায়ে এদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের চেষ্টা করিতেছিলেন। সুতরাং বাংলা পুস্তক ছাপা সম্বন্ধে স্বভাবতই তাঁহাদের বিশেষ আগ্রহ থাকিবার কথা। একদিকে এই মিশনারী আগ্রহ, আর একদিকে প্রধানত সরকারী আইন-আদালতের প্রয়োজন, এই দুইয়ের জন্য বাংলাদেশে মুদ্রণযন্ত্রের প্রসার ও উন্নতি হইতে লাগিল"।[৫০]

কিন্তু ঐ স্থূল প্রয়োজন সাধনের সীমা অতিক্রম করিয়া মুদ্রণযন্ত্র হইয়া উঠিল নূতন শিক্ষা-বিস্তারের সর্বোত্তম মাধ্যম। সেই শিক্ষিত বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিল রামমোহন, মধু, বিদ্যাসাগরের রচনাসম্ভার; লেখক ও পাঠকের মধ্যে স্থাপন করিল সহজ যোগসূত্র। কোনো কিছু জানিতে হইলে আর গুরুর আকস্মিক ও অনিশ্চিত প্রসাদের উপর নির্ভর করিতে হইল না। শিক্ষা আর মুষ্টিমেয়ের কেবলাধিকারে রহিল না। মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাবকে বলিতে হইবে আধুনিক বঙ্গসংস্কৃতির ভিত্তিপ্রস্তর। এবং ১৮০০ সাল হইতেই প্রচুর পরিমাণে গ্রন্থ বাংলা ভাষায় মুদ্রিত হইতে থাকে। বেসরকারী প্রচেষ্টায় এবং সামাজিক

ও রাজনৈতিক আলোড়নের ফলে সমাজ-মানসের সংস্কৃতি বা পরিবর্তন যাহা ঘটিতে লাগিল তাহার একটি স্থূল হিসাব করিলে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জন-আন্দোলনগুলির বেশীর ভাগই জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ; পরে ইংরাজ জমিদারদের পক্ষ অবলম্বন করায় সেগুলি রাজনৈতিক বিক্ষোভের রূপ ধারণ করে।

১৭৯৬ হইতে ১৮১৭—এই কালের মধ্যে বহু পাঠশালা ও বেসরকারী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন।

১৮০০—(?) রামরাম বসুর পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে পুস্তক।

১৮০৩-৪—রামমোহনের ধর্মমত পরিবর্তনসূচক ফার্সী গ্রন্থ প্রকাশ—তুহ্‌ফাৎ-উল্ মুয়াহহি্‌দীন।

১৮১৫—মিশনারীদের প্রকোপ; পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের হাত হইতে হিন্দুকে রক্ষা করিবার জন্য রামমোহন রায়ের আত্মীয়-সভা স্থাপন।

১৮১৫-১৮২৩—রামমোহনের নানামুখী আন্দোলন:

নিষ্পৌত্তলিক যুক্তিনিষ্ঠ খাঁটি বেদান্তধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলা ভাষায় প্রথম বেদান্তের ভাষ্য। বিভিন্ন উপনিষদের প্রথম বাংলা অনুবাদ (কঠ কেন, ঈশ প্রভৃতি)। শ্রীরামপুর ও কলিকাতার খ্রীষ্টান পাদরীদের সঙ্গে Trinity (বা ত্রিমূর্তির)র বিরুদ্ধে তর্ক ও তাঁহাদের মতের খণ্ডন। উইলিয়ম এ্যাডামের রামমোহনের দলে যোগদান। রামমোহন বিভিন্ন পত্রিকা প্রকাশ করিয়া বাংলা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নূতন আদর্শ স্থাপন করিলেন: Freedom of the Press এবং Freedom of Expressionএর ম[illegible]র্শের তিনিই প্রথম সচেতন প্রবক্তা। তাঁহার পত্রিকা প্রকাশিত হইত তিনটি ভাষায়। সকল ভাষাভাষী লোকের গোচরীভূত করার জন্যই এই ব্যয়-বহুল প্রচেষ্টা। তাঁহার প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'সম্বাদ কৌমুদী'কেই বাংলাভাষায় প্রথম উচ্চ কোটির পত্রিকা বলা যাইতে পারে। ১৮২৩ সালে যখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হয় তখন তিনিই ইহার সার্থক প্রতিবাদ করেন নিজেরই মীরাৎ-উল্-আখবার-এর ১৮২৩ সালের ৪ঠা এপ্রিলের সংখ্যায়। সেই প্রতিবাদের সুর সেই পত্রিকায় উদ্ধৃত একটি ফার্সী বয়েতেই স্পষ্ট:

আব্রুকে বা-সদ্ খুন-ই জিগর বস্ত্ দিহদ্
বা-উমেদ্-ই করম্-এ খাজা, বা দারবান মা ফরোশ।

অর্থাৎ—"যে সম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্দুর বিনিময়ে ক্রীত," ওহে মহাশয়, কোন অনুগ্রহের আশায় তাহাকে দারোয়ানের নিকট বিক্রয় করিও না।"[৫১]

এই প্রতিবাদের পর রামমোহন কাগজ তুলিয়া দেন।

১৮১৭-৩৫—স্কুলের সংখ্যার বৃদ্ধি, শিক্ষার বিস্তার ও শিক্ষা-সম্বন্ধীয় নানা সংস্কার। [এখানে এই কথা মনে রাখা দরকার যে রামমোহন কখনও ইংরাজী মাধ্যমের কথা বলেন নাই, বলিয়াছেন প্রতীচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার কথা।] হিন্দু কলেজ হইতে শিক্ষিত যুবকবৃন্দের প্রথম দলের আবির্ভাব। [শিক্ষা বিস্তারে দেশীয়দের অবদান আগেই আলোচিত হইয়াছে। এখানে শুধু উল্লেখমাত্র করা হইল।]

১৮১৭-১৮—কটকে পাইকদের উত্থান।

১৮২১—রামমোহনের ইউনিট্যারিয়ান কমিটি স্থাপন।

১৮২১—নেপলস্‌বাসীগণের পুনর্বার দাসত্বে সিল্ক বাকিংহামের নিকট রামমোহনের ক্ষোভ প্রকাশ।

১৮২৩—স্পেনের হাত হইতে দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশগুলির মুক্তি-লাভ। রামমোহন কলিকাতায় ভোজ-সভার আয়োজন করেন।

যখন রামমোহনের এই আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রকট হইতেছিল তখন কিন্তু "এদেশে জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রনীতির আলোচনা ছিল না বলিলেই হয়। রামমোহনই এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক।"[৫২]

১৮২৮—ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা।

১৮২৮—Derozioর হিন্দু কলেজে যোগদান।

১৮২৮-২৯—সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন।

১৮৩০-৫০—আসামে ইংরাজ অধিকার স্থাপনের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী গণ-বিক্ষোভ।

১৮৩০—রামমোহনই প্রথম বাঙালী যিনি বিলাত যান। সেখানে জেরেমি বেন্থামের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ। কোনো ভারতবাসীর পক্ষে স্বয়ং বিলাত গিয়া ভারতের কথা কর্তৃপক্ষের গোচর করার প্রচেষ্টা এই প্রথম। এবং তাহাতে কিছু কিছু সুফল ফলাও এই প্রথম। বিলাতে থাকাকালীন রামমোহন 'ফ্রান্স-ভ্রমণের ছাড়পত্র চাহিয়া যে পত্রখানি রচনা করেন, তাহার একটি নকল বিলাতের ইণ্ডিয়া অফিসে আছে। ইহাতে দেশ ও জাতি-নির্বিশেষে মানবের ঐক্যের বাণী পরিস্ফুট হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, সেকালেও যে রামমোহনের মনে একটি জাতিসংঘ-গঠনের পরিকল্পনা জাগিয়া-ছিল, তাহাও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।'[৫২ক]

১৮৩০—রাধাকান্ত দেবের ধর্মসভা স্থাপন। ব্রাহ্মসমাজের নবনির্মিত গৃহে প্রবেশ।

১৮৩০—Alexander Duffএর কলিকাতায় আগমন; Duff ও

Dealtry সাহেবের বক্তৃতায় দলে দলে ছেলেদের যোগদান; Duffএর রামমোহনের সাহায্যে স্কুল স্থাপন।

১৮৩১—রক্ষণশীলদের প্ররোচনায় Deroziocকে হিন্দুকলেজ হইতে বিতাড়ন; প্রতিক্রিয়ার শক্তির কাছে কর্তৃপক্ষের নতিস্বীকার।

১৮৩১—বারাসাতে ওয়াহাবীদের অভ্যুত্থান।

১৮৩১-৩২—সিংভূমে কোল বিদ্রোহ। এবং ইহার পরেই ১৮৩২-এ মানভূমে ভূমিজদের আন্দোলন। ইহা গঙ্গানারায়ণের হাঙ্গামা বলিয়া ইতিহাসে কথিত।

১৮২৯-৩৩—উত্তর-পূর্ব সীমান্তে খাসিয়াদের বিদ্রোহ।

১৮৩৩—মৈমনসিংহে পাগলপন্থীদের বিদ্রোহ।

১৮৩২—কৃষ্ণমোহন খ্রীষ্টান হইলেন। ১৮৩৫এ তাঁহার প্রণয়িনী বিন্ধ্য-বাসিনী দেবীর তাঁহাকে স্বীকরণ।

১৮৩৫—কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপিত হইল এবং আলাল-খ্যাত প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান হইলেন। [অবশ্য তখনও তিনি ঐ গ্রন্থ রচনা করেন নাই।]

১৮৩৮-৪৭—ফরাজীদের বিদ্রোহ।

১৮৪২—দ্বারকানাথ ঠাকুর George Thomsonকে প্রথম এই দেশে লইয়া আসেন; রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিরা বিধবাবিবাহের আন্দোলন শুরু করেন।

১৮৪৩—দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ; Bengal British India Society স্থাপন; **মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ।**

১৮৪৪-৫০—কাছাড়ে কুকিদের দীর্ঘ প্রতিরোধ আন্দোলন।

১৮৪৪—সঙ্গে চারিজন চিকিৎসা-বিদ্যার ছাত্র লইয়া দ্বারকানাথের দ্বিতীয়বার বিলাত গমন।

১৮৪৬—উড়িষ্যায় খোণ্ডদের বিদ্রোহ।

১৮৪৯—অসাম্প্রদায়িক ও ঐহিক ভিত্তিতে শিক্ষা দিবার জন্য বেথুনের বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন।

১৮৫১—Bengal Landholders' Association এবং British India Society এক হইয়া British Indian Associationএ পরিণত হইল। ইহাতে ঘটিল নবীন, প্রাচীন, সনাতনী ও বিপ্লবীর মিলন। সরকারের সঙ্গে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আলাপ-আলোচনার একটি কার্যকরী মাধ্যম সৃষ্টি হইল। ইহাতে কোনো ইংরাজ সভ্য ছিল না।

১৮৫১-৫২—বিধবাবিবাহের তীব্রতর আন্দোলন। যে কোনো সম্ভ্রান্ত হিন্দু-সন্তানকে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশাধিকার দান।

১৮৫৫—সাঁওতাল বিদ্রোহ ও সেই বিদ্রোহ দমনে নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা। সরকার এই বিদ্রোহকে যে সরকারকে উচ্ছেদ করার প্রচেষ্টা হিসাবেই দেখিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ তাঁহাদের ক্ষমা-জ্ঞাপনের ফরমানেই স্পষ্ট : In as much as it appears that amongst the Santals, ***who have risen in rebellion against the government,*** plundering and devastating the country and opposing the troops, there are many who see the folly and iniquity of their proceedings etc." [৫৩] বিস্ময়ের কথা এই যে নীলবিদ্রোহ সম্পর্কে যে সহানুভূতি বাঙালীর মনে জাগিয়াছিল, সাঁওতালবিদ্রোহের প্রতি সে সহানুভূতি জাগে নাই। শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত, অন্তত কথা-বার্তায়, সভাসমিতিতে, যেমন সিপাহীবিদ্রোহকে সুনজরে দেখে নাই তেমনি এই সাঁওতাল বিদ্রোহকেও দেখে নাই। তৎকালীয় একটি ছড়াতেই এ মনোভাব প্রকট :

লোকের কি যন্ত্রণা, কি লাঞ্ছনা করলে সাঁওতালে।
কত গর্ভবতী রাস্তায় প্রসবিলে ছেলে॥
এমনি সর্ব্বত্তরে লুট করে বেড়াল সাঁওতাল।
মনুষ্য কি কথা দেবতা পালাল গোপাল॥[৫৪]

এই সূত্রে মনে পড়ে ঈশ্বরগুপ্ত মহাশয়ের শিখযুদ্ধজয়ী ইংরাজের প্রশস্তি। সমাজদেহের বিভিন্নস্তরের বিভিন্নশ্রেণীর এই বিভিন্ন মনোভাবে আমাদের দিগ্‌ভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা খুবই বেশী। এক শ্রেণী বিদ্রোহ করিতেছে আর এক শ্রেণী ইংরাজ-শাসনকে কল্যাণকর বলিয়া মনে করিতেছে—ইহা ভাবিবার কথা বৈ কি। ভাবনার নিরসনের ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের, এবং ক্রমান্বয়ে অর্থনৈতিক অধঃপতনে নিঃসহায় কৃষকের ইংরাজ শাসনের প্রতি মনোভাবের পার্থক্যে। অবশ্য সাঁওতালদের বিদ্রোহ প্রথমেই ইংরাজের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে পর্যবসিত হয় নাই; উহা ছিল সুদখোর মহাজনদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজে' সাঁওতাল বিদ্রোহের উল্লেখই করেন নাই। ইহা হইতেই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনোভাব বুঝিতে পারা যাইবে।

১৮৫৬—বহু-বিবাহ নিবারণের জন্য বিদ্যাসাগরের আন্দোলন শুরু। বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে প্রথম বিধবাবিবাহ। ইহাতে "বঙ্গদেশে যে আন্দোলন উঠিল, তাহার অনুরূপ জাতীয় উত্তেজনা আমরা অল্পই দেখিয়াছি।"[৫৫]

১৮৫০-৫৭—লর্ড ডালহৌসীর স্বত্বলোপ নীতি (Doctrine of Lapse)। ইহার ফলে জমিদার ও রাজন্যদের ক্ষোভ এবং দেশের জনসাধারণের মনেও এক প্রকার আশঙ্কার উদয় হইল। ইহারই প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে ঝাঁসীর দত্তক-গ্রহণ ও নানাসাহেবের দত্তকের অধিকার অসিদ্ধ হইল। এবং নূতন ভূমি-আইনের বলে যুক্তপ্রদেশে পত্তনীদারদের পর্যন্ত অধিকার ক্ষুণ্ণ হইতে লাগিল। মনে রাখিতে হইবে বাংলাদেশে যে সিপাহীরা বিদ্রোহ করিয়াছিল তাহাদের বেশীর ভাগই আসিয়াছিল এই উত্তরপ্রদেশ হইতে। সিপাহী বিদ্রোহের আসল কারণ টোটায় শূকর এবং গরুর চর্বি নহে। এ বিষয়ে শিব-নাথ শাস্ত্রীও অকারণ এই গুলির উপর জোর দিয়াছেন।

১৮৫৭—ইংরাজদের সাধারণ ফৌজদারী দণ্ডবিধির আওতায় আনিবার জন্য রচিত খসড়ার বিরুদ্ধে ইংরাজদের আবার আন্দোলন। বিলাত হইতে আবার Thomsonএর আগমন এবং Town Hallএর সভায় তাঁহার বক্তৃতা।

১৮৫৭—সিপাহী বিদ্রোহ। ইহা শুরু হয় কলিকাতার অন্তঃপাতী ব্যারাকপুরে কিন্তু যে সিপাহীরা বিদ্রোহ করে তাহারা বাঙালী নহে। এই বিদ্রোহে সাধারণ শিক্ষিত বাঙালী সিপাহীদের স্বপক্ষে ছিলেন না। বাঙালীরা যে এই বিদ্রোহ সমর্থন করেন নাই ইহাই ছিল বিখ্যাত হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার মূল প্রতিপাদ্য। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে শিক্ষিত বাঙালীর প্রচুর শোকোচ্ছ্বা-সের কারণই হইল বাঙালীকে তৎকালীয় রাজরোষ হইতে তাঁহার পত্রিকার মারফৎ বাঁচাইবার সফল চেষ্টা। তাঁহার স্মৃতিরক্ষাকল্পে আহূত জনসভায় কৃষ্ণনগরে দীনবন্ধু মিত্র বলিয়াছিলেন, "গত '৫৭ সালের মিউটিনির সময়, যে সময় সেপাইগণ রাজবিদ্রোহিতা করিয়াছিল সে সময় হরিশবাবু যে ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা কখনই ভুলিতে পারিব না। সে কথা মনে করিতে গেলে আমার অন্তঃকরণ অদ্যকার সভার সমুদায় লোকের অন্তঃকরণ ও ভারতবর্ষের সমুদায় লোকের অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হয়। সেপাই-দিগের অত্যাচারে ভারতবর্ষের প্রায় যাবতীয় ইংরাজলোকে রাগান্ধ হইয়া ভারতবর্ষের সমুদায় লোকের প্রাণ সংহার করিবার জন্য চীৎকার ধ্বনি করিতে লাগিলেন, তখন কাহার সাধ্য তাঁহাদের এই অসংগত মতে বিমত করে, তখন তাঁহাদের মতকে অন্যায় মত বলিলে ফাঁসি হয়, তখন তাঁহাদের বিরুদ্ধে একটি কথা কহিলে, তদ্দণ্ডে কাটিয়া ফেলে। আমরা কোন কীটস্য কীট। গবর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং তাঁহাদের মতকে অন্যায় মত বলিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার কত চেষ্টা হইয়াছিল। এই ভয়াবহ সময়ে আমাদের হরিশ্চন্দ্র, আমাদের হিন্দু বন্ধু হরিশ্চন্দ্র, আমাদের সাহসী হরিশ্চন্দ্র

চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। এক দিকে তিনি তাঁহার লেখনী দ্বারা স্বদেশের লোকদিগকে মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দে সাহস দিতে লাগিলেন। আর দিকে রাগান্ধ ইংরেজদিগের মতকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে লাগিলেন। এবং যে সদুপায় দ্বারা রাজবিদ্রোহিতা একেবারে নিরাকৃত হইবে এবং ইংরাজ-রাজ্য ভারতবর্ষে সগৌরবে চিরস্থায়ী হইবে তাহার প্রস্তাব করিতে লাগিলেন।.... মহাত্মা লর্ড ক্যানিং সাহেবের জন্যে এবং আমাদের হরিশের জন্যে আমরা অন্যায় অপমৃত্যু হইতে রক্ষিত হইয়াছি।"[৫৬]

"সিপাহীবিদ্রোহ কেবল কুসংস্কারাচ্ছন্ন সিপাহীগণের কার্যমাত্র, দেশের প্রজাবর্গের তাহার সহিত যোগ নাই।"[৫৭] তৎকালীয় কবি-সার্বভৌম ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই বিদ্রোহকে দেখিতে পারেন নাই, ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈকে পর্যন্ত তিনি কুৎসিত ভাষায় গালি দিয়াছেন—নানা সাহেব, কুমার সিংহকে ত বটেই।

হুতোম মিউটিনির যে নকসা দিয়াছেন তাহাতে বাঙালীর ভীরুতার সমালোচনাই বেশী এবং সমগ্র ব্যাপারটি যে একটি হুজুকমাত্র ইহাই তাঁহার প্রামাণ্য; অবশ্য হুতোম ঐ রচনা শৈলীর আড়ালে হয়ত সত্যই তাঁহার মনঃক্ষোভ ঢাকিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিগত মনোভাব যাহাই হউক না কেন সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর যে চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন তাহাতে বাঙালীর বিদ্রোহ-বিমুখতাই প্রমাণ হয়: "একদিন আমরা মিছেমিছি ঘুরে বেড়াচ্চি। এমন সময় শুনলেম, পশ্চিমের সেপাইরে ক্ষেপে উঠেচে, নানা সাহেবকে চাঁই করে ইংরেজের রাজত্ব নেবে....।" ইহাতেই বুঝা যায় যে এই বিদ্রোহের জন্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর কোনো মানসিক প্রস্তুতিই ছিল না। "....মার্শাল লা জারি হলো, যে ছাপাযন্ত্রের কল্যাণে হুতোম নির্ভয়ে এত কথা অক্লেশে কইতে পাচ্চেন, যে ছাপাযন্ত্র কি রাজা কি প্রজা কি সেপাই-পাহারা কি খোলার ঘর, সকলকে এক রকম স্থাখে, ব্রিটিশ কূলের সেই চির-পরিচিত ছাপাযন্ত্রের স্বাধীনতা মিউটিনি উপলক্ষে কিছু কাল শিকলি পরলেন। বাঙ্গালিরে ক্রমে বেগতিক দেখে গোপাল মল্লিকের বাড়িতে সভা করে সাহেবদের বুঝিয়ে দিলেন যে, যদিও এক শ বছর হয়ে গ্যালো, তবু তাঁরা আজও সেই হতভাগ্য ম্যাড়া বাঙ্গালিই আচেন—বহু দিন ব্রিটিশ সহবাসে ব্রিটিশ শিক্ষায় ও ব্রিটিশ ব্যবহারেও আমেরিকানদের মত হতে পারেননি। (পারবেন কি না, তারও বড় সন্দেহ।) তাদের বড় মানুষদের মধ্যে অনেকে তুফানের ভয়ে গঙ্গায় নৌকো চড়েন না—রাত্তিরে প্রস্রাব কত্তে উঠতে হলে স্ত্রীর বা চাকর-চাকরাণীর হাত ধরে ঘরের বাইরে যান, অস্তরের মধ্যে টেবিল ও পেননাইফ ব্যবহার করে থাকেন। যাঁরা আপনার ছায়া দেখে ভয় পান—তাঁরা যে

লড়াই করবেন এ কথা নিতান্ত অসম্ভব।.........মিউটিনির হুজুক শেষ হলো —বাঙ্গালিরা ফাঁসি-ছেঁড়া অপারাধীর মত সে যাত্রা প্রাণে প্রাণে মান বাঁচালেন, কারু নিরপরাধে প্রাণদণ্ড হলো, কেউ অপরাধী হয়েও জায়গীর পেলেন"।[৫৮]

ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা এই বিদ্রোহ সম্পর্কে বলেন: To Indians the mutiny has remained a bitter memory.····The two facts most firmly imprinted on the Indian mind were the failure of the rebel leaders to take advantage of their early success, and the ferocity with which martial law was administered and the rebels were hunted down....It is absurd to imagine that they did not affect profoundly the millions who remained passive, and had viewed events with the philosophy of a race which has seen many empires pass."....“For four months during the summer of 1857 it seemed that the mutiny might develop into a real war of Independence, which would make re-conquest impossible. By September it was clear that the Indians who were in revolt were incapable of working to any settled plan or of subordinating themselves to a national leader...."

"Paradoxically it is an article of faith amongst Indian nationalists to describe the mutiny as a war of Independence. This may be due to the proscription of Savarkar's *War of Indian Independence of 1857*, a book which states the Indian case with force but with little critical acumen. It is a poor compliment to Indian courage and ability to treat the revolt as an organised national movement. It was repressed by a minute force. Its leaders, when in a position to prove their competence as rulers, were a failure. Historical accuracy as well as respect for Indian ability, makes it requisite to stress the ***small part taken in the revolt by the better elements in the country.***"

তবু ঐতিহাসিক বলিতেছেন, "It is not immediately obvious

why the mutiny should have had such a powerful influence upon later generations of Indians and English."

বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে বলিতেছেন, "The mutiny may be considered either as a military revolt or as a bid for recovery of their property and privileges by the dispossessed princes and landlords, or as an attempt to restore the Moghul Empire, or as a peasants' war. From every aspect it was localised, restricted and unorganised. Only one of the three provincial armies rebelled, and it is doubtful if a quarter of the sepoys were ever in arms against the government....Of the fifty million Muslims in India only three men out of every ten thousand can have rallied to their restored emperor." তবু—"Most contemporary histories, letters, and diaries dilate upon the racial bitterness displayed by the Muslims who were usually assumed to be the real instigators of the mutiny. It is difficult to explain the view, held almost universally amongst the British, that the mild Hindu was suffering from some temporary aberration but that the Muslims were our implacable foe."

আবার ইহাও বলিতেছেন, "The mutiny cannot be dismissed as an unhappy incident which ended with its suppression. It would be wiser to use a medical simile, and consider it as the primary symptom of a deep-seated disorder—the reaction of India against the too rapid introduction of western ideas and the limited scope left to the Muslim and the Hindu upper classes. The primary symptoms were cured drastically and effectively but the very success of the extremely ruthless methods employed added to the difficutly of diagnosing and treating the disease when the inevitable secondary symptons began to appear a few years later."[৫৯]. সত্যই ইহার পরে নীলবিদ্রোহ, গারো বিদ্রোহ,

ইত্যাদি ঘটিতেই লাগিল[৬০]। সর্দার পানিক্করের মতে কিন্তু "Though the kingdoms and states of India were thus annexed or reduced to dependence, the people of India made one last effort on a national scale to recover their freedom. The great Rebellion of 1857-8 was a desperate attempt led by the former ruling classes"....[৬১]। ইহার পাশাপাশি রাখিতে ইচ্ছা করে British Indian Association এ দক্ষিণামোহন মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য: "Misguided wretches who have taken a part in this rebellion, and thereby disgraced their manhood by drawing arms aganist the very dynasty whose salt they have eaten, to whose paternal rule they and their ancestors have for the last hundred years owed the security of their lives and properties, and which is the best ruling power that we have had the good fortune to have within the last ten centuries, and addressing as I am a society, the individual members of which are fully familiar with the thoughts and sentiments of their countrymen, and who represent the feelings and interests of the great bulk of of her majesty's native subjects, I but give utterance to a fact patent to us all, that the govt. have done nothing to interfere with our religion, and thereby to afford argument to its enemies to weaken their allegiance. [৬২] কিন্তু এইগুলির সঙ্গেই আবার স্মরণ রাখিতে হইবে আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের তাঁতিয়া টোপীর উপর কবিতা। ইহা বিহারীলালের পূর্ণিমা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই কবিতাটি যে জনপ্রিয় হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় সেটির তৎকালীন পাঠ্যপুস্তকে সঙ্কলিত হইবার সম্ভাবনায়। কিন্তু "পাছে রাজশক্তির বিরুদ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত হয় এই ভয়ে সেটিকে" বাদ দেওয়া হইয়াছিল।[৬৩] **তাহা হইলে তাঁতিয়া টোপীর সমর্থনমূলক কবিতাও সেকালে প্রকাশিত ও জনগ্রাহ্য হইয়াছিল।** ১৮৭২ সালে ভারতী পত্রিকায় ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাই-এর প্রশস্তিমূলক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল 'শ্রী স' ছদ্মনামে। এই প্রবন্ধের মূল বক্তব্য হইল, "যাঁহারা এই বিদ্রোহে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, অযথা ধারণ করিলেও, তাঁহারা বীর। ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য যে ইঁহাদের

ইতিহাসও বিদেশীদের গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিতে হয়। আমরা ঝান্সীর রাণীকে নমস্কার করি।”৬৪

এই সকল সমসাময়িক উদ্ধৃতি ও পরবর্তী কালের ইংরাজ ঐতিহাসিকদের মত হইতে স্থির করা শক্ত সিপাহীবিদ্রোহকে শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত ঠিক কি চোখে দেখিয়াছিল। উচ্চ মধ্যবিত্তেরা নিশ্চয়ই ভালো চোখে দেখেন নাই। কিন্তু কালীপ্রসন্ন সিংহের তৎকালীন বাঙালীচরিত্রের বর্ণনা হইতে ইহা মনে না হইয়া পারে না যে গোপাল মল্লিকের বাড়ী সভা করিয়া ইংরাজদের প্রতি আনুগত্য দেখানোটাকে তিনি বাড়াবাড়ি মনে করিয়াছিলেন। এদিকে আবার কৃষ্ণকমল যেমন তাঁতিয়া টোপীকে সমর্থন করিয়া কবিতা লিখিলেন তেমনি আবার দক্ষিণারঞ্জন প্রমুখেরা বিদ্রোহীদের বলিলেন misguided wretches। Thomson এবং Garrat বিদ্রোহকে আবার peasants' war বা কৃষকবিদ্রোহ বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন। সিপাহীবিদ্রোহের বাঙালী ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্ত এই বিদ্রোহে সাধারণ বাঙালীর অংশগ্রহণের কথা বলেন নাই। পরবর্তী কালে শুধু সাভারকরই নহেন, ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলন-কারীরাও এই বিদ্রোহকে স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাদের মনোভাব অবশ্য বুঝা সহজ কিন্তু সমসাময়িক বাঙালীর মনোভাব না বুঝিলে রঙ্গলাল, মধুস্থদন এমন কি গুপ্তকবিকেও বুঝা যাইবে না। যে গুপ্ত কবি স্বদেশী কুকুরকে বিদেশী মানুষের চেয়ে বেশী মূল্য দিয়াছেন তিনি সিপাহীবিদ্রোহের বীররমণী ঝান্সার রাণীকে কুলটা বলিয়া গালি দিলেন কি করিয়া?

সিপাহীবিদ্রোহের সাধারণ ফলাফল সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী বলিতেছেন: “কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্গদেশের ও সমাজের এক মহোপকার সাধিত হইল; এক নবশক্তির সূচনা হইল; এক নব আকাঙ্ক্ষা জাতীয় জীবনে জাগিল।”৬৫ যদি সিপাহীবিদ্রোহ কুসংস্কারাচ্ছন্ন সিপাহীদেরই পুরাপুরি কীর্তি হয় তাহা হইলে সেই বিদ্রোহ বাঙালীকে এমন উৎসাহিত করিয়া তুলিল কেন? মনে হইতেছে যে এই বিদ্রোহ সম্পর্কে মনের কথাটি খুলিয়া তিনি বলিতেছেন না।

১৮৫৯—নীলের হাঙ্গামা। Hindu Patriot পত্রিকায় হরিশের নীল চাষীদের পক্ষ সমর্থন। দেশব্যাপী আন্দোলন।

১৮৬০—নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদ (**মধুসূদন কৃত**): প্রকাশ ১৮৬১।

১৮৬১—Indigo Commission স্থাপন। এখানে একটি সমস্যা স্বতই আমাদের বিব্রত করে। সিপাহীবিদ্রোহে সাধারণবাঙালী সাড়া দিল না কিন্তু

নীলবিদ্রোহে সারা বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিল—এমন কি সেই ক্ষোভের সার্থক নাটকীয় রূপায়ণও হইয়া গেল। যে হরিশ মিউটিনিকে সমর্থন করেন নাই সেই হরিশ নীলচাষীদের প্রাণে মনে সমর্থন করিলেন। ইহার কারণ কি ?)

১৮৬১—রেভারেণ্ড লং-এর বিরুদ্ধে মকোদ্দমা ও কালী সিংহ মহাশয়ের তাঁহাকে মুক্ত করিবার জন্য আদালত ভবনেই সহস্র মুদ্রা দান।

১৮৬০-৬১—কেশবচন্দ্র সেনের সর্বাঙ্গীণ সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টার শুরু এবং সঙ্গে সঙ্গে নবজাতীয়তার উদ্ভব। "কেশবচন্দ্রের অভ্যুদয়ে—[তৎকালে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সুপরিচিত হন নাই বা তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রভাবও তখন তেমন অনুভূত হয় নাই। নবজাগৃতির প্রথম উচ্ছ্বাসে শিক্ষিত বাঙালী নিজের ঐহিক উন্নতি কামনায় সমাজের ও ব্যক্তির ঐহিক উন্নয়নেই ব্যস্ত ছিল; ঐহিক অপেক্ষা পারলৌকিক যে মহত্তর ও বেশী আদরণীয় তাহা মধু, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম কেহই মনে করেন নাই। বঙ্কিমের সঙ্গে রামকৃষ্ণের একটিবার মাত্র সাক্ষাৎকারে বঙ্কিম রামকৃষ্ণকে যে রূঢ় (অথবা বাস্তব) সত্য শুনাইয়া দেন তাহা সকলেরই সুপরিচিত। ১৮৫৮ হইতে ১৮৭০ এই কালের মধ্যে বাঙালী ব্যক্তিগত ও সাত্ত্বিক প্রচেষ্টায় শুধু ঐহিকতারই সাধনা করিয়াছে। এবং কেশব চন্দ্রের নানামুখী সমাজ-সংস্কারের প্রয়াস সেই সাধনারই অঙ্গীভূত।] —দেশের সর্বত্রই সংস্কারের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। দরিদ্র-নারায়ণ সেবার প্রথম পথপ্রদর্শক ছিলেন কেশবচন্দ্র। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রা ও অযোধ্যা প্রদেশে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়, সে দুর্ভিক্ষে বিপন্ন লোকদের সাহায্যার্থ ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ চেষ্টা করেন।........সাজ-সজ্জা পোষাক-পরিচ্ছদ সর্ববিষয়েই তিনি জাতীয়-ভাবাপন্ন ও স্বাধীন মতাবলম্বী। কখনও তিনি ইউরোপীয় পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন না।"[৬৬] কেশবের পত্রিকা Indian mirror ও সুলভ সমাচারে ইংরাজকে সোজাসুজি নরঘাতক, পশু ইতাদি আখ্যায় ভূষিত করা হইত। ইহা অবশ্য ১৮৭০ এর পরে। ১৮৫৬-১৮৬১ পর্যন্ত কাল সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী বলিতেছেন, "বলিতে কি ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ পর্যন্ত এই কাল বঙ্গসমাজের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ বলিলে হয়। এই কালের মধ্যে বিধবা-বিবাহের আন্দোলন, ইণ্ডিয়ান মিউটিনী, নীলের হাঙ্গামা, হরিশের আবির্ভাব, সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিরোভাব ও মধুসূদনের আবির্ভাব, কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ ও ব্রাহ্মসমাজে নবশক্তির সঞ্চার প্রভৃতি ঘটনা ঘটিয়াছিল।"[৬৭]

ঠিক ইহার বিপরীত চিত্র দেখাইতেছেন রাজনারায়ণ বসু তাঁহার সেকাল

আর একাল গ্রন্থে: "বর্তমান বঙ্গসমাজের রাজ্যবিষয়ক অবস্থাও সন্তোষজনক নহে। আমরা নিশ্চয় জানি যে, আমরা আত্মশাসনে অক্ষম। আমাদিগকে এক্ষণে অনেক দিন পরাধীন থাকিতে হইবে। এক প্রভু গিয়া আর এক প্রভু হইতে পারে, কিন্তু হয়ত সেই প্রভু, আমাদিগের বর্ত্তমান প্রভুরা যত ভাল, তত ভালো না হইতেও পারেন। অতএব এইদেশে ইংরাজদিগের রাজত্ব স্থায়ী হয়, আমরা ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিয়া থাকি। **কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদিগের ইংরাজ রাজ-পুরুষেরা আমাদিগের ন্যায্য আশার পূরণ করেন না।** পূর্বে সাহেবরা এতদ্দেশীয়দিগের প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার করিতেন, এক্ষণে প্রায় সেরূপ ব্যবহার করেন না। এক্ষণে ইংলণ্ড গমনের সুবিধা হওয়াতে এ দেশের প্রতি সাহেবদিগের পূর্বাপেক্ষা মমতা কমিয়া গিয়াছে, আর সেরূপ বাঙালী কর্মচারীর বাড়ীতে গিয়া কোন সাহেব তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করেন না এবং তাহার সন্তানদিগকে আদর করেন না। সে কালের বাঙালীরা তাঁহাদিগের রাজ্য সম্বন্ধীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহারা তত ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিতেন না, তাঁহারা রাজ্যতত্ত্ব তত সূক্ষ্মরূপে বুঝিতেন না, আর সাহেবেরাও তাঁহাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন। এই সকল কারণে তাঁহারা তাঁহাদিগের রাজ্য সম্বন্ধীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতেন। এক্ষণে নানাকারণে চতুর্দিকে অসন্তোষ বৃদ্ধি হইতেছে। ইংরাজী শিক্ষার দ্বারা আমাদিগের **হৃদয়ে উচ্চ উচ্চ বাসনার উদ্রেক হইতেছে, কিন্তু রাজপুরুষেরা আমাদিগের সেই সকল বাসনা পূর্ণ করিতেছেন না।** আমরা গবর্ণমেণ্টের দোষ সকল বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু আমাদিগের হাত পা বাঁধা, সে সকল দোষ সংশোধন বিষয়ে আমাদিগের কোনো কথাই চলে না। গ্রীক পুরাণে লিখিত আছে যে, ট্যাণ্টেলাস নামক এক ব্যক্তি নরকে একটি অদ্ভুত শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। পিপাসায় আকুল, কিন্তু যেমন সে স্রোতের জল পান করিতে যায়, তেমনি জল তার ওষ্ঠদ্বয় হইতে পলায়ন করে। আমাদিগের দশা সেইরূপ হইয়াছে। আমরা যখন মনে করি যে, রাজ্য সম্বন্ধীয় কোন সুখ লাভ করিলাম, অমনি সেই সুখ আমাদিগের নিকট হইতে পলায়ন করে। আমরা ইংরাজী শিক্ষা না করিতাম; এ বিড়ম্বনা অপেক্ষা সে বরং ভালো ছিল।.... এক্ষণে বিবেচনা করুন,—যখন আমরা শারীরিক বলবীর্য হারাইতেছি,— যখন দেশীয় সুমহৎ সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রের চর্চা হ্রাস হইতেছে,— যখন দেশীয় সাহিত্য ইংরেজী অনুকরণে পরিপূর্ণ, যখন দেশের শিক্ষাপ্রণালী এত অপকৃষ্ট যে তদ্দারা বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ না হইয়া কেবল স্মৃতিশক্তির

বিকাশ হইতেছে, যখন বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে না, যখন স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত,—যখন উপ-জীবিকার আহরণের বিশিষ্ট উপায় সকল অবলম্বিত হইতেছে না,—যখন সমাজ-সংস্কারে আমরা যথোচিত কৃতকার্য হইতে পারিতেছি না, যখন চতুর্দিকে পানদোষ, অসরলতা, স্বার্থপরতা ও সুখপ্রিয়তা প্রবল, যখন আমাদিগের রাজ্য সম্বন্ধীয় অবস্থা শোচনীয়, বিশেষত যখন ধর্মের অবস্থা অত্যন্ত হীন, তখন গড়ে আমাদিগের উন্নতি কি অবনতি হইতেছে, তাহা মহাশয়েরা বিবেচনা করুন।"[৬৮]

এই যুগ সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের অপেক্ষা রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের জ্ঞান আরও বেশী প্রত্যক্ষ। কিন্তু দুইজনের এই প্রায় পরস্পর-বিরোধী (এই বিরোধের অন্যান্য দলীয় কারণ থাকা সত্ত্বেও) মূল্যায়নে আমাদের এই সিদ্ধান্তই করিতে হয় যে ১৮৫৭ হইতে যে যুগ শুরু হইয়াছিল সে যুগে বাঙালীর মানসলোক নব নব ভাবে উদ্দীপ্ত হইলেও বাস্তবজীবনে বাঙালীর প্রসারের বদলে সঙ্কোচনই ঘটিতেছিল এবং তাহার ফলে জমিতেছিল ক্ষোভ। ১৮৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবার তিন বছর পরেই D. M. D. এই আদ্যক্ষরে হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় সম্ভবত একজন বি. এ অভিযোগ করিতেছেন:

"Sir, now that there have been three successive crops of B. A.'s in Bengal, it is pleasing to contemplate the revolution which the establishment of a university has brought on the phases of native ambition. The revie , however, is painfully melancholy. It has almost blighted our brightest prospects....We now find that we have been hitherto labouring under the delusion that the intellectual inferiority of the natives was the only obstacle in the way of the amelioration of their political condition. For though our colleges, before the establishment of the University, produced men no way inferior to its graduates, still there was wanting something in the way of the regular recognition of their merits. Time, however, has dispelled our delusion, opened our eyes and revealed the secret. It has laid open the bare fact—the simple incontrovertible truth—that the natives, with their

minds and manners, must also, if possible, change their colour and creed....They are whites and our conquerors, and as such their superior rights cannot fail to attract notice."[৬৯]

যে চাকুরীর প্রলোভন শিক্ষিত মধ্যবিত্তের উদ্ভবের জন্য দায়ী সেই দুধের ভাঁড়েই যখন হাত পড়িল তখন বাঙালী ক্ষুব্ধ ত হইবেই—তাহার চাওয়া আর পাওয়ার ক্রমবর্ধমান ব্যবধানে তাহার বেদনা, তাহার ব্যর্থতার চেতনা বাড়িতেই থাকিবে।

(এই দ্বন্দ্বমুখর, পরস্পর-বিরোধী চেতনায় ও ভাবধারায় স্থৈর্যহীন, মানুষের অধিকার-সচেতন অথচ সেই অধিকারে বঞ্চিত, অন্তত, মননের ক্ষেত্রে, বিজেতা ইংরাজের সঙ্গে সমকক্ষ হইবার আশায় উন্মুখ, এই যে যুগ—এই যুগই ধৃত হইয়াছে যুগন্ধর মধুসূদনের লেখনীমুখে।

বাস্তবজীবনের সঙ্গে বাসনার, করিতে চাওয়ার সঙ্গে করিতে পারার, সত্যের সঙ্গে আদর্শের (Reality and Ideal) এই যে বিরোধ, এই বিরোধই যুগ-চেতনার মূলে।) ১৮৩৩এর আগে বাঙালী সেরেস্তাদারের উপরে উঠিতে পারিত না ; আর ৩৩এর পরে তাহার স্বপ্নসৌধ হইল ডেপুটি কালেক্টরী—তাহাও আবার রাজনারায়ণ বসু তদ্বির করিয়াও প্রথম দিকে পান নাই। আসল কথা হইল এই যে, উপর উপর সরকার কিছু কিছু সমাজ-সংস্কার ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেও তাহা প্রয়োজন ও চাওয়ার তুলনায় এত অকিঞ্চিৎকর যে তাহাতে অসন্তোষই বাড়িতেছিল আর অন্যদিকে দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ যে কৃষি এবং শিল্প তাহাকে তাঁহারা সমূলে ধ্বংস করিতেছিলেন। সে কথা আমাদের রমেশচন্দ্র দত্তের মুখে শোনাই ভালো :"....The commercial policy of Great Britain towards India in the eighteenth and the earlier years of the nineteenth century....was the same which Great Britain then pursued towards Ireland and her Colonies. Endeavours were made, which were fatally successful, to repress Indian manufacturers and to extend British manufactures. The import of Indian goods to Europe was repressed by prohibitive duties ; the export of British goods to India was encouraged by almost nominal duties. The production of raw material in India for British Industries and the consumption of

British manufactures in India, were the two-fold objects of the early commercial policy of England. The British manufacturer, in the words of the historian Horace Hayman Wilson, "employed the arm of political injustice to keep down and ultimately strangle a competitor with whom he could not have contended on equal terms"....Long before 1858, when the East India Company's rule ended, India had ceased to be a great manufacturing country. Agriculture had virtually become the one remaining source of the nation's subsistence.. But no man familiar with the inner life of the cultivators will say that the extension of cultivation has made the nation more prosperous, more resourceful, more secure against famines. ....In the earlier years of the British rule, the East India Company regarded India as a vast estate or plantation, and considered themselves entitled to all that the land could produce, leaving barely enough to the tillers and the landed classes to keep them alive in ordinary years.... Lord Cornwallis permanently settled the Land Revenue in Bengal in 1793, demanding from landlords 90% of the rental, but assuring them against any increase of the demand in the future. The proportion taken by the government was excessive beyond measure; but cultivation and rental have largely increased since 1793; and the peasantry and the landed classes have reaped the profits....A change then came over the policy of the East India Company. They were unwilling to extend the Permanent Settlement to other provinces. They tried to fix a Proper share of the rental as their due so that their revenue might increase with the rental. In Northern India they fixed their demand first at 83 per cent of the rental, then at 75%, then at 66%. But even

this was found to be impractical, and at last, in 1855, they limited the state demand to 50 per cent of the rental ....An income-tax of 50 per cent on the profits of cultivation is a heavier assessment than is known in any other country under a civilised government. But it would be a gain to India if even this high limit was never exceeded,....But in practice it had been violated. The expenses of the Mutiny wars had vastly added to Indian liabilities, and demanded inrease in taxation. Commerce could not be taxed against the wishes of British merchants and British voters ; the increased taxes therefore fell on agriculture."[১০]

ইহাই হইল তদানীন্তন বাংলা ও ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক বাস্তব ; এবং ইহারই ফলে ঘটিয়াছিল প্রায় অবিরাম বিক্ষোভ ও অভ্যুত্থান। কিন্তু নূতন আদর্শ ত বাস্তবের দ্বারা সীমাবদ্ধ, ব্যাহত হইতে চাহে না। বাস্তবে এবং আদর্শে সংঘাত হইয়া উঠে অবশ্যম্ভাবী,—রাবণের জ্বলন্ত পৌরুষ নির্বাপিত হয় অবিরাম অশ্রুধারায়,—বীর-রসাত্মক মেঘনাদবধ কাব্যের মর্মে ধ্বনিয়া উঠে করুণ রস,—মধুসূদনের কাব্যের মূল উৎস তাই শোক, বীরের পৌরুষবিলাস নহে [এবং বাল্মীকিরও, তবে কি সামাজিক পরিবেশে তাহা বলা শক্ত]। নূতন জীবন গড়িবার উদ্দীপনায় উন্মুখ বাঙালীর তারুণ্য মুখ থুবড়াইয়া পড়ে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরাধীনতার অনড় পাষাণ-বেদীর সামনে ;—জীবন প্রকাশের পথ না পাইয়া গুমরাইয়া কাঁদিয়া উঠে। সেই কান্নাই ধ্বনিত হইতেছে মেঘনাদবধ কাব্য জুড়িয়া ; আর সেই নূতন উষায়, ভুল ভাঙিবার আগের, কলকাকলি তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে।

যুগমানস

ক

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে যে যুগের অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক রূপরেখা অঙ্কনের চেষ্টা করা হইয়াছে সেই যুগের সাহিত্যলোক কি প্রকারের ছিল। সেই যুগের মানুষ বাস্তব জীবনে যাহা করিয়াছে এবং যাহা করিতে চাহিয়াছে কিন্তু পারিয়া উঠে নাই, যাহার স্বপ্ন দেখিয়াছে কিন্তু সার্থক রূপ দিতে পারে নাই, যে অসার্থকতার জন্য তাহার জীবনে কান্না ঘনাইয়া উঠিলেও সে নীরবে সহ্য করিয়া গিয়াছে কিংবা প্রতিবাদে মুখর হইয়া উঠিয়াছে—সেই পরিপূর্ণ মানসলোকের পরিচয় আছে কেবল সে যুগের সাহিত্যে। বাঙালীর ঊনিশ শতকী নবজাগরণে চিত্রকলা তেমন স্থান পায় নাই। চিত্র আসিয়াছে অনেক পরে। তাই বাঙালী যাহা ভাবিয়াছে তাহার অন্তর্গূঢ় পরিচয় পাইতে হইলে সে যুগের সাহিত্যের বিশ্লেষণ করিতে হইবে। সাহিত্য বলিতে এখানে শুধু সৃষ্টি-মূলক সাহিত্যই বুঝাইতেছে না। সৃষ্টিমূলক ও মননমূলক—অর্থাৎ উপন্যাস, নাটক, রসরচনা, সমালোচনা, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক রচনা—সব কিছুই বুঝাইতেছে। ইহা ছাড়া সে যুগের বাঙালী নিজের মনের কথা বলিবার জন্য এবং ব্যক্তির আবেগ ও জ্ঞান সমাজ-দেহে সঞ্চারিত করিবার জন্য বহু বিদ্বৎ-সভা ও সমিতি স্থাপন করিয়াছিল, বহু পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে স্থাপন করিতে চাহিয়াছিল যোগসূত্র। সেই সব সভা-সমিতি ও পত্র-পত্রিকারও বিশ্লেষণ-মূলক হিসাব লইতে হইবে। তবেই পরিস্ফুট হইবে সেকালের ভাবলোক, যাহার কেন্দ্রে রহিয়াছেন মধুসূদন এবং যে ভাবলোকের মর্মকথাটি তিনিই উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। মধু যে ভুঁইফোঁড় নহেন, তাঁহার আবির্ভাবের জন্য যুগ যে প্রস্তুত হইতেছিল এবং তিনিও যে যুগকে পরিপূর্ণ ভাবে ধারণ করিয়াছিলেন—এই সত্যটি গৌড়জন না বুঝিলে সমাধিফলকের পঙ্‌ক্তি কয়টিতে কবি নিজের যে পরিচয় রাখিয়া যাইতে চাহিয়াছেন, সে পরিচয় আমাদের কাছে অপ্রকটই রহিয়া যাইবে, কেননা আজও মধু আমাদের কাছে আন্তরিক স্বীকৃতি পান নাই। তাঁহার নিজের যুগ তাঁহাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু পরবর্তী যুগে তিনি যেন বাঙালীর মনের একেবারে পশ্চাৎপটে চলিয়া গিয়াছেন—কবিতা পড়িয়া আনন্দ পাইতে হইলে এখন কোনো শিক্ষিত বাঙালী মেঘনাদবধ কি তিলোত্তমাসম্ভব খুলিয়া বসেন না; বড় জোর এক-আধটা চতুর্দশপদী স্কুল-কলেজে পড়ানো হয়।

আমাদের এই বিস্মৃতি নিজেদের আত্মবিস্মৃতিরই নামান্তর। আমরা নিজেদের ঐতিহ্য ভুলিয়া গিয়াছি; হারাইয়াছি ঐতিহাসিক দৃষ্টি। তাই বুঝিতে চাহি না যুগমন্থনজাত কোন গরল পান করিয়া নীলকণ্ঠ মধুসূদন আমাদের জন্য অমৃত রাখিয়া গিয়াছেন। সে যুগের মূলীভূত অন্তর্দ্বন্দ্বকে আর কেহ অমন করিয়া রূপায়িত করিতে পারেন নাই। ইংরাজী সাহিত্যেও যেমন মিল্টন একক গৌরবে শোভমান, বাংলা সাহিত্যেও তেমনি মধুসূদন। এ কথার অর্থ দুইজনের কবি-প্রতিভার তুলনামূলক মূল্যায়ন নহে, শুধু তাঁহাদের দুইজনকে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করা মাত্র।

যুগের এই যে ভাবলোকের কথার সূচনা করা যাইতেছে তাহার ভিত্তিমূল আগের অধ্যায়ে বিশ্লেষিত হইয়াছে। সৌধের সুদর্শন উপরিতলগুলি যেমন মাটির তলায় প্রোথিত ভিত্তির উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তেমনি যুগের ভাবলোকেও অধিষ্ঠিত হয় সমাজের বাস্তব জীবনের বনিয়াদের উপর। সেই বনিয়াদের প্রথম স্তরটি হইল অর্থনৈতিক, দ্বিতীয়টি হইল রাষ্ট্রনৈতিক। ইহাদের উপর গড়িয়া উঠে যে সামাজিক জীবন তাহারই অন্তরের কথা যেন ফেনপুঞ্জের মত উৎক্ষিপ্ত হইয়া ঊর্ধ্বের ভাবলোক নির্মাণ করে। এই বনিয়াদের যে রূপরেখা অঙ্কিত হইয়াছে তাহা হইতেই আমরা সৌধের রূপটি অনায়াসে অনুমান করিয়া লইতে পারি; বলিয়া দিতে পারি যুগের মানসলোকের প্রকৃতিটি কি। সামাজিক জীবনের সঙ্গে ভাবলোকের সম্পর্ক অতি জটিল। কোন সামাজিক পরিস্থিতি শিল্পীর ভাবলোকে কি অনুরণন জাগাইবে তাহা নিয়ন্ত্রিত হয় এমন সব স্থূল-সূক্ষ্ম কার্যকারণের দ্বারা যে কোনো সরল প্রতিফলন-তত্ত্বে (Crude Reflection Theory, or Imitation Theory) সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা খুব বিপজ্জনক। সেইজন্যই আগের অধ্যায়ে আমরা যুগের সামাজিক বনিয়াদের যথাসম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যমূলক বিবরণ দিতে চেষ্টা করিয়াছি। উদ্দেশ্য এই যে, কোনো প্রধান ঘটনা অপ্রধান হইয়া বা অপ্রধান প্রধান হইয়া আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম না ঘটায়। আবার এ কথাও ঠিক যে বাস্তবজীবনে যখনি যাহা ঘটে, বা মানসলোকে যখনি যাহা কিছুর ছায়া পড়ে, তখনই তাহা সাহিত্য-রূপ প্রাপ্ত হয় না। জীবন আর তাহার সাহিত্যিক প্রতিফলনের মাঝে কমবেশী সময়ের ব্যবধান থাকে। তবে ইহার ব্যতিক্রমও যে নাই তাহা নহে। অনেক ক্ষেত্রে ত সাহিত্যিক যুগের আগে আগাইয়া চলেন,—তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারেন। বর্তমান বাস্তবকে বিশ্লেষণ বা আত্মস্থ করিয়া তিনি ইহার কেন্দ্রগ সত্যকে শুধু অনুধাবনই করিতে পারেন না, ইহার গতি বা প্রকাশ কোন পথে কি রূপে হইবে তাহাও উপলব্ধি করিতে পারেন। এইজন্যই হয়ত কবি (সাহিত্যিক)কে

সেকালে prophet, vates ইত্যাদি বলা হইত। এই ভাবিয়াই হয়ত শেলী কবিকে "un-acknowledged legislator of the world" আখ্যা দিয়াছেন। বাস্তব সত্যের সঙ্গে মানস-সত্যের সম্পর্ক এইরূপ জটিল বলিয়া আমরা এখন ভাবলোকের প্রত্যক্ষ বিশ্লেষণে রত হইব।

১৮১৭ সালে যে উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয় মহাসমারোহে স্থাপিত হইল তাহার নাম দেওয়া হইল হিন্দু কলেজ। কেন, মুসলমানেরা কি এদেশের বাসিন্দা ছিলেন না? না তাঁহাদের শিক্ষার প্রয়োজন ছিল না? এ কথা ঠিক যে ফার্সীর প্রাধান্য তখনও আইন-আদালত ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ছিল, এবং সেই কারণে মৌলবীদের প্রাধান্যও ছিল। কিন্তু মুসলমানদের হাত হইতেই রাজ্য ছিনাইয়া লইয়া আবার তাহাদেরই বিশ্বাস ইংরাজেরা করিতে পারে নাই; এবং মুসলমানেরাও, বিশেষ করিয়া শিক্ষিত উচ্চপদস্থ মুসলমানেরাও, তখনই তখনই ইংরাজকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া পরম অনুগত হইয়া উঠিতে পারেন নাই। কিছু পরে ত ওয়াহাবী [ফরাজী] আন্দোলনই হইয়া গেল। সে বিদ্রোহমূলক আন্দোলন ছিল শুধু মুসলমানদেরই, এবং পরিচালিত হইয়াছিল ইংরাজের বিরুদ্ধে। হিন্দুরা সেই আন্দোলনে সম্ভবত উত্যক্তই হইয়াছিলেন, কেন না সমগ্র মুসলিম প্রভুত্বের যুগে নিরাপত্তা ও শান্তি বলিয়া জীবনে কাহারও কিছু ছিল না; ছিল কেবল আকস্মিক আক্রমণ, লুঠ-তরাজ, প্রভু-বদল ইত্যাদি। ইংরাজ আসিয়াই প্রথমে সমাজ ও ব্যক্তির জীবনে নিরাপত্তা ও শান্তি ফিরাইয়া আনিল। তাই হিন্দুরা ইংরাজের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন। মুসলমান ও হিন্দু এক জাতীয়চেতনার মধ্যে নিজেদের ধর্ম-স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দিয়া কখনও এক হইয়া যায় নাই। যে শান্তি মুসলমান প্রভুরা কখনও দিতে পারে নাই, সেই শান্তি ইংরাজ আনিয়া দেওয়ায় ইংরাজের উপর হিন্দুর আস্থা ও শ্রদ্ধা বাড়িল: "They have conferred on the people of India what is the greatest human blessing—Peace."[১১] তাহার উপর ইংরাজেরা এদেশে বসবাস করিয়া চোখের উপর আপন-পর করিতেছে না। তাহারা যাহা পারিতেছে লইয়া যাইতেছে, আর অত্যাচার সকলের উপরেই সমান ভাবে করিতেছে, বরং ওয়াহাবী আন্দোলনের ফলে মুসলমানেরা ইংরাজদের বেশ কিছুটা কোপ-দৃষ্টিতেই পড়িয়াছে। হিন্দুরা তাই এখন নিজেদের স্বাতন্ত্র্য এবং মুসলমানদের প্রতি যুগ-যুগ সঞ্চিত অবজ্ঞা আর ঘৃণা প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইলেন। তাই হিন্দু কলেজের নাম হইল হিন্দু কলেজ। কলেজ কমিটিতে রামমোহনকে পর্যন্ত লওয়া হইল না তাঁহার অহিন্দু মনোভাবের জন্য। কিন্তু ডেভিড হেয়ার থাকিলেন আর

থাকিলেন সব গোঁড়া হিন্দুরা—রামকমল সেন, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি।[৭১খ] কিন্তু ঐ গোঁড়া হিন্দুরা যাহা বুঝিলেন না রামমোহন তাহা বুঝিয়াছিলেন। একবার নূতন শিক্ষা জনমানসে সঞ্চারিত হইলে এই গোঁড়ামির ভিত শুদ্ধ নড়িয়া যাইবে। তাই তিনি বিনা প্রতিবাদে সরিয়া দাঁড়াইলেন কমিটি হইতে। কিন্তু রক্ষণশীলতার ভিত কি অত সহজে নড়ে? অতএব ১৮৩১ সালে ডিরোজিওকে পদচ্যুত করা হইল ছেলেদের মাথা খাইবার অপরাধে।

কিন্তু তাহার আগেই কৃষ্ণমোহন, প্যারিচাঁদ, রসিককৃষ্ণ, রামতনু প্রভৃতির হৃদয়ে নূতন জীবনের আহ্বান তিনি আনিয়া দিয়াছেন। আর সে আহ্বান গভীর হইতে গভীরতরই হইতে লাগিল। যে Deroziocে নীতিনাশের অপরাধে তাড়াইয়া দেওয়া হইল, সেই Derozioর সংস্পর্শে ছাত্রেরা কি ভাবে গড়িয়া উঠিতেছিল তাহার বিবরণ দিয়াছেন তাঁহার জীবনীকার এডোয়ার্ডস সাহেব: "The students of the first, second and third classes had the advantage of attending a Conversazione established in the school by Mr. Derozio, where readings in poetry, and literature, and moral philosophy were carried on. The meetings were held almost daily after or before school hours. Though they were without the knowledge or sanction of the authorities' yet Mr. Derozio's disinterested zeal and devotion in bringing up the students in these subjects was unbounded, and characterised by a love and philanthropy which, up to this day, has not been equalled by any teacher either in or outside the service. The students in their turn loved him most tenderly; and were ready to be guided by his counsels and imitate him in all their daily actions in life. In fact Mr. Derozio acquired such an ascendancy over the minds of his pupils that they would not move even in their private concerns without his counsel and advice. On the other hand, he fostered their taste in literature; taught the evil effects of idolatry and superstition; and so far formed their moral conceptions and

feelings, as to place them completely above the antiquated ideas and aspirations of the age. Such was the force of his instructions, that the conduct of the students *out of the College was most exemplary* and gained them the applause of the outside world, not only in a literary or scientific point of view, but what was of still greater importance, they were all considered men of *truth*. Indeed, the *College boy* was a synonym for *truth*, and it was a general belief and saying amongst our country men, which, those that remember the time, must acknowledge, that 'such a boy is incapable of falsehood because he is a college boy'."[১২]

১৮৫২-৫৩ সালে বেশ্যা হীরা বুলবুলের পুত্রের হিন্দু কলেজে পড়া লইয়া যে আন্দোলন গোঁড়ারা করিলেন তাহাতে অবশ্য তাঁহাদের জয় হয় নাই কেন না হিন্দু কলেজ তাহার আগেই সরকারী হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু রাগের মাথায় এই গোঁড়ারা রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নেতৃত্বে যাহা করিলেন তাহাতে নব্যশিক্ষার আয়োজন আরও বাড়িল বই কমিল না। এবং যে রিচার্ডসন সাহেবের সাহিত্য-পাঠনে মধুসূদন প্রভৃতির মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল সেই রিচার্ডসন সাহেবকেই নব-প্রতিষ্ঠিত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইল।

বিধবাবিবাহের পক্ষে ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সারা দেশকে নাড়া দিতেছিল তাহারও প্রতিবাদ করিতেছিলেন সপারিষদ রাধাকান্ত দেব ও তাঁহার ধর্মসভা। কিন্তু তখনও সিপাহী বিদ্রোহের ফলে ইংরাজদের মনোভাব কঠিন ও সহানুভূতিহীন না হইয়া পড়ায় বিধবাবিবাহের আইন পাশ হইল। সনাতনীরা পারিয়া উঠিলেন না, কিন্তু তবু সমাজ এমনি সনাতনী রহিল যে উপর-তলায় কিছু প্রগতিশীলতা দেখা গেলেও বিধবাবিবাহের মত প্রগতিশীল বিধিও অপ্রচলিতই শুধু রহিয়া গেল না, এখনও উহা লইয়া তর্কাতর্কি হয়। স্বয়ং রাধাকান্ত দেবই এক বিচিত্র ব্যক্তি। জনহিতকর অনেক কার্যে (বিশেষ করিয়া শিক্ষাবিস্তারে) তিনি সহায়তা করিলেও মৌলিক কোনো পরিবর্তনের কথা উঠিলেই তিনি বাঁকিয়া বসিতেন। অনেকে বলেন তাঁহার পৌত্রের ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার ফলেই না কি তিনি বৃন্দাবন চলিয়া যান।

মধুসূদন গুপ্ত যখন প্রথম শব-ব্যবচ্ছেদ করেন তখন সমাজে যেমন রাখ রাখ রব উঠিয়াছিল, শ্রীশ যখন প্রথম বিধবা-বিবাহ করেন তখনও তেমনি।

অথচ ছুটি ঘটনার মধ্যে বিশ বছরের ব্যবধান। খ্রীষ্টানী বিষ ঢুকিয়া পাছে ছেলের মাথাটি খায় এই ভয়ে রসিককৃষ্ণ মল্লিকের মা না কি ছেলেকে পাগলা গুঁড়া খাওয়াইয়া কাশী পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন.। কিন্তু পাগলা গুঁড়ার চটকা ভাঙিয়া যাওয়ায় রসিক জানালা টপকাইয়া নিজের পথ দেখেন। এমন কি স্বয়ং রাজনারায়ণ বসু পর্যন্ত জাতিভেদ প্রথা সমর্থন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার অব্যবহিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপনয়নে দেবেন্দ্রনাথ যে যজ্ঞগৃহে শূদ্রের উপস্থিতি নিষেধ করিয়াছিলেন ইহা পরে জানিতে পারিয়াও তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হন নাই। আদি ব্রাহ্মেরা শেষ পর্যন্ত এবং বিশেষ করিয়া কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মতবিরোধের পরে সনাতন-পন্থীই হইয়া পড়িয়াছিলেন বলা চলে; এবং সত্যই অক্ষয়কুমার দত্তের আবির্ভাব না ঘটিলে তাঁহারা বোধ হয় বেদের অপৌরুষেয়ত্বেও বিশ্বাস করিয়া যাইতেন। ব্রাহ্মধর্মের প্রভাবকে যাঁহারা প্রতীচ্যের রিফর্মেশনের সঙ্গে তুলনা করেন তাঁহারা রিফর্মেশনের বৃহৎ রাজনৈতিক ফলাফল ও মধ্যযুগের শেষে ইউরোপে বিভিন্ন জাতীয়-রাষ্ট্র গঠনে তাহার দান সম্পর্কে বোধ হয় তত সচেতন থাকেন না। রামমোহনের আদি আদর্শ—পৌত্তলিকতার বিনাশ ও বেদান্তধর্মে আস্থা—দেবেন্দ্রনাথের হাতে নিজের যৌক্তিকতার ভিত্তি অনেকখানি হারাইয়া শেষ পর্যন্ত শুধু খ্রীষ্টধর্মের টাল সামলাইতেই ব্যস্ত হইয়া রহিল। উহার সমাজ সংস্কারিণী শক্তি চলিয়া গেল কেশবচন্দ্রের হাতে। কিন্তু কেশবচন্দ্রের যে বহুমুখী সমন্বয়ন প্রচেষ্টা, তাহার সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মের যোগাযোগ অল্পই। বরং ব্রাহ্মহিসাবে তিনি অবতার-বাদের সৃষ্টি করিতে বসিয়াছিলেন বলিলে কিছু অত্যুক্তি হয় না। এবং রামমোহনের যুক্তিনিষ্ঠ সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়ের বাণীকে কেশব সেন মূর্ত দেখিলেন চরম ভাববাদী (Subjeetive idealist) রামকৃষ্ণের মধ্যে। সে-ও ১৮৭০ সালের পরে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সেকালের যাঁহারা প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি—বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডিরোজিও-র শিষ্যেরা, এমন কি বঙ্কিম পর্যন্ত,—রামকৃষ্ণকে কোনো আমলই দেন নাই। যখন নবজাগ্রত বাঙালীর বাস্তব জীবনে পরিপূর্ণতা লাভ করিবার মোহ ভঙ্গ হইল তখনই সে ঝুঁকিল অধ্যাত্ম পরিপূর্ণতার দিকে—রামকৃষ্ণের দিকে,—তাহার আগে নয়। সেইজন্য অধ্যাত্ম চিন্তা ও ধর্ম-জিজ্ঞাসা বঙ্কিমকে প্রচুর প্রভাবিত করিলেও মধুসূদনকে করে নাই। মধুসূদন শুধু ব্যক্তির পৌরুষ-সাধ্য ঐহিক পরিপূর্ণতাকেই স্বীকৃতি দিয়াছেন এবং সেই পৌরুষের ব্যর্থতায় বেদনার্ত হইয়াছেন.—ধর্মের মধ্যে সমাধান খুঁজেন নাই;—বরং গতানুগতিক ধর্মবোধকে সচেতনভাবে আঘাত করিয়াছেন।

কিন্তু পরে Derozian রসিককৃষ্ণও বৈষ্ণব হইয়াছেন, আর প্যারিচাঁদ হইয়াছেন theosophist.

সনাতনীরা আত্মপ্রচার-মানসে ও প্রগতিশীলদের প্রভাব খর্ব করিবার আশায় পত্র-পত্রিকা ও সভাসমিতি চালনা করিতে লাগিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেবের ধর্মসভা হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৭০ সালের কাছাকাছি সনাতন ধর্ম-রক্ষিণী সভা পর্যন্ত এবং সম্বাদ তিমির-নাশক হইতে আরম্ভ করিয়া প্রভাকর, রসরাজ, রস-সাগর (রঙ্গলাল ইহার সম্পাদক হইয়াছিলেন) পাষণ্ড-দলন, যেমন কর্ম তেমনি ফল ইঃ সনাতনীদের নিশান উড়াইতে লাগিল। রাজা রাধাকান্ত দেবের আর রামমোহনের মধ্যে যে বিরোধ, সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সঙ্গে রামমোহনের যে দেশখ্যাত প্রদর্শনী-বিচার, সেই বিরোধ সেই বিচারই যেন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া সমস্ত যুগকে আচ্ছন্ন করিল। রামমোহন, ডিরোজিও, হেয়ার—সকলেই গতাসু হইলেন ; রাধাকান্ত কিন্তু ১৮৬৭ সালে পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়া গেলেন। তবু সুব্রহ্মণ্য যেমন নতি স্বীকার করিয়াছিলেন রামমোহনের কাছে, প্রতিক্রিয়াও তেমনি প্রগতিশীলতার কাছে শেষ পর্যন্ত নতশীর্ষ হইল। তাই পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ও সভা-সমিতি স্থাপনের ব্যাপারে প্রগতিশীলেরা (বা পরিবর্তন-কামীরা) সনাতনীদের বহুগুণে ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন, এবং সেকালের যে সমস্ত পত্রিকা বা বিদ্বৎ-সভা লইয়া আজ আমরা গর্ববোধ করি তাহার একখানিও বা একটিও বোধহয় সনাতনীদের নহে। অবশ্য তৎকালে পত্রিকা-প্রকাশ করার অর্থই ছিল মুদ্রাযন্ত্রের ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সুযোগ লইয়া মানুষকে স্বাধীন চিন্তা করিতে শিখানো। সে অর্থে সকল প্রকারের পত্রিকা-প্রকাশেরই একটি প্রগতিশীল ফল রহিয়াছে। তাহা ছাড়া সনাতনীদের বক্তব্য সাধারণের সম্মুখে স্পষ্টীকৃত হওয়ায় প্রগতিকামী উত্তরপক্ষেরই যে শুধু সুবিধা হইল তাহা নহে, এই পারস্পরিক দ্বন্দ্বে যে মধ্যপন্থা উদ্ভূত হইল তাহারই শ্রেষ্ঠ ফল বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল, দেবেন্দ্রনাথ, বঙ্কিম ইত্যাদি। **মধুসূদন প্রথম দিকের চরম-পন্থী ; তিনি আপোষ কিংবা সমন্বয়ের কথা ভাবিতেই পারেন না।**

প্রগতিকামীদের পত্রিকা প্রকাশের শুরুতেই পাই স্বয়ং রামমোহনকে। তিনিই প্রথম বাংলা, ইংরাজী ও ফার্সীতে সংবাদ-পত্র প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং মোটামুটি সকল দেশেই যেমন গদ্যের জন্ম হয় ধর্মীয় বাদ-বিসম্বাদ সকলের গোচরীভূত করিবার চেষ্টার ফলে, কলিকাতাতেও রামমোহনের পত্রিকা-প্রকাশের অব্যবহিত ও প্রত্যক্ষ কারণ তাহাই। তাঁহার সম্বাদ-কৌমুদী, মিরাৎ-উল-আকবর এই জাতীয় উচ্চকোটির পত্রিকার সূচনা বলা

যাইতে পারে। ইহার পরেই একে একে যে সকল পত্র-পত্রিকা ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হইতে লাগিল সেগুলিকে বাঙালীর নবজাগরণের একেবারে প্রত্যক্ষ বাহক ও ধারক বলা যাইতে পারে :

(কয়েকটি) পত্রিকা : Athenaeum } Derozio
East Indian }
Enquirer—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় : Derozian
Hindu Intelligencer—কাশীপ্রসাদ ঘোষ : Derozian
জ্ঞানান্বেষণ—রসিককৃষ্ণ মল্লিক—Derozian
বিজ্ঞানসেবধি—কাশীপ্রসাদ ঘোষ
বিজ্ঞানসার সংগ্রহ—গঙ্গাচরণ সেন ও নবকুমার চক্রবর্তী
Literary Register—John Drummond —(ইঁহারই স্কুলে ডিরোজিও পড়িয়াছিলেন)
Bengal Spectator—Ramgopal Ghose : Derozian
British Indian Advoate—(বিলাতে প্রকাশিত) : Adam
The Quill—তারাচাঁদ চক্রবর্তী : Derozian
বিবিধার্থ সংগ্রহ } রাজেন্দ্রলাল মিত্র
রহস্য সন্দর্ভ }
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—অক্ষয়কুমার দত্ত
মাসিক পত্রিকা—প্যারিচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার

এই সকল পত্র-পত্রিকা নূতন-জাগা বাঙালীর মানসিক বিস্তার ও সর্বগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। নূতন বাংলার মানুষ যেন গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া একলাফেই পশ্চিমের সমকক্ষ হইতে চাহিতেছে—ভাবিয়া দেখিতেছে না যে রাজনৈতিক পরাধীনতা তাহার সকল সার্থকতার পথ, ঐ বাঁকের পরেই, রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। তাই কৃষ্ণমোহন গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া Inquirer পত্রিকায় নিষ্ঠুর আক্রমণ করিতেছেন গুড়ুম সভা (ধর্মসভা) এবং তদ্রক্ষিত সনাতনী মনোভাবকে। সামাজিক কুসংস্কার, যুক্তিহীন আচারপরায়ণতা ও ভণ্ডামিই কৃষ্ণমোহনের আক্রমণের একমাত্র লক্ষ্য। তাঁহার ইংরাজীতে লেখা The Persecuted [৭৩] নাটকেও আক্রমণের একমাত্র লক্ষ্য এই সনাতন, সৃষ্টিপ্রেরণাহীন সমাজ—যে সমাজের কাছে স্নেহের অপেক্ষা

যুক্তিহীন আচারই বড় কথা—যাহার জন্য নিজের মাতামহের গৃহ ছাড়িয়া তাঁহাকে এক কাপড়ে পথে আসিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছিল। তিনি Enquirerএ লিখিলেন গুড়ুম সভার বিরুদ্ধেঃ "The bigots are up with their thunders of fulmination. The heat of the Gurum Sabha is violent, and they know not what they are doing. Excommunication is the cry of the fanatic; we hope perseverance will be the Liberal's answer. The Gurum Sabha is high; let it ascend to the boiling point. The orthodox are in a rage; let them burst forth into a flame. Let the Liberal's voice be like that of the Roman—a Roman knows not only to act but to suffer.[৭৪] শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিলেন, "সেই পত্রে তিনি নিযাতনকারী হিন্দুগণের প্রতি উপহাস বিদ্রূপ-বর্ষণ করিতে লাগিলেন। নব্যদলের সমর ভেরী বাজিয়া উঠিল।"[৭৫] কৃষ্ণমোহন নিজেই সে কথা প্রথম সংখ্যাতে বলিয়া দিলেন, "Having thus launched our bark under the denomination of Enquirer, we set sail in quest of truth and happiness." এই শেষের শব্দ দুটির তাৎপর্য গভীর। কোনো একটি পত্রিকার উদ্দেশ্য যে সত্য ও কল্যাণের অন্বেষণ হইতে পারে, এই বৃহৎ ও মহৎ উদ্দেশ্য যে পত্রিকার দ্বারা সাধিত হইতে পারে ইহা নবজীবনসন্ধানী বাঙালী মনীষার অগ্রদূত কৃষ্ণমোহনই বলিতে পারিতেন। শুনিয়া মনে হয় এ যেন এ দেশীয় Tom Paineএর উদাত্ত, গম্ভীর ঘোষণা। জ্ঞানান্বেষণ, বিজ্ঞানসেবধি এবং বিবিধার্থ-সংগ্রহ ও রহস্য সন্দর্ভ প্রভৃতি পত্রিকা কোনো বিশেষ বাদানুবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া শুধু নানা বিষয়ের জ্ঞানের বিকিরণেই ব্যাপৃত থাকিত। কারণ প্রকৃত জ্ঞানের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে স্বতই কুসংস্কার এবং যুক্তিহীন আচার-দাসত্ব লোপ পাইতে শুরু করে; অন্ধ অভ্যাসের বদলে মন তখন কার্যকারণ জ্ঞানের দ্বারা চালিত হইবার চেষ্টা করে। কিন্তু নিছক এই উদ্দেশ্যে কোনো পত্রিকা চালু রাখা আর্থিক দিক দিয়া লাভজনক বা সর্বজনপ্রিয় হইতে পারে না বলিয়া সমাচার দর্পণ জ্ঞানান্বেষণকে উপদেশ দিতেছেন, "অপর তৎপত্র-সম্পাদক মহাশয় যদি বিরক্ত না হন তবে এই পরামর্শ দেওয়া যায় যে কেবল জ্ঞান-কাণ্ড-বিষয়ক প্রকাশ না করিয়া আনুষঙ্গিক কর্মকাণ্ড বিষয়কো কিছু প্রকাশ করেন। কেবল জ্ঞানসম্পর্কীয় পত্র পাঠার্থে জনপদ তাদৃশ পরিপক্ব নয় সকলেই নূতন নূতন সম্বাদ শুশ্রূষায় অনুরক্ত।" কিন্তু দেশীয় ও অন্তর্জাতিক

কর্মকাণ্ডের পরিবেশনেরও ত্রুটি ছিল না। Bengal Spectator, Brtish Indian Advocate, Enquirer, East Indian, Hindu Intelligencer, এবং সর্বোপরি The Quill এই 'শুশ্রূষার' খোরাক জোগাইত। এই সব পত্রিকায় যেমন তথাকথিত Black Actsএর সমর্থনে রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রভৃতি আগুন ছুটাইতেন, তেমনি প্রতীচ্যে তখন যে সকল সমাজ-বিপ্লব ঘটিতেছে তাহার সংবাদও সঠিক পরিবেশন করিতেন। এমনি করিয়া Black Actsএর সমর্থনে যে জাতীয় চেতনা উদ্বুদ্ধ হইতেছিল এবং স্থানীয় ইংরাজদের শাদা রঙ-এর আভিজাত্য প্রচারে ইংরাজের প্রতি যে বিতৃষ্ণা জমিয়া উঠিতেছিল তাহা ফুটিয়া উঠিতেছিল Spectator, Quill এবং Hindu Patriot পত্রিকায় আবার ১৮৩০ এবং ১৮৪৮ এ সারা ইউরোপে যে বিপ্লব বহ্নিমান হইয়া উঠিল তাহারও ধ্বনি এখানে শ্রুত হইল। ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে যাহাদের মন গঠিত হইয়াছে সেই Derozioর শিষ্য 'ইয়ং বেঙ্গল'-এরা ১৮৩০ এবং ১৮৪৮ এর সাধারণতন্ত্রী চেতনার এই স্ফুরণে নিজেরাও বাঙ্ময় হইয়া উঠিলেন। ইউরোপে গণতন্ত্রের অভূতপূর্ব প্রসারে ইঁহাদেরও মনে নাড়া লাগিল। ১৮৩৪ সালের ৫ই নভেম্বর প্রসন্নকুমার ঠাকুরের রিফর্মার পত্রিকায় 'ইংলণ্ডীয়দের রাজ্য বিষয়ে অনেক আশ্চর্য উক্তি ছিল এবং ঐ পত্রে এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতে পরামর্শ দেন।"[৭৬] ইহা ছাড়া এই পত্রিকায় আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ সম্পর্কে এমন অর্থপূর্ণ মন্তব্য করা হয় যাহাতে ভারতে ইংরাজ-রাজত্বের স্থায়িত্ব সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। সমাচার দর্পণ তাই ইহার উপর মন্তব্য করিতেছেন, "বস্তুতঃ দুই ধূমকেতুর সংযোগ হওয়া যেমন অসম্ভব তেমনি এতদ্দেশীয় লোকের দ্বারা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের উচ্চাটন হওয়া অসম্ভব।"[৭৬] সেই ব্রিটিশেরই নীচতা, আত্মাভিমান ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে কলম ধরিতে রামগোপাল ঘোষ দ্বিধা করেন নাই। ইংরাজেরাও প্রতিশোধ লইয়াছিল তাঁহাকে Agri-horti-cultural Societyর সহ-সভাপতির পদ হইতে অপসারিত করিয়া। শিবনাথ শাস্ত্রী এই আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করিতে গিয়া বলিতেছেন, "কালা আইনের বিরোধী ইংরাজগণ জয়যুক্ত হইলেন; যে আন্দোলনের ঝড় উঠিয়াছিল তাহা থামিয়া গেল; মহামতি বীটন পরলোক গমন করিলেন; কিন্তু দেশীয় শিক্ষিতদলের মনে একটা গভীর অসন্তোষ থাকিয়া গেল। একতা ও আন্দোলনের দ্বারা কি হয় তাহা তাঁহারা চক্ষের উপরে দেখিলেন। ইংরাজগণ তাঁহাদের চীৎকার ধ্বনিতে কিরূপে ভুবন কাঁপাইয়া তুলিলেন, কিরূপে দেখিতে দেখিতে শত শত ব্যক্তি একত্র হইলেন, কিরূপে দেখিতে দেখিতে ৩৬ হাজার টাকা তুলিলেন,

এ সমুদয় যেন ছায়াবাজীর ন্যায় তাঁহাদের নয়নের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হইল। রামগোপাল ঘোষ ইংরাজদিগের অবলম্বিত নীতির প্রতিবাদ করাতে এগ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটিতে কিরূপে তাঁহাকে অপমানিত হইতে হইল তাহাও সকলে অবগত আছেন। অনেকে সেই অপমানে আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করিলেন। এই সকল কারণে শিক্ষিত দলের মধ্যে রাজনীতির আন্দোলনের জন্য সম্মিলিত হইবার বাসনা প্রবল হইল। তাঁহারা বুঝিলেন স্বদেশের হিতের জন্য সমবেত হওয়া আবশ্যক।"৭৭

ইউরোপের রাষ্ট্রনীতির বেগ দ্রুততর হইল। ১৮৪৯ সালে ইটালীতে ম্যাৎসিনীর নেতৃত্বে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইল আর ১৮৫০ সালে ঐক্যবদ্ধ প্রাশিয়া রাজ্যের সৃষ্টি হইল। জার্মানীতে নব্যগণতন্ত্রের অভ্যুদয় হইল। ১৮৫৩ সালে East India Company সনদ পুনর্গ্রহণের সময় British Indian Association নানা সংস্কারের দাবী করিয়া পার্লামেণ্টে এক আবেদন করেন। ১৮৫৪ সালে ক্রাইমিয়ার যুদ্ধ এবং জার্মানী এবং ইটালীতে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের দ্রুততর প্রতিষ্ঠার প্রয়াস আরম্ভ হইল।

১৮৫৯ সালে ভিক্টর ইম্যানুয়েলকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া ঐক্যবদ্ধ ইটালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফলে ইটালীতে দেশপ্রেমের জোয়ার বহিল। ১৮৬০ সালে ঘটিল গ্যারিবল্ডির অভ্যুদয় এবং ফ্রান্সে তৃতীয় নেপোলিয়নের ফরাসী সিনেটের অধিকার স্বীকারের ফলে গণতান্ত্রিক চেতনার নূতন উৎসাহের স্ফুরণ। ১৮৬১ সালে আমেরিকার দাসপ্রথা লইয়া ঘটিল গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত; রাশিয়াতে দাসপ্রথার লোপ।

প্রতীচ্যে গণতন্ত্রের এই অব্যাহত অভিযান এবং তাহার মূলীভূত তত্ত্ব বাঙালীকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়াছিল; স্বদেশে তখন কেবল আশাভঙ্গ আর মোহভঙ্গই চলিতেছে কি না। প্রতীচ্যের তত্ত্বে আর প্রতীচ্যের অত্রত্য ব্যবহারে এই বৈষম্যে বাঙালী ইংরাজের স্বভাবজ মহত্ত্বে বিশ্বাস ক্রমান্বয়ে হারাইতেছিল। Drinkwater Bethune ই বোধ হয় শেষ ইংরাজ যিনি উচ্চাপদাকাধিকারী হইয়াও এদেশীয়দের কল্যাণকামী ছিলেন। প্রতীচ্যের ভাবধারা আর প্রতীচ্যের মানুষের মধ্যে এই আত্যন্তিক দ্বন্দ্ব বাঙালীকে ইহা বুঝাইয়া দিল যে নিজের পায়ে নিজে না দাঁড়াইলে, নিজে না গড়িলে, কেহ তাহার হইয়া কিছু গড়িয়া দিবে না। তাই প্রথম দিকের খ্রীস্টানবিরোধী, বেদের অপৌরুষেয়তায় বিশ্বাসী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও অক্ষয়কুমারের যুক্তিবাদের কাছে নতি স্বীকার করিয়া পুনরুজ্জীবন-বাদের (revivalism) ধুয়া ছাড়িতে হইয়াছিল। তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রমুখ অখ্রীস্টান ডিরোজিয়ানদের এবং খ্রীস্টান কৃষ্ণমোহনের যুগ্ম

আক্রমণে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অযৌক্তিক ভাববিলাস কাটিয়া গেল। একদিকে বিবিধার্থ সংগ্রহ (পরে রহস্য সন্দর্ভ) ও অন্যদিকে তত্ত্ববোধিনী সেকালের বাঙালীর মানসিক উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিল। কিন্তু ধর্ম বা আধ্যাত্মিক সমুন্নতি লইয়া তত্ত্ববোধিনীর এই ব্যাপৃতি কিন্তু এক হিসাবে সমাজের বাস্তব সংস্কারের পথ হইতে পশ্চাদপসরণ; এবং সত্য সত্যই আদি ব্রাহ্মেরা দিন দিন এত রক্ষণশীল হইয়া উঠিতেছিলেন যে ভাবিলে আশ্চর্য লাগে ইঁহাদেরই গোষ্ঠীর অক্ষয়কুমার দত্ত একদিন বেদের অপৌরুষেয়ত্ব অপ্রমাণ করিয়াছিলেন এবং মানবপ্রকৃতির সহিত বাহ্যবস্তুর সম্পর্ক বিচার করিয়াছিলেন। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা অন্যান্য বিষয়ের আলোচনাতে এবং বিশেষ করিয়া দর্শনের আলোচনাতে যে যুক্তিবত্তার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল তাহাই সেকালের যুক্তিবাদী মননশীলতার শ্রেষ্ঠ দান।

১৮৫৩ সালে প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার 'মাসিক পত্রিকা' বাহির করিয়া বাংলা গদ্যের বিদ্যাসাগরীয় বা অক্ষয়ী রূপকে শুধু আটপৌরে নয় একেবারে যতদূর সম্ভব-কলিকাতা-হুগলীর কথ্য রূপ দান করিতে বদ্ধপ্রতিজ্ঞ হইলেন। এই দুই চরম রূপের পরীক্ষা-নিরীক্ষা তখনই চলিয়াছিল বলিয়া বঙ্কিম নিজের বাহন সহজেই খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর বীরবলী শৈলী প্রকৃত প্রস্তাবে এই আলালী ঐতিহ্যেরই তৎকালীয় রূপ। কিন্তু 'মাসিক পত্রিকার' কীর্তি অপেক্ষা তাহার পিছনের নীতি আরও বৈপ্লবিক। ওয়ার্ডস্বার্থ যেমন লোকের কথ্য ভাষায় কবিতা লিখিয়া কবিতাকে সর্বগ্রাহ্য করিতে চাহিয়াছিলেন ঠিক তেমনি মিত্র এবং শিকদার ভাষা অতত্রব ভাবকে সর্বজন-গ্রাহ্য করিতে চাহিয়াছিলেন। ভাষা ও ভাবের গণ-তন্ত্রীকরণই এই প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য এবং আদর্শ।

এই গণতন্ত্রীকরণেরই চূড়ান্ত রূপ দেখিতে পাই সেকালের লিপি-সংস্কার প্রচেষ্টায়। ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সংবাদপত্রে সেকালের কথার দ্বিতীয় খণ্ডের (তৃতীয় সংস্করণ) ২০৬-১৩ পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে সেকালের বিস্তৃত আলোচনার পুনর্মুদ্রণ রহিয়াছে। বাংলা অক্ষর-মালাকে রোমান হরফে রূপান্তর করা লইয়া স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যত কথা আজ আমরা বলিতেছি তাহার সব গুলিই সেকালে বলা হইয়াছিল—এমন কি ঐ হরফে 'শ্রীযুত ত্রিবিলিয়ন' সাহেবের উদ্যোগে বাংলা এবং হিন্দী গ্রন্থ পর্যন্ত ছাপা হইয়াছিল: "বাঙ্গলা ও হিন্দুস্থানীয় কতক কেতাব এইক্ষণে রোমাণ অক্ষরে ছাপা হইয়াছে ঐ পত্রের অনেক পাঠক মহাশয়েরা সেই পুস্তক কিনিতে চাহিবেন অতএব তাঁহারদিগকে জানান যাইতেছে যে কলিকাতার লালদীঘির উত্তরপূর্বকোণে পুস্তকালয়কর্তা অষ্টেল

সাহেবের নিকট চিঠি লিখিলে কিম্বা তাঁহার নিকট গেলে অতিঅল্প মূল্যে পাওয়া যাইবে।'[৭৮] এমন কি ফার্সী ভাষার ব্যবহার তুলিয়া দিয়া যখন কাছারীতে বাংলা ব্যবহারের নিয়ম হইল ১৮৩৮-৩৯ সালে, তখন বাংলার সঙ্গে হিন্দীরও প্রচলনের কথা আলোচিত হইয়াছিল। [৭৯]

এক কথায় বলিতে গেলে, দেশের সর্বাঙ্গীণ শুভচিকীর্ষায় উনিশ শতাব্দী বাঙালীর নব নব উদ্ভাবনার কল্পলোকের দ্বার যেন একেবারেই উন্মুক্ত করিয়াছিল। আজও আমরা সে যুগের চিন্তারই চর্বিত-চর্বণ করিতেছি—সেই রোমান লিপি, সেই শিক্ষাবিস্তার ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার সমস্যা লইয়া আমরা এখনও বিব্রত। তখন পরাধীন ভারতবর্ষে তাঁহারা স্বপ্ন দেখিয়াছেন, সফল করিতে পারেন নাই; আজ স্বাধীন ভারতবর্ষে আমরা স্বপ্ন দেখা বন্ধ করিয়াছি কিন্তু একটুও বাস্তব সার্থকতার দিকে অগ্রসর হইয়াছি কি?

সে কালের সভা-সমিতি ও বিদ্বৎ-সংসদগুলিও এই মানস-বৈচিত্র্যের, এই নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির, Reason বা বিচার ও যুক্তিশীলতার এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার জয়গানে মুখর। পত্র-পত্রিকা ও সভা-সমিতির বহুলতা ও বৈচিত্র্য ঊনবিংশ শতকের প্রথম (১৮১৫) হইতে ক্রমবর্ধমান আকারে বাঙালীর বিকাশশীল গণতান্ত্রিক চেতনা, ব্যক্তির সামাজিক দায়িত্ববোধ ও দেশাত্মবোধের অভূতপূর্ব পরিচয় দিয়া আসিতেছে। এমন কি রামমোহনের আত্মীয়সভা, যাহা বর্তমানকালে হইলে শুধু ধর্মালোচনা বা ধর্মোপাসনার সভা ব্যতীত আর কিছু হইতে পারিত না (এবং রাধাকান্ত দেবের ধর্মসভা শুধু তাহাই ছিল), সেই আত্মীয় সভার একদিনের অধিবেশনের সংবাদ সম্প্রতি শ্রীবিনয় ঘোষ একটি প্রবন্ধে [৮০] Calcutta Jounrnal, vol 3, Tuesday, may 18, 1819, No, 89 হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন: At the meeting in question, it is said, the absurdity of the prevailing rules respecting the *intercourse of several castes* with each other, and of the *restrictions on diet*, etc. was freely discussed, and generally admitted;—the necessity of an *infant widow passing her life in a state of celibacy*-the practice *of poly, gamy* and of *suffering widows to burn* with the corpse of their husbands, were condemned,—as well as all the *superstitious ceremonies* in use amongst idolators." ইহা হইতে বুঝিতে কষ্ট হয় না রামমোহনের নেতৃত্বে ধর্মান্দোলন শুধু ধর্মান্দোলনই ছিল না। ইহা ছিল সর্ববিধ সামাজিক কল্যাণ-প্রচেষ্টার সূচীমুখ।

ইহারই পরিপূরক হিসাবে, কিন্তু ধর্মীয়তার সংস্রব-বর্জিত বিশুদ্ধ যুক্তি ও বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া Derozioর Academic Association চাহিতেছিল মানুষের বুদ্ধিকে মুক্তি দিয়া নব মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে। এই প্রকারের সভার কর্মসূচী ও প্রভাব সম্পর্কে হরমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেছেন, 'The principles and practices of *Hindu* religion were openly ridiculed, and condemned, and angry disputes were held on moral subjects; the sentiments of Hume had been widely diffused and warmly patronised.... The degraded state of the *Hindu* formed the topic of many debates; their ignorance and superstition were declared to be the causes of such a state, and it was then resolved that nothing but a liberal eduction could enfranchise the minds of the people. The degradation of the female mind was viewed with indignation; the question at a very large meeting was carried unanimously that *Hindu* women should be taught" [৮১] "এই সভা অল্পদিনের মধ্যে লোকের দৃষ্টিকে এতদূর আকর্ষণ করিয়াছিল যে, উহার অধিবেশনে এক একদিন ডেভিড হেয়ার, লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের প্রাইভেট সেক্রেটারি Col. Benson, পরবর্তী সময়ের এডজুটান্ট জেনেরাল্ Col. Beatson, বিশপ কলেজের অধ্যক্ষ Dr. Mills প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিতেন, এবং সভ্যগণের বক্তৃতা শুনিয়া বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করিতেন।"[৮২] আর বক্তৃতা করিতেন কাহারা? রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখেরা। এইটুকু শুধু মনে ক্ষোভ রহিয়া যায় যে, এই সব মনীষীরা তখনও হিন্দু ও মুসলমানকে এক জাতি বলিয়া ভাবিতে শিখেন নাই, এবং সেই দুর্বলতার সুযোগ ১৮৫৭র পরে ইংরাজ ভালো করিয়াই লইয়াছিল। Rev. Lal Behari Day তাঁহার Recollections of Alexander Duff নামক গ্রন্থের ৩য় অধ্যায়ে এই বঙ্গীয় তরুণদের সম্পর্কে বলিতেছেন: "The young lions of the Academy roared out, week after week, 'Down with Hinduism! Down with orthodoxy!,'" কিন্তু ধর্ম যে ইহাদের প্রধান কথা নহে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না যখন দেখি যে ইহাদের মধ্যে এক কৃষ্ণমোহন ব্যতীত আর কেহ খ্রীষ্টান হন নাই, কিন্তু প্রত্যেকেই সমাজ-সংস্কারের জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন। পার্থিনন

নামে এই সংসদের মুখপত্রখানিকে হিন্দুকলেজের কর্তৃপক্ষ ভয় দেখাইয়া বন্ধ করিয়া দেন। কিন্তু তাহাতে সংসদের কাজে কোনো ব্যাঘাত ঘটে নাই। উহা ১৮৪৩ সাল, অর্থাৎ মধুসূদন যে সালে খ্রীষ্টান হইলেন সেই সাল পর্যন্ত চলিয়াছিল এবং ইতোমধ্যেই অন্যান্য সংসদ ইহার স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। স্বভাবতই যত দিন যাইতে লাগিল ততই প্রথম যুগের ইয়ং বেঙ্গলদের অহেতুক উচ্ছ্বাস ও সমাজ-সংস্কারের প্রতি যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর স্থানে আসিতে লাগিল ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী। অবশ্য Derozioর দৃষ্টিভঙ্গী যে যান্ত্রিক ছিল এ কথা বলা চলে না। যিনি অত অল্প বয়সে Kantএর Critique of Pure Reason এর সারগর্ভ সমালোচনা করিয়াছিলেন তাঁহার পক্ষে D'Alembert বা Helvetius, এমন কি Lockeএর যান্ত্রিকতাও সম্ভব নহে। হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষের অভিযোগ-পত্রের উত্তরে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাতে বুঝা যায় ভাঙন অপেক্ষা গঠনের উপরেই তাঁহার নজর ছিল বেশী। তিনি শুধু অন্ধ আচার আর অযৌক্তিকতা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি তাঁহার ছাত্রদিগকে নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে বলিতেন। যাহা, পূর্বাপর চলিয়া আসিতেছে, তাহাই সত্য ও সম্মানার্হ, এবং যাহা নূতন তাহা অসত্য ও অবজ্ঞেয়, এই চিরবদ্ধমূল বিশ্বাস দূর করিবার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। চির-প্রচলিত সংস্কারের এবং শাস্ত্রানুশাসনের পরিবর্তে যাহাতে তাঁহার ছাত্রেরা যুক্তি ও বিবেক-বলে হিতাহিত নির্ণয় করিতে পারেন, তাহাই তাঁহার উপদেশের সারমর্ম ছিল। হিন্দু শাস্ত্র বা খৃষ্টীয় শাস্ত্র, কোন দেশের কোন শাস্ত্রই তিনি অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতেন না। শাস্ত্রানুশাসন, যেখানে ব্যক্তিত্বের অথবা স্বাধীনতার ও সহজ জ্ঞানের বিরোধী, সেখানে তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্য তিনি ছাত্রদিগকে উপদেশ দিতেন, এবং সেই সঙ্গে তাঁহার স্বসমাজের ও হিন্দুসমাজের যে সকল আচার ব্যবহার, তাঁহার বিবেচনায় স্বাধীনতা ও সহজ জ্ঞানের বিরোধী ছিল, তিনি তাহা নির্দেশ করিতেন।" (জীবন-চরিতঃ) যোগীন্দ্রনাথ বসু, পৃঃ—৩৫।

কিন্তু তাঁহার মুক্তবুদ্ধি তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে কিছুটা কালাপাহাড়ী ভাব স্বভাবতই আনিয়াছিল এবং সে যুগে তাহার প্রয়োজনও ছিল—রক্ষণশীলতার সৌধে আঘাত করিবার জন্য, ধর্মসভা আর ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের প্রভাব খর্ব করিবার জন্য। Derozio নিজেও জানিতেন যে এই ভাঙনের বুদ্ধি একদিন গঠনমুখী হইবেই—প্রয়োজন শুধু যত্নের আর প্রতীক্ষার:

"Expanding like the petals of young flowers
I watch the gentle opening of your minds,

And the sweet loosening of the spell that binds
Your intellectual energies and powers
That stretch (like young birds in soft summer hours),
Their wings to try their strength. O, how the winds
Of circumstances, and fresh'ning April show'rs
Of early knowledge, and unnumbered kinds
Of new perceptions shed their influence ;
And how you worship *truth's omnipotence.*"

(*Sonnet* to the Pupils of the Hindu College).

সত্য যে সর্বক্ষম—এই বোধ, Derrzioর মাধ্যমে এবং যুগপ্রভাবে, শুধু যে নবীন বাঙালীর অন্তর জয় করিল তাহাই নহে, যখনই সমাজে মৌলিক পরিবর্তনের সময় আসে তখনই পরিবর্তনকামী অগ্রসরমান নবীনেরা এই সত্যের নামেই আগাইয়া চলেন—ভাঙিয়া ফেলেন সকল অন্ধ আচার, বিশ্বাস আর রক্ষণশীলতা। ফরাসী বিপ্লবে, রুশ বিপ্লবে এবং আমাদের দেশেও এই একই ইতিহাস।

এই সত্যানুসন্ধান এবং জনগণের মনে সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যে সংসদ এই অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশনের স্থান দখল করিল সে হইল এই Derozioanদেরই প্রতিষ্ঠিত Society for the Acquisition of General Knowledge—সাধারণ জ্ঞানোপার্জন সভা। এই সভার আলোচ্য বিষয়বস্তু সমূহের যে আংশিক বিবরণী শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় দিয়াছেন[৮৩] তাহা হইতেই নবীন বাংলার সত্যানুসন্ধানের বিস্তার ও বৈচিত্র্যের কিছুটা অনুমান করা যায়। কৃষ্ণমোহন, প্যারিচাঁদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন প্রভৃতি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন: (১) Reform—Civil and Social—among educated Natives. (২) Topographical and Statistical Sketch of Bankurah (৩) Condition of Hindu Women (৪) Brief Outline of the History of Hindusthan (৫) Descriptive Notices of Chittagong (৬) State of Hindusthan under the Hindus (৭) Descriptive Notices of Tipperah (৮) The Physiology of Dissection. "এই সভার সভ্যদের সম্পর্কে এই এক অপ্রচলিতপূর্ব বিধি ছিল যে যিনি বক্তৃতা করিব বলিয়া বক্তৃতা না করিবেন তাঁহাকে জরিমানা দিতে হইবে। চিত্তের একাগ্রতার ইহার চেয়ে বেশী প্রমাণ কি আর প্রয়োজন আছে ?"[৮৪] ইহাঁরা যেন চাহিলেন

রাতারাতি বাংলাদেশকে প্রতীচ্যের সমকক্ষ করিয়া তুলিতে—ইংরাজের বা প্রতীচ্যবাসীর শাদা চামড়ার স্বতঃ-শ্রেষ্ঠত্ব ইঁহারা স্বীকার ত করিতেনই না, এমন **কি গণতান্ত্রিক চেতনার আতিশয্যে বিস্মৃত হইতেন যে বাঙালী পরাধীন আর ইংরাজ বাঙালার প্রভু।** সাধারণ জ্ঞানোপার্জন সভার একদিনের ঘটনাই একথা প্রমাণ করিবে।[৮৫] সেদিন দক্ষিণারঞ্জন প্রবন্ধ পড়িতেছেন 'On the Present state of the East Indian Company's Criminal Judicature, and Police, under the Bengal Presidency." এই প্রবন্ধে কোম্পানীর অসাধুতা ও অপদার্থতা সম্বন্ধে অনেক সত্যভাষণ থাকায় হিন্দুকলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক, 'টোরী' মতাবলম্বী বিখ্যাত ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন সাহেব দাঁড়াইয়া উঠিয়া তিরস্কার করিয়া উঠিলেন, "যার শিল যার নোড়া তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া! ইহা আমি চলিতে দিতে পারি না।" সভাপতি অবশ্য তিনি ছিলেন না, ছিলেন সুবিখ্যাত ডিরোজিও-শিষ্য তারাচাঁদ চক্রবর্তী। তিনি তখনই উঠিয়া সভাপতির অধিকার প্রয়োগ করিলেন এবং যে ভাষায় করিলেন তাহা রিচাডসন এক তাঁহার স্বদেশীয়ের কাছেই আশা করিতে পারিতেন, "Captain Richardson, with due respect, I beg to say, that I cannot allow you to proceed any longer in this course of conduct towards our society, and on behalf of my friend Baboo Dukhin, I must say that your remarks are anything but becoming. I am bound also to add that I consider your conduct as an insult to the society and that if you do not retract what you have said and make due apology, we shall represent the matter to the Committee of the Hindoo College, and if necessary to the Government itself.....You are only a visitor on this occasion, and possess no right to interrupt a member of this society in the utterance of his opinions." **তখনও অবশ্য ইঁহাদের ইংরাজের সততায় এবং ন্যায়পরতায় বিশ্বাস একেবারে যায় নাই। তাহা না হইলে রিচার্ডসনের বিরুদ্ধে তাঁহারা নালিশ করিবার প্রস্তাব করেন সরকারের কাছে!**

এই নব্যশিক্ষিতেরাই আবার প্রতিষ্ঠা করেন লিপি-লিখন সভা বা Epistolary Association। **ইহারও কর্ম-সূচী পূর্বোল্লিখিত সভারই মত তবে**

আলাপ আলোচনা চলিত চিঠিতে। পরস্পরের নিকট হইতে দূরে থাকিলেও আত্মোন্নতি যাহাতে বন্ধ না হয় তাহার জন্যই এই ব্যবস্থা।

এই জাতীয় আরও যে সকল সারস্বত সভা ছিল সেগুলির কিছু কিছুর নাম আমরা সংগ্রহ করিয়াছি: বঙ্গহিত সভা, Anglo-Indian Hindu Association, জ্ঞানসন্দীপন সভা, Debating Club, বঙ্গরঞ্জিনী সভা, সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা, জ্ঞানচন্দ্রোদয় সভা, তিমিরনাশক সভা, Mechanics Institute, তত্ত্ব-বোধিনী সভা, বিদ্যোৎসাহিনী সভা ইত্যাদি।[৮৬] ইহাদের প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য কোন না কোন প্রকারে জ্ঞানানুশীলন ও চারিত্রিক উন্নতি। অবশ্য এই সব সভা-সমিতি স্থাপনের বিষয়েও ইংরাজই বাঙালীর শিক্ষাগুরু। তাঁহারাই প্রথম কলিকাতায় নানা সভা-সমিতি স্থাপন করেন। আমাদের এসিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন করেন ১৭৮৪ সালে স্যর উইলিয়ম জোন্স এবং তখন ইহার সকল সভ্যই ছিলেন ইংরাজ। ১৮২৯ সালে সর্বপ্রথম এদেশীয় সভ্য গ্রহণ করা হয় এবং তাহাও জোন্স সাহেবের প্রস্তাব অনুসারেই। সর্বক্ষেত্রেই দেখি বাঙালী সচেতন হইয়াছে ইংরাজের ধাক্কায় কিংবা ইংরাজের সংস্পর্শে আসিয়া। কিন্তু আবার সেই ইংরাজেরই ধাক্কায় পিছু হঠিয়া সে ব্যর্থ বিলাপ করিয়াছে প্রাণধারণের গ্লানি সহ্য করিতে না পারিয়া। এই সকল সারস্বত সংস্থা যেমন বাঙালীর ক্রমবিস্তারশীল চেতনার নিদর্শন তেমনি আবার ভবিষ্যৎ মোহভঙ্গেরও সূচনা।

এই সকল সভা বা সংসদে রাজনীতির আলোচনা যে হইত না তাহা নহে। সাধারণ জ্ঞানোপার্জন সভায় যে হইত তাহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু ১৮৮৫ সালের পরবর্তী কালে রাজনীতি বলিতে আমরা যাহা বুঝিয়া আসিতেছি—অর্থাৎ শাসকশ্রেণীর শাসন-সংক্রান্ত নীতি এবং তাহার আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রয়োগ—ঠিক এই সীমাবদ্ধ অর্থে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বা তাহার আলোচনা সেকালে হওয়া সম্ভব ছিল না। বাঙালী তখন চাহিতেছে শাসনব্যবস্থার সংস্কার এবং ন্যায়নীতির ভিত্তিতে বাঙালীর প্রতিভার উপযুক্ত স্বীকরণ। তাই সেকালের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান British Indian Association; এবং নানা রকম social evil দূর করার জন্য নানা সভাসমিতি—যেমন কিশোরী চাঁদ মিত্রের উদ্যোগে সমাজোন্নতি-বিধায়িনী সুহৃৎ-সভা।

এখানে একথা আবার স্মরণীয় যে, যে নবজাগরণের প্রকৃতি আমরা বিশ্লেষণ করিতেছি তাহার আধার **কেবল শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত।** বাংলার আপামর সাধারণ তখনও জাগে নাই এবং তাহাদের জাগাইবার জন্য কিছু করাও হয় নাই। তবে filtration বা অধঃপ্রবেশ উপর হইতে চাপ পড়িলে

ঘটেই। সেই হিসাবে হয়ত কোনো চাষার ছেলে গ্রামের স্কুলে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়া ছাড়িয়া দিল—কেহ বা পঞ্চম, এবং কালক্রমে আবার নিরক্ষরতায় ডুবিল। প্রধানত নিজের জীবিকা এবং গৌণত নব জীবনাদর্শ গ্রহণ করার ফলে নূতন জীবন গঠনে উদ্যোগী মধ্যবিত্তই শুধু ঘুম ভাঙিয়া উঠিল বলা চলে। সে ঘুম ভাঙার ফলে সে যে পরিপূর্ণ আলোকে উত্তীর্ণ হইল তাহা নহে। সে প্রভাতের আলোয় পরাধীনতা ও অসাম্যের কালিমার অবলেপ ছিলই—১৮৫৭র পরে সেই কালিমা গাঢ়তর হইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বাঙালী মধ্যবিত্ত চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। আজ যে বাঙালী ব্যবসায়ক্ষেত্রে বাংলাদেশেই একেবারে অন্তেবাসী সেই বাঙালী সেকালে লক্ষ্মী সরস্বতী দুজনেরই সার্থক সাধনা করিয়াছিল। কিন্তু ১৮৫৭ সালের আগেই লক্ষ্মী তাহাকে সেই যে ছাড়িতে আরম্ভ করিলেন এখনও মুখ তুলিয়া তাকাইলেন না। দ্বারকানাথের ব্যবসা তৎপুত্র দেবেন্দ্রনাথ আর চালাইতে পারিলেন না। মতিলাল শীল, রামগোপাল ঘোষ, প্যারিচাঁদ মিত্র, তারাচাঁদ চক্রবর্তী সকলেই ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন : মতিশীলকে ত তখন King of the Share Market বলা হইত। ইহারা ছাড়াও আরও বহু নাম পাইতেছি—যথা : মথুরামোহন সেন, লক্ষ্মীকান্ত বড়াল, স্বরূপচাঁদ শীল, সনাতন শীল ইঃ। বাঙালীদের এমন বহু কোম্পানীর নাম পাইতেছি যেগুলি ১৮৫৮ সালেও ফলাও ব্যবসা করিতেছিল : (১) রাম গোপাল ঘোষ এণ্ড কোং ; (২) আশুতোষ দে এণ্ড কোং ; (৩) দত্ত লিনজি এণ্ড কোং ; (৪) মতিলাল মল্লিক এণ্ড কোং ; (৫) রাধানাথ দত্ত এণ্ড কোং ; ইত্যাদি। ইঁহারা অবশ্য রাজানুগ্রহ পাইয়াই ধনী হইয়াছিলেন। তবু হইয়াছিলেন ত। কিন্তু তারপরেই ব্রিটিশ যে নীতি গ্রহণ করিল তাহাতে দেশীয় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের টিকিয়া থাকা খুব শক্ত হইয়া দাঁড়াইল। ১৮৮৫ সালে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন যখন শুরু হইল এবং ১৯০৫ সালে যখন দানা বাঁধিল তখন হইতেই আবার যন্ত্র-শিল্প ও ব্যবসায়ীমহল গড়িয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু সেই গড়িয়া উঠিবার সময় বাঙালী আর ইংরাজের বশম্বদ হইয়া থাকিতে চাইল না—ভগ্নমোহ বাঙালী তখন সোজা রাজনীতি করিতে ও স্বদেশী কারখানা আর স্বদেশী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়িতে শুরু করিল—যন্ত্রযুগে কুটীর শিল্প গড়িতে চাহিল। তখন মাড়োয়ার হইতে নূতন যাহারা আসিল তাহারা সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া নূতন যুগের ধর্ম অর্থাৎ টাকা অর্জন করিতেই আসিয়াছিল। ইংরাজের বশম্বদ হইয়া, আবার জাতীয় আন্দোলনের জোরে তাহাদের নিকট হইতে সুবিধাও আদায় করিয়া, ইহারা বাংলার ঘাড়ে জাঁকিয়া বসিল। আর ক্ষুব্ধ, ক্ষুধার্ত বাঙালী নিজের আঙুল কামড়াইতে লাগিল। উনিশ শতকে যে মোহে সে ভুলিয়াছিল সেই

মোহ উনিশ শতকেই ভাঙিতে শুরু করিয়া শেষে তাহাকে আনিয়া দাঁড় করাইল সরাসরি রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্নের সামনে।

(খ)

যুগমানসের বাকী যেটুকু পরিচয় তাহা ধৃত রহিয়াছে সে যুগের গ্রন্থ ও নন্দনলোকে। কি কি গ্রন্থ অনূদিত হইল, কোন কোন গ্রন্থই বা লিখিত হইল, কোনখানি কতখানি আলোড়ন সৃষ্টি করিল, কোন নাটক বা যাত্রা অভিনীত হইল বা প্রথম কোন কোন নাটক মঞ্চে সফল হইল, মঞ্চই বা কি প্রকারের ছিল—ইত্যাদি তথ্য হইতে সে যুগের রুচির প্রকৃতি ও কৃষ্টির স্তরের সন্ধান আরও প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া যাইবে। কিন্তু রুচির প্রকৃতি ও কৃষ্টির স্তর অপেক্ষা যুগের আরও মূল্যবান যে পরিচয় পাওয়া যাইবে সেটি হইল তাহার কৃষ্টিলোকের সমস্যা—অর্থাৎ কোন জীবনবেদ বা জীবনদর্শনকে সে যুগের স্রষ্টারা রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন এবং করিতে গিয়া কি প্রকার বাধার সম্মুখীন হইতেছিলেন। এই জীবনবেদ যে কি তাহা আমরা আগেই বর্ণনা করিয়াছি। অন্তর্দ্বন্দ্বমুখর তৎকালীন যুগচেতনার প্রকাশ সভা-সমিতি ও পত্র-পত্রিকায় আগেই শুরু হইয়াছিল—রামমোহনের সাংবাদিকতায় ও তাঁহারই আত্মীয় সভায়; ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপন করিয়া ইংরাজী শিক্ষা দেওয়ায় আবার সেই শিক্ষার সর্বপ্রধান সমর্থক যে রামমোহন তাঁহাকে বাদ দিয়া গোঁড়া রক্ষণশীল রামকমল সেন ও রাধাকান্ত দেবকে সেই শিক্ষার তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচনে; আবার যে রাধাকান্ত দেব বিধবা-বিবাহ ও সতীদাহ প্রথা নিবারণের প্রয়াসে ধর্মসভার পত্তন করিলেন তাঁহাকেই দেখা যায় প্রথম দিকে শিক্ষা-বিস্তারকল্পে প্রচুর স্বার্থত্যাগ করিতে; তিনিই আবার হইয়া বসেন ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ হইতে তাড়াইবার প্রধান উদ্যোক্তা।

এগুলি পরস্পরবিরোধী তথ্য। এই তথ্যগুলি দুটি মূলীভূত দ্বন্দ্ব হইতে উদ্ভূত। (১) **একটি হইল পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থার ধারক কিছু কিছু ভাসাভাসা সংস্কারে ইচ্ছুক রক্ষণশীলদের সঙ্গে সমাজ ও জীবনদর্শনের মৌলিক পরিবর্তনে আগ্রহীদের দ্বন্দ্ব।** আর একটি হইল: (২) **মৌলিক পরিবর্তনকামীদের অর্থাৎ বিপ্লবীদের স্ব-মানসে আদর্শ বা অভীপ্সার সঙ্গে বাস্তবের দ্বন্দ্ব এবং তজ্জনিত মোহভঙ্গ।** এই সনাতনী আর নবতনী—ইহার কোনো দলেই রামমোহনকে ফেলা যায় না। তিনি বিপ্লবী নহেন, বিচার করিয়া ও বুঝাইয়া শুঝাইয়া সংস্কারের প্রয়াসী—ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশে ইচ্ছুক, সব সময়েই আপোষে

কাজ করিতে অভিলাষী; তবে বাদানুবাদে পিছপা নহেন, বিশ্বাসেও তিনি দৃঢ় অটল। কিন্তু তাঁহার পরেই নবতনীদের যে প্রথম দল আসিল (কৃষ্ণমোহন, রসিককৃষ্ণ ইঃ) তাহারা প্রথম উচ্ছ্বাসে, বাস্তব পরিবেশকে, পরাধীনতার পরিবেশকে, ইংরাজের শোষণের সত্যকে, উপেক্ষা করিয়া, প্রতীচ্যের ব্যক্তিস্বাধীনতার জয়গানে এবং নব গণতন্ত্রের আদর্শে পরিপূর্ণ আস্থাবান হইল; এবং শাসকশ্রেণীর ছিঁটেফোটা সংস্কার এবং বিশেষ করিয়া, সারা ভারতের মানুষ কোনোদিনই যাহা পায় নাই সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত শান্তি নিজেরই স্বার্থে, ইংরাজ দেশময় প্রতিষ্ঠা করায়, ইংরাজের ও প্রতীচ্যবাসীর স্বাভাবিক মহত্ত্বে তাহারা বিশ্বাস করিয়া বসিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আসিতে থাকিল মোহভঙ্গ—উচ্চাকাঙ্ক্ষায় পড়িতে লাগিল ছাই—কেরাণীগিরি আর ডেপুটিগিরির উপর কিছু আর কপালে জুটিল না—মনের কুসুম মনেই শুকাইল—থাকিল শুধু বিলাপ—রাবণের বিলাপ আর মেঘনাদের পৌরুষের অপমৃত্যু। সেকালের টম পাইন, বার্ক, রুশো এবং মিল-পড়া আদর্শ-সর্বস্ব শিক্ষিত বাঙালীর যোগ্যতা ও কৃতির পার্থক্য এক পত্র-প্রেরক ১৮৩৫ সালে সমাচারদর্পণে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন,"…. যুবারদের উপদেশ থাকিলে পরিবারের ও রাজ্যের মধ্যে যেমন উপশান্তি ও সুখের সম্ভাবনা করা যায় এই প্রযুক্ত এতদ্দেশে ইংলণ্ডাধিপতির প্রজারদের সুখজন্য নানা চতুষ্পাঠ্যাদি স্থাপন করিয়া তাহারদের বিদ্যাদান করিতেছেন ভুরি ভুরি সিবিল সম্পর্কীয় মহাশয়েরা নিয়ত অনুগ্রহপূর্বক ঐ সকল বিদ্যালয়ের সাহায্য করিতে মনোযোগ করিতেছেন এবং নিয়মানিয়ম এমন সৃজন করিতেছেন যাহাতে করিয়া ত্বরায় প্রচুর বিদ্যা হয় এবং কল্পনা করিতেছেন কি প্রকারে তাহারদের শীঘ্র অভীষ্টলাভ হয় এই অনুভব করিয়া বিদ্যালয়ে ভিন্ন ভিন্ন পাঠস্থান করিয়াছেন এবং সময়ে সময়ে ছাত্রেরদের গুণানুযায়ি পাঠের বৃদ্ধি ও হ্রাস করিতেছেন এবং পরীক্ষা লইয়া বৎসরে বৎসরে পুরস্কার করিতেছেন ইহাতে করিয়া যুবারদের মনে এমন ঈর্ষা জন্মিয়াছে যে তাঁহারা পরস্পর বড় হইবার চেষ্টা সর্বদা করিতেছেন। এবং বার্ষিক পুরস্কারগ্রন্থ পাইবার জন্য অন্তঃকরণের সহিত উদ্যোগ করিতেছেন। কেননা তাঁহারা তাহা মর্যাদা-স্বরূপ জ্ঞান করেন। এই সকল মহাশয়েরদের মানস প্রায় পূর্ণ হইয়াছে কেন না ঐ সকল ছাত্রেরা অতুল অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা শিল্পবিদ্যাতেও নিপুণ এবং গদ্য ও কবিতা এমত লেখেন বোধ হয় যে তাঁহারদের স্বদেশীয় ভাষাতে তাঁহারদের হস্ত হইতে যে সকল গ্রন্থ প্রকাশ পাইতেছে তাহা দৃষ্টি করিলে বোধ হইতে পারিবেক তত্রাপি গবর্ণমেণ্ট হইতে কৃপণীয় মনোনীত হইয়া

তাঁহারদের **গুণাগুণের পুরস্কার হয় না**…… ……এতন্নিমিত্ত আমি মহাশয়ের নির্মল দর্পণ দ্বারা শ্রীল শ্রীযুত গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের কর্ণগোচর করিতে প্রার্থনা করি যে ঐ সকল ছাত্রেরা বহুকালাবধি কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ইঙ্গরেজী বাঙ্গলা এবং পারস্য ভাষাতে নিপুণ হইয়াও ন্যায় পারিতোষিক না পাইয়া সামান্য কেরাণীর সমপদী হইলেন। জুদিসিয়াল ও রেবনিউ-সম্পর্কীয় যে সকল উচ্চ পদ প্রকাশ পাইয়াছে তত্রাপি ঐ সকল ছাত্রেরা অর্থ ও বন্ধু বিরহ জন্য ঐ সকল পদশূন্য হইয়াছেন যদ্যপি শ্রীল শ্রীযুত গবর্ণর্ জেনারল বাহাদুর কলেজের ছাত্রেরদের পক্ষে সহকারিতা করিয়া ঐ পদাভিষিক্ত করেন যেহেতু তাঁহার সহকারিতা ব্যতিরেকে এই পদ পাওনের তাহারদের কোন সম্ভাবনা নাই তবেই তাঁহারদের পরিশ্রম ও গুণের যথার্থ পুরস্কার হয়।[৮৭]

ইহা ১৮৩৫ অর্থাৎ ১৮৩৩ সালে[৮৭] লর্ড বেন্টিঙ্কের এদেশীয়দের যোগ্যতা অনুসারে সমস্ত সরকারী পদে নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিবার অব্যহিত পরের ঘটনা। এই প্রতিশ্রুতি দিবার আগের অবস্থার কথা বর্ণনা করিয়া শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন, "১৮৩৩ সাল পর্যন্ত এদেশীয়দিগের সেরেস্তাদারের উপরের পদে উঠিবার অধিকার থাকিত না। এই কালকে এদেশীয়দিগের প্রকৃত পতনের কাল বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। কারণ এই সময় হইতেই এদেশীয়গণ সর্ববিধ সম্মানের পদ হইতে অধঃকৃত হইয়া উন্নতির সম্ভাবনা ও তজ্জনিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা হইতে বিদূরিত হইয়া, ক্ষুদ্র লক্ষ্য ও ক্ষুদ্রাশয়তার মধ্যে নিমগ্ন হইলেন। এই লক্ষ্য, চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষার ক্ষুদ্রতাকে পরাধীনতার সর্বশ্রেষ্ঠ শোচনীয় ফল বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে"[৮৭ক]। ১৮৩৩এর প্রতিশ্রুতির সুফল যদিও শাস্ত্রী মহাশয় বর্ণনা করিয়াছেন তবু ২ বৎসর পরেই সমাচার দর্পণে পূর্বোক্ত চিঠি বেন্টিঙ্কের প্রতিশ্রুতির ব্যর্থতারই সূচক। কিছু পরে এই ব্যর্থতা ও মিথ্যাচার আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুলের পরিদর্শন উপলক্ষ্যে ডাঃ মোয়াট বাঙালী চরিত্রের অধঃপতন সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহার উত্তরে ১৮৬০ সালের ২১ শে জানুয়ারীর হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদকীয় উক্তি সেকালের শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের মূল সমস্যাটিকে ধরিয়া দিল: "The absence of a career, an outlet, coupled with the absence of political power, materially tends to the repression of those virtues which Dr. Mowatt says have fixed the position of European nations. So long as reward is within reach, *hope is buoyant and energies quick,* so long

the mind expands and the soul looks upwards; but where the prospect closes a blank follows in the train. The Bengalee as a boy finds the goal of distinction open, and by instinct throws behind all competitors in the race, but as a man he finds it shut, and his spirits lag and droop. [এই নৈরাশ্য ও বিষাদেরই কি প্রকাশ নহে মধুসূদনের—

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়
তাই ভাবি মনে।
....
মরীচিকা মরুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষাক্লেশে ;
এ তিনের ছল সম ছল রে এ **কু-আশার**
....
বাকী কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ অন্বেষণে,
সে সাধ সাধিতে ?]

The intellect which pines away in the drudgery of clerkship or rots under the more corrupting influence of sordid deceit and care, would, could it find opportunity, achieve the same wonders in the great battle of life for which it early earned reputation in the contest for academic honours." [অর্থাৎ রাক্ষসত্বের কলঙ্ক ললাটে চিহ্নিত না থাকিলে পৌরুষের মূর্ত প্রতীক রাবণ ও মেঘনাদ জীবনে অন্যায় যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বক্ষোভেদী বিলাপ করিত না। শুধু সেই কালিমার পরিবর্তে তথাকথিত সৎ-মানুষের ছাপ-মারা রাম ও লক্ষ্মণ (ইংরাজ) পৌরুষে হীন হইয়াও পৃথিবীর সর্বসম্পদ ভোগের অধিকারী। এই যে original inferioirity—জন্মের গ্লানি—ইহাকে ত কিছুতেই কাটাইয়া উঠিতে পারা যায় না।]

ঐ সম্পাদকীয় প্রবন্ধেরই শেষ অনুচ্ছেদে হরিশ মুখোপাধ্যায় বলিতেছেন : "That the stimulus afforded by the prospect of an open and unlimited career is never lost is as much corroborated by history as by the facts of everyday life. Those who contend for the unremitted subordination of native intellect to the present system on the theory that manifestation of superiority need not be anticipated by an advanced

policy, should point us out how the manly virtues can flourish under *the systematic discountenance and rigid repression* by which native aspriations are bound and limited. But it is not enough to have career open. The social relations between the subjects and the governing nations ought to be revived and until the former are liberated from the restraints which the latter force upon them *as the badges of their inferiority,* their views of life cannot expand nor their moral feelings be strengthened."

এই অন্তর্দ্বন্দ্বই যুগের প্রধানতম সত্য। যাঁহারা কেবল কিছু কিছু সংস্কারেই তুষ্ট, যাঁহারা পরাধীনতাকে এখনও বহুকাল সহ্য করিতে হইবে বলিয়া মানিয়া লইয়া আত্মোন্নতির উপদেশ দিতেছিলেন আর মনে মনে গুমরাইয়া দুর্বল মুহূর্তে নিজের অজ্ঞাতেই যেন সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন আর নীল-বিদ্রোহকে পরিপূর্ণ অনুমোদন করিতেছিলেন আবার বাঙালী সিপাহীবিদ্রোহে যোগ দেয় নাই বলিয়া তাহার নিষ্কৃতি চাহিতেছিলেন; বড় চাকুরী পাওয়া যায় না বলিয়া, ইংরাজের সঙ্গে সম-মর্যাদা লাভ করা যায় না বলিয়া, কেরাণীগিরি করিয়া মরিতেছি বলিয়া আবার যাঁহারা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিলেন—তাঁহারা আপোষ করিয়া চলিতেছিলেন। কিন্তু বাস্তবজীবনে আপোষ করিলে কি হইবে মনের নিগূঢ় তলদেশে যে ক্ষোভ ঘনাইয়া উঠিতেছিল, যাহা প্রকাশের সহজ পথ পাইতেছিল না, জীবনে যে পরাজয়ের শুধু অর্থনৈতিক দিকটা সংবাদপত্রের স্তম্ভে কখনও কখনও পরিস্ফুট হইতেছিল সেই মূলীভূত যে চেতনা—**পৌরুষের অহেতুক পরাজয়ের চেতনাই** সেকালের সংবেদনশীল, স্পর্শকাতর মনের মুখ্য সত্য। মধুসূদন সেই মূলীভূত যুগচেতনাকেই কাব্যরূপ দিয়াছেন রামায়ণ-কাহিনীর যুগ-যুগান্তের ঐতিহ্যকে ইচ্ছা করিয়া অস্বীকার করিয়া। এই প্রসঙ্গে এ কথাও স্মরণীয় যে মধুসূদন তাঁহার জীবদ্দশায় যাঁহাকে লোকোত্তর পুরুষ মনে করিয়া হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা উজাড় করিয়া দিয়াছেন সেই বিদ্যাসাগরের চরিত্রের মূল সত্য হইল পৌরুষ। সেই পৌরুষের কি পরিপূর্ণ স্ফূর্তি ঘটিয়াছিল? যে পৌরুষ বলিয়াছিল "এই ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই যাহার নাকে এই চটিজুতা শুদ্ধ পায়ে টক্ করিয়া লাথি না মারিতে পারি," সেই পৌরুষই কি পরাজিত হইয়া শেষ জীবনে স্বীকার করিতে বাধ্য হয় নাই যে, যে উপকার লইয়াছে, নিন্দা সর্বাপেক্ষা বেশী সেই করে এবং সেই পৌরুষ কি পরাজিত হইয়া কলিকাতা

পরিত্যাগ করিয়া সাঁওতালদের সরল অমার্জিত জীবনের মধ্যে পলায়ন করে নাই? বিদ্যাসাগরই সে যুগের পরিপূর্ণ প্রতিনিধি-স্থানীয় পুরুষ যাঁহার মধ্যে সেই যুগ নিজের অন্তর্দ্বন্দ্বকে পরিপূর্ণ প্রকট করিয়াছিল। **মধুসূদনের মেঘনাদ-বধ কাব্যের মূল তত্ত্ব যেন বিদ্যাসাগরের জীবনেই পুনরাবৃত্ত এবং পূর্ণ বিকশিত হইল।** তাই বিদ্যাসাগরের উপরে লেখা মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাটি তাঁহার একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা এবং বর্তমান লেখকের মতে মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ চতুর্দশপদী কবিতা।

সে যুগের এই যে দ্বিমুখী দ্বন্দ্বের[৮৮] লীলাস্থলী হইলেন বিদ্যাসাগর আর যাহার পূর্ণতম সাহিত্যিক প্রকাশ ঘটিল মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যে, সেই দ্বন্দ্বের আংশিক ও অগভীর (কখনও বা গভীর) প্রকাশ যেমন ঘটিয়াছে তৎকালীন পত্র-পত্রিকা সভা-সমিতি ও সংসদে তেমনি ঘটিয়াছে গ্রন্থ ও নন্দন লোকে—গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, এমন কি গানে। সেই গ্রন্থলোকের পরিচয় এখন লওয়া প্রয়োজন:—

প্রথমে অনুবাদ সাহিত্য। দেখা যায় যে ইংলণ্ডে রেনেসাঁর ফসল ফলিবার আগে মাটি উর্বর হইয়াছিল অনুবাদের পলিমাটিতে; তেমনি উনিশ শতকে বাংলার মনোভূমিতে প্রথম রং ধরাইল ইউরোপীয় এবং সংস্কৃত ও ফারসী গ্রন্থের অনুবাদ। সংস্কৃত হইতে অনুবাদের কথা বলিতে গেলে ইহা মনে করিয়া রাখিতে হইবে যে ধর্মগ্রন্থাদি সংস্কৃত হইতে বাংলায় অনেক পূর্ব হইতেই অনূদিত এবং অনুসৃত (adapted) হইয়া আসিতেছিল—রামায়ণ, মহাভারত ও নানা প্রকারের ধর্মীয় স্তব ইঃ। মধ্যযুগের সাহিত্যের ধর্ম-সর্বস্বতাই ইহার ব্যাখ্যা এবং আলোচ্য যুগেও রাধাকান্ত দেব, রাজা কালীকৃষ্ণ দেব ইত্যাদির আনুকূল্যে ও নেতৃত্বে সেই সকল অনুবাদ-কার্যের গতি বরং কিছু বাড়িয়াই গেল; কেন না রামমোহন রায়ের দলকে ত ঠেকাইতে হইবে। অতএব মনুর একাধিক অনুবাদ করা হইল—প্রথমখানি প্রকাশের তারিখ ১৮৩৩—সতীদাহ নিবারণের আইন হইবার পরেই। মনুর ইংরাজীতে অনুবাদ ইহার আগেই ১৮৩১ সালে স্যার উইলিয়ম জোন্সের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছিল। সেই সঙ্গে অবশ্য বাংলা অনুবাদও ছিল। ইহার পরে মনুর অনুবাদের মরশুম পড়িয়া গেল। গীতার সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়ের বাণী ইঁহাদের অনুপ্রাণনা জোগাইয়াছিল না হিন্দুত্বের গোঁড়ামি তাহা বুঝিতে অবশ্য কষ্ট হয় না। রঘুনন্দনের স্মৃতি ১৮৩৪এ বাংলা টাইপে (এ পর্যন্ত দেবনাগরীতেই ছিল) প্রথম ছাপা হয়। ইহা ছাড়া অনেক সংকলন হইয়াছিল সংস্কৃত নীতিকথা-মালার। ঋগ্বেদের অনুবাদ করেন আনন্দ বেদান্তবাগীশ। এই সকল অনুবাদে সেই যুগের বৈশিষ্ট্যের কোনো প্রকাশ নাই

তবে স্বজাতির ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়াও এক হিসাবে প্রগতিশীলতা।'

বৈশিষ্ট্য দেখা দিল ধর্মসংস্রবহীন সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদে—অর্থাৎ যুগের ক্রমবর্ধমান ঐহিকতায় (secularity) ও মানবিকতায় (humanism) ! ভর্তৃহরিশতকের অনুবাদ হয় ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে আর মহনাটকের ইংরাজীতে অনুবাদ হয় ১৮৪০এ। তাহার পর ১৮৪০এ প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক, ১৮৪৮এ (প্রকাশিত হইয়াছিল কি না বলা যায় না) গদ্যে পদ্যে অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক, ১৮৪৯এ (নীলমণি বসাকের, রামনারায়ণের নহে) রত্নাবলী ছাপা হয়; ১৮৫৬তে বেণীসংহার নাটক, ১৮৫৮তে রত্নাবলী ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেঘদূত, ১৮৬০এ শকুন্তলা এবং ১৮৬৭তে মালতীমাধব নাটক আকারে ভাষান্তর করেন সুবিখ্যাত রামনারায়ণ তর্করত্ন। (এগুলিকে অনুবাদ না বলিয়া অনুসৃতিই বলা উচিত।) এই জাতীয় ভাষান্তরণ আরও হয় শকুন্তলা (১৮৫৫), বিক্রমোর্বশীয় (১৮৫৭) মালতীমাধব (১৮৫৯), মালবিকাগ্নিমিত্র (১৮৫৯) ও চণ্ডকৌশিক (১৮৬৯) নাটকের। স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে যে একই গ্রন্থ একাধিকবার অনূদিত হইতেছে এবং প্রায় সমস্ত গ্রন্থগুলিরই মূল উপজীব্য **প্রেম**। নাটক ছাড়া কাদম্বরী এবং হিতোপদেশের অনুবাদও বাদ যায় নাই। মৃতুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রাজাবলি নামক নামমাত্র ইতিহাস গ্রন্থও সম্ভবত সংস্কৃতের অনুবাদ [৮৮ক]। ফার্সী হইতে অনেক 'কিস্‌সা' ইংরাজী হইয়া বাংলায় এই সময় আসিতে লাগিল; ইহাদের মধ্যে বিখ্যাত আরব্য রজনীর গল্প। লয়লা মজনু, ইউসুফ জোলেখা ইত্যাদির আকর্ষণের মূল কারণও নরনারীর প্রেম ও ঐহিকতাবাদ। আরব্যরজনীর অনেক গল্পের জনপ্রিয়তার মূল কারণও ইহাই। আর যেগুলি রূপকথা জাতীয় সেগুলির আকর্ষণ ত চিরন্তন। প্রসঙ্গান্তরে যাইবার আগে একটি কথা এখানে স্মরণীয়। সেটি হইল দেবদেবীর উপাখ্যান হইতে এই যে মানবীয় বিষয়বস্তুতে অবতরণ এবং কৃষ্ণ-রাধার আড়ালে মানুষী প্রেমের আকৃতি না জানাইয়া সোজাসুজি নারী-পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণের মহিমা ও সৌন্দর্য কীর্তন করা—এই বিবর্তনে ইসলামী 'কিস্‌সার' দাম সুপ্রচুর—আলাওলের যুগ হইতে। নরনারীর ভালোবাসা-বাসির কথা জনসাধারণের কাছে পৌঁছায় সেই সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই, এই 'কিসসার' অনুবাদের মাধ্যমে। জনসাধারণ শকুন্তলার কাহিনী শুনিয়াছে অনেক পরে। তাহার অনেক আগে শুনিয়াছে লয়লা মজনুর আখ্যান। মানুষী প্রেমের এই সচেতন আদর নূতন যুগের বৈশিষ্ট্য, কেন না এই প্রেম যে ব্যক্তির মূল্য ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার মূল্য স্বীকার করে তাহা মধ্যযুগে অজ্ঞাত। প্রেমে constancy বা একনিষ্ঠতার আদর্শ আসিয়াছে শুধু বর্তমান কালেই—

ব্যক্তির মূল্য স্বীকরণের সঙ্গে সঙ্গে—যখন হইতে নারী আর পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া গৃহীত হয় না। এই একনিষ্ঠতা পারস্পরিক। শুধুমাত্র নারীর উপর সতীত্বের সমস্ত ভার পুরুষ ত বহুকাল হইতেই অর্পণ করিয়া বসিয়া আছে। নারীর ব্যক্তিমূল্য যখন হইতে সে স্বীকার করিতে আরম্ভ করিল তখন হইতেই একনিষ্ঠ প্রেম বাস্তব হইয়া উঠিল। আমাদের দেশে কুলীন সম্প্রদায়ের এবং ওদেশে chivalryর ছদ্মবেশের আড়ালে নারী শুধু উপভোগেরই সামগ্রী ছিল। আমাদের দেশে হিন্দু আইন অনুসারে এই সেদিনও ত পুরুষ একসঙ্গে একাধিক বিবাহ করিতে পারিয়াছে আর মুসলমান এখনও যথেষ্ট তালাক দিতেছে। এই পরিবেশে একনিষ্ঠ প্রেমের কথা বলা শুধু হাস্যকর নহে, অর্থহীন। এই আদর্শ আমাদের দেশে শিক্ষিতের জীবনে সত্য হইতে আরম্ভ করিল উনবিংশ শতকের শেষার্ধের শেষের দিকে—তাহার আগে নহে। শতাব্দীর প্রারম্ভে মধুসূদনের পিতাই যে একসঙ্গে চারিটি বিবাহ করিয়াছিলেন তাহা নহে, বহু বিবাহের বিরুদ্ধে আইন বিদ্যাসাগর মহাশয় পাশ করাইতে পারেন নাই।

ইংরাজী গ্রন্থের ক্ষেত্রে প্রথম আগন্তুক হইল দেশীয় দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের বঙ্গানুবাদ; প্রকাশিত হয় ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। ইহার পরে সুপ্রসিদ্ধ 'কর্ণওয়ালিস কোড'-এর অনুবাদ ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। এই সব অনুবাদে বাংলা গদ্য আড়ষ্ট, দুরূহ। কিন্তু ফার্সী ভিন্ন বাংলায় যে আইন-কানুন লেখা যায় ও কাজ চালানো যায় এই সকল অনুবাদ শুধু এই কথাটি প্রমাণ করিয়াই বাংলা গদ্যের প্রতিষ্ঠায় ও তাহার বহুল প্রচারে সাহায্য করে এবং গদ্যের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠার অর্থই হইল জনসাধারণের কৃষ্টির ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ভিত্তি রচনা করা।

আসলে বাইবেলের অনুবাদ হইতেই বাংলা গদ্যের মার্জনা শুরু হইল। বাইবেলের প্রথম অনুবাদ শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হইল ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে। ইহারও আগে ১৮০০ সালে মূল গ্রীক হইতে Gospel of St. Matthew অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করা হয়। খ্রীষ্টানদের এই ধর্মগ্রন্থের অনুবাদে ভাষার প্রশ্ন আমাদের প্রধান নহে। আমাদের কাছে বাইবেলের অনুবাদ, সনাতনীদের বিরুদ্ধে নবজাগ্রত বাঙালীর সংগ্রামের একটি অংশ বলিয়াই প্রতিভাত হইতেছে। খ্রীষ্টান পাদরীদের উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন আমাদের কাছে তৎকালীয় খ্রীষ্টধর্ম-প্রচার রক্ষণশীলদের কূপ-মণ্ডুকতা ও সর্বজ্ঞতার মিথ্যা প্রাকার ভাঙিবার একটি হাতিয়ার বলিয়াই মনে হয়। খ্রীষ্টান ধর্ম ভালো কি মন্দ, হিন্দুধর্মের অপেক্ষা সত্যতর কি না—এগুলি অবাস্তর প্রশ্ন। প্রশ্ন হইতেছে এই যে

ধর্মপ্রচার করিতে আসিয়া এই প্রচারকেরা এবং তাহাদের বাইবেল তৎকালীন বহিরঙ্গ-প্রধান [৮৯] ও অন্ধআচার-সর্বস্ব তথাকথিত হিন্দুত্বের বন্ধ দ্বারে কতখানি ফাটল ধরাইতে পারিল এবং সেই অনুপাতে যুগমানসকে কতখানি প্রশস্ত করিতে পারিল।

ইহার পরেই আসে ঈশপ ও অন্যান্য প্রাচীন নীতিমূলক গল্পের বাংলা অনুবাদ ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে। বইখানির নাম ইংরাজী—The Oriental Fabulist. কেবল এই গ্রন্থখানিই নহে, আরও অনেক গ্রন্থেই বিদেশীনীতি-মূলক গল্প সঙ্কলন করা হইয়াছে। এগুলিকে শিশুশিক্ষার উপকরণ মনে করিলেও আসলে এগুলি জনমানসে নীতিমূলক গল্পের ও তাহাদের অন্তর্নিহিত নীতিগুলির বিশ্বজনীনতাই প্রতিপন্ন করে। পরোক্ষভাবে এগুলি মনকে প্রশস্ত করিতেই সাহায্য করে। ফেলিক্স কেরী বানিয়ানের Pilgrim's Progress অনুবাদ করেন যাত্র্যগ্রসরণ নামে। আনুষ্ঠানিক ধর্মের বিরুদ্ধে ব্যক্তি-চিত্তের প্রতিবাদে জন্ম হয় প্রটেষ্ট্যাণ্ট-বাদের। এক হিসাবে তাই প্রটেষ্ট্যাণ্টিজম্ তাহার উদ্ভবের সময়ে ব্যক্তিচিত্তকে মুক্তি দিয়াছিল; সেই মুক্ত ব্যক্তিচিত্তের অধ্যাত্ম অভিযানের এই কাহিনী এখানকার অন্ধ গোঁড়ামির মূলে নিশ্চয়ই আঘাত করিয়াছিল। ইংরাজী ইতিহাসের প্রথম অনুবাদ হইল ১৮২০ খ্রীঃ-এ। এখানি ঠিক অনুবাদ নহে, অবলম্বনে রচনা; অবলম্বন হইল গোল্ডস্মিথের An abridgement of the History of England। (বিদ্যাসাগর পরে যে বাংলার ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন তাহাও মার্শম্যান সাহেবের ইংরাজী গ্রন্থের অনুসরণে।) পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক প্রথম বাংলা গ্রন্থও ইংরাজী মূল অবলম্বনে রচিত [৯০]। ইহার পরবর্তীকালেও অসংখ্য বিজ্ঞানবিষয়ক পাঠ্যপুস্তক ইংরাজী হইতে অনুদিত হয়। ১৮৩৬ খ্রীঃ প্রথম ইংরাজী কাব্যের অনুবাদ হয় হিতসংগ্রহ নামে—মূল ছিল Gayর Fables। এবং অমিত্রাক্ষরের তখন জন্ম না হইলেও 'সুখদ উদ্যানভ্রষ্ট' নামে Paradise lostএর অনুবাদও সে সময় হইয়াছিল। হোমরের বিখ্যাত কাব্য দুইখানির একখানিও বাংলায় রূপান্তরিত হয় নাই; অথচ তাঁহার অখ্যাত ও অনিশ্চিত Batrakhomyomakhia নামে ব্যঙ্গকাব্যের ভাবাবলম্বনে রঙ্গলাল 'ভেক মূষিকের যুদ্ধ' নামক ব্যঙ্গকাব্য রচনা করেন। হরিমোহন গুপ্ত Parnell এর Hermit 'সন্ন্যাসী উপাখ্যান' নাম দিয়া অনুবাদ করেন এবং যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় Goldsmithএর Deserted Villageএর ভাষান্তর করেন 'পরিত্যক্ত গ্রাম' নামে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে। শেক্সপীয়রের নাটক মূলে অনূদিত হইবার আগে Lamb's Tales From Shakespeare হইতে Romeo

and Julietএর উপাখ্যান রচিত হয় ১৮৪৮ খ্রীঃ এবং ১৮৫৩ খ্রীঃ Edward Roer Lamb's Talesএর অনেকগুলি বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন Vernacular Literature Societyর মাধ্যমে।

[এই Vernacular Literature Society প্রথম যুগের School Book Societyর স্থান অনেকটা অধিকার করে। ইহার প্রতিষ্ঠা ১৮৫১ সালে সরকারী উদ্যোগে। এই সংসদ 'গার্হস্থ্য বাংলা পুস্তক' নামে গার্হস্থ্য গ্রন্থাগারের উপযোগী বহু গ্রন্থ প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছিল।]

এই সংসদের উদ্যোগেই Macaulayর লর্ড ক্লাইবের জীবনী এবং Robinson Crusoe অনূদিত হয় ১৮৫২ ও ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। ইহাদের পরে উল্লেখযোগ্য অনুবাদ হইতেছে Paul and Virginia (পাল ও বার্জিনিয়া ইতিহাস) এবং Elizabethএর।

দেখা যাইতেছে যে ইংরাজী হইতেও যাহা যাহা ভাবান্তরিত হইতেছে, সেগুলি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মূলে প্রথম শ্রেণীর রচনা নহে কিন্তু বাইবেল বাদ দিলে বাকী প্রায় সবগুলিরই বিষয়বস্তু ঐহিক—সে প্রেমের গল্প হইতে আরম্ভ করিয়া ইতিহাস-বিজ্ঞান পর্যন্ত। এই ঐহিকতার চূড়ান্ত প্রকাশ হইল শেক্সপীয়রের নাটকের নাটকীয় অনুবাদে। ইহার ফলে আমাদের সাহিত্যে ভাব ও আঙ্গিক—দুই-এরই মৌলিক পরিবর্তন ঘটিল। ১৮৫২ খ্রীঃএ The Merchant of Veniceএর বাংলা-রূপের নাম দেওয়া হয় ভানুমতী-চিত্ত-বিলাস। Romeo and Julietএর ভাবানুবাদ (adaptation) হয় ১৮৬৪ খ্রীঃ চারুমুখচিত্তহরা নামে। পরে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর Cymbeline অবলম্বনে 'সুশীলা-বীরসিংহ নাটক' রচনা করেন।

শেক্সপীয়র ছাড়া ১৮৬০ খ্রীঃর মধ্যে আর শুধু দ্বিতীয় শ্রেণীর নাট্যকার Rowe-র The Fair Penitentএর অনুবাদ হয়, 'অনুতাপিনী নবকামিনী নাটক' নামে।

শেক্সপীয়রের মহৎ নাটকগুলি এই অনুবাদকদের প্রচেষ্টার বাহিরেই রহিয়া গেল এবং এলিজাবেথীয় বা তৎপরবর্তী যুগের এক Rowe ছাড়া আর কেহ তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না।

সংস্কৃত এবং ইংরাজী হইতে অনূদিত গ্রন্থগুলির (১৮৬০ পর্যন্ত) প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে মহৎ ও চিরন্তন যে সকল মৌলিক সৃষ্টি তাহাদের খুব কমই ভাষান্তরিত হইয়াছে। সংস্কৃতে এক কালিদাস, মনু, গীতা ও ঋক্‌বেদ ছাড়া, অন্যান্য বেদ, দর্শন, উপনিষৎ (রামমোহনের কৃত প্রথম দিকের কয়েকটি অনুবাদ, কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের ন্যায়সূত্র ও

ভাষাপরিচ্ছেদের বঙ্গানুবাদ, পদার্থকৌমুদী ও জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের সর্বদর্শনসংগ্রহের অনুবাদ ছাড়া) এবং নন্দনতত্ত্বের (যেমন, ভরত, নন্দিকেশ্বর, মম্মটভট্ট, অভিনব গুপ্ত, বিশ্বনাথ) গ্রন্থ অনূদিতই হয় নাই। বর্ধমান-রাজ ও কালীসিংহ মহাশয় মহাভারত অনুবাদের ব্যাপারে বীরোচিত প্রয়াস করিয়াছিলেন এবং মূলের সঙ্গে সাধারণের পরিচয় ঘটাইয়া দিয়া পুরাণ সম্পর্কে লোকের অন্ধ মোহ অপসারণে অগ্রচারীর কাজ করিয়াছিলেন। ইংরাজী হইতেও আংশিকভাবে এক শেক্সপীয়র ও ডিফো ছাড়া আর কোনো প্রথম শ্রেণীর স্রষ্টা বাঙালী অনুবাদকের দৃষ্টিতে পড়িলেন না এবং আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ফরাসী বিপ্লবের সাহিত্যিক ও দার্শনিক এবং ইংলণ্ডের ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের লোকোত্তর সাহিত্যিকদের কেহই অনূদিত হইলেন না। যাঁহাদের লেখা পড়িয়া ইয়ং বেঙ্গল অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন সেই Hume, Locke, Rousseau, Tom Paine আবার Scott, Shelley, Wordsworth, Byron, Godwin (রামকমল ভট্টাচার্যের বেকনের সন্দর্ভ নামে বেকনের প্রবন্ধাবলীর ও দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সুবুদ্ধিব্যবহার নামে বেকনের Advancement of Learning-এর অনুবাদ ছাড়া)—সকলেই শুধু বাংলা-জানা বাঙালীর নাগালের বাইরেই রহিয়া গেলেন? রঙ্গলাল হোমরের অখ্যাতনামা কাব্যের অনুবাদ করিলেন, কিন্তু বায়রণে হাত দিলেন না কেন? কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, Paradise Lost-এর একাধিক অনুবাদ হইয়াছিল। কিন্তু সে অনুবাদ অনুবাদ নামেরই যোগ্য নহে, এমন কি রঙ্গলালের অনুবাদও নহে।

এই বিসদৃশ ঘটনার কতকগুলি কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথম কারণ হইল বাংলাভাষার তাৎকালিক অসামর্থ্য। সত্যই তখন বাংলা ভাষার ও বাঙালী পাঠক সাধারণের সামর্থ্য ছিল না শেক্সপীয়রের হ্যামলেট কি ম্যাকবেথ, মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট, বেকনের নোভাম অর্গ্যানাম্, মোরের ইউটোপিয়া, কি শেলীর প্রমিথিয়ুস্ আনবাউণ্ড ধারণ করে। তাই সাধারণের জন্য, সংস্কৃত ধর্মপুস্তক এবং ইংরাজী দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকদের গল্প, উপকথা ও কবিতাই প্রধানত অনূদিত হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, যাঁহারা এই অনুবাদকার্যে উৎসাহিত হইয়াছিলেন সেই সংস্কৃত পণ্ডিতদের মধ্যে তৎকালে বাংলাদেশে দর্শন, উপনিষৎ কি বেদের আলোচনার স্থলে মোটামুটিভাবে শুধু কাব্য আর ব্যাকরণের আলোচনাই চলিত। তাঁহাদের পক্ষে তাই গণ্ডীর বাহিরে যাওয়া সম্ভব হয় নাই। আর ইংরাজী হইতে যাঁহারা অনুবাদ করিয়াছেন, অন্তত ১৮৬০ খ্রীঃ পর্যন্ত, তাঁহাদের মধ্যে ত শ্রেষ্ঠ প্রতিভা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই ইংরাজী-শিক্ষিতেরা প্রায় কেহই ইয়ং বেঙ্গলের গোষ্ঠীর নহেন এবং কেহই প্রায় ডিরোজিও, রিচার্ডসন, কৃষ্ণমোহন, প্যারিচাঁদ, রসিককৃষ্ণের কি রামতনুর কাছে ইংরাজী পাঠ লন নাই; আর যে জনকয়েক ইংরাজ এই অনুবাদের কাজে সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহারাও ইংলণ্ডের অষ্টাদশ শতকী শিক্ষায় শিক্ষিত। অন্যে পরে কা কথা স্বয়ং রিচার্ডসনই টোরী হিসাবে বিপ্লবাত্মক সাহিত্য সহ্য করিতে পারিতেন না। শেক্সপীয়রের কথা স্বতন্ত্র—তিনি ত প্রাচীন ক্লাসিকের স্তরে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শেলী সম্পর্কে রিচার্ডসনের কি মত ছিল জানিতে কৌতূহল হয়। তবে এ কথা স্বীকার্য যে এইযুগে ইংরাজ কবি হিসাবে বায়রণের আকর্ষণই ছিল সর্বাধিক এবং তাঁহার নীচেই পোপ। মধুসূদন, শেলী বা কীটসের কথা বেশী বলেন নাই। কিন্তু মধুসূদন কলেজীয় শিক্ষায় টোরি রিচার্ডসনের শিষ্য, উদারপন্থী বিপ্লবী ডিরোজিও-র নহেন। ডিরোজিও-র সাক্ষাৎ শিষ্যদের সচেতন বিপ্লববাদ একমাত্র শেলীর মধ্যেই নিজেদের প্রতিফলন দেখিতে পারিত। তবে শেলী, প্রায় ইঁহাদের সমসাময়িক। তাই বোধ হয় অত শীঘ্র তিনি দীর্ঘ সমুদ্রপথে ভালো করিয়া পাড়ি জমাইয়া উঠিতে পারেন নাই। আর তৎকালীন ইংলণ্ডেও ত তখন বায়রণ শেলীর অপেক্ষা অনেক বড় কবি বলিয়া স্বীকৃত—স্বয়ং মহাকবি গ্যেটের দ্বারাও। তাহার উপর বায়রণের সচেতন আত্মম্ভরিতা, সগর্ব উচ্ছ্বাস, আত্মরতি ও উন্নাসিকতা সেযুগের ইয়ং বেঙ্গলের মন যেন লুটিয়া লইয়াছিল; অপর পক্ষে ভাষার সৌন্দর্যের প্রতি নবানুরাগের ফলে পোপের ভাষার মার্জনা, বাক্যের আপাত-বিরোধিতা, শ্লেষ ইত্যাদি গুণ ইয়ং বেঙ্গলের মনোহরণ করিল—শেলী বা ওয়ার্ডস্বার্থের ভাবগভীর অস্পষ্টতা অনুধাবন করিবার পরিপক্কতা তখনও ইঁহাদের আসিতে দেরী ছিল।

সংস্কৃত, ফারসী ও ইংরাজী হইতে যাহা কিছু ১৮৬০ পর্যন্ত অনূদিত হইয়াছিল তাহা হইতে সে যুগের নির্মীয়মান রুচি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত করা যায়।

১। প্রথমেই 'ঐহিকতা'। এই ঐহিকতা নব মানবতাবাদেরই অঙ্গ। সে যুগের ভাবলোকে দেবতার স্থলে মানুষ আসিয়া বসিতেছিল এবং সেই মানুষের সুখের মূলে যে আছে জ্ঞান তাহারও উপলব্ধি ঘটিতেছিল। তাই ইতিহাস ও বিজ্ঞানের বই অনূদিত হইতেছিল। দেবদেবীর উপাখ্যানের স্থলে মানুষের আখ্যান এবং দেবদেবীর লীলার বদলে মানব-মানবীর প্রেম ও তাহাদের হৃদয়ের প্রসার ও বৈচিত্র্য হইয়া উঠিল বেশী কৌতূহলোদ্দীপক। অনুবাদের মধ্যে তাই প্রেমের কাহিনীরই প্রাধান্য। এবং সে প্রেম একনিষ্ঠ। বহুনিষ্ঠতা আর তখন সাহিত্যের বিষয় নহে।

২। 'পরিত্যক্ত গ্রাম' জাতীয় কাহিনী আমাদের কাহিনী কাব্যের নূতন সন্ধান দিল। এ কাহিনীর রস আবার প্রেমকাহিনী হইতে স্বতন্ত্র। এই জাতীয় সমাজ-সচেতন কাব্য পাঠকের মনকে বস্তুনিষ্ঠ করিয়া তুলিয়া আরও জীবনমুখী করিয়া তুলে।

৩। ইংরাজী ও সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ ও অভিনয়, কৃষ্ণ ও ভীম যাত্রার স্থূল আবেদনের বদলে সূক্ষ্মতর ও বিচিত্রতর আবেদনে জনমানসকে অভ্যস্ত করিল; এবং ইংরাজী নাটকের সংস্পর্শে শুধু যে আঙ্গিকের পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল তাহাই নহে, আমাদের নাটকের ধারণাই বদলাইয়া গেল। ট্র্যাজিডি আসিল। ট্র্যাজিডির আবির্ভাব শুধু এক নূতন ধরনের নাটকেরই আবির্ভাব নহে, ইহার অর্থ নাটকের প্রতি আমাদের মনোভাবের আমূল পরিবর্তন; এবং সেই সঙ্গে জীবনের প্রতিও। পরিবেশে এবং চরিত্রে অমঙ্গলের আবির্ভাবকে এতদিন প্রক্ষিপ্ত বা ব্যক্তির দুষ্কৃতিজাত বলিয়া মনে করা হইত এবং সেইজন্য অমঙ্গলকে প্রধান করিয়া নাট্যরচনা করা হইত না। সেই মনোভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত মনোভাব আজ সমাজে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। 'বিধবা বিবাহ নাটক' রচয়িতা উমেশচন্দ্র মিত্র ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকাতে বলিতেছেন, "This, the author believes, is the first attempt made to introduce the regular tragedy into Bengallee drama"[২২] এবং ট্র্যাজিডির আবির্ভাব সম্পর্কে বলিতেছেন, Our national idea .of the purposes of drama is that it should only amuse. Every story must end well. Satire upon fashionable vices or unpopular opinions are occasionally conveyed in episodical scenes, but the main story runs to a happy termination in order to please. Even with purposes so limited and means thus restricted, the drama would not be an ineffective instrument of social reformation; but then its success would entirely depend upon its falling in with current public opinion. A comedy can never well attempt *to alter popular opinions.* A tragedy in most cases can, and that for obvions reasons."[২২] অর্থাৎ এ যুগের নাট্যকার নাটকের সামাজিক মূল সম্পর্কে সচেতন এবং তিনি সচেতনভাবেই মানুষের চরিত্রে পরিবর্তন ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছেন; তিনি শুধু খুশী করিতেই চাহিতেছেন না।

(৪) বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থের অনুবাদ এই যুগে সুপ্রচুর। এ বিজ্ঞান অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান নহে, জড়-বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য বহিঃ-প্রকৃতিকে মানুষের বশে আনিয়া তাহার জীবন সুখী ও সমৃদ্ধতর করিয়া তোলা। এই বিজ্ঞান তাই ঐহিকতার পোষক, এবং কুসংস্কারের হন্তারক। ইহা মানুষকে আত্মশক্তিতে স্বপ্রতিষ্ঠ করে; অদৃষ্টের উপর তাহার অসহায় নির্ভরশীলতা কমায়।

(৫) আবার অসংখ্য সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ রক্ষণশীলতার প্রাচুর্যেরই পরিচয় বহন করে।

অনুবাদিত গ্রন্থ হইতে কিন্তু সে যুগের মানস-সংস্থানের পুরাপুরি পরিচয় পাওয়া গেল না। কেন না অনুবাদ যাহাদের জন্য হইত তাহারা নহে, উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্তই আমাদের বিশ্লেষণের বিষয়। এখন আমরা এই মধ্যবিত্তের মৌলিক সৃষ্টির (ইংরাজী, বাংলা ও ফার্সী) কিছু খোঁজ লইয়া দেখিব যে মেঘনাদবধে মধুসূদন যে দ্বন্দ্বের সাহিত্যিক রূপ দিয়াছিলেন এবং যে দ্বিমুখী দ্বন্দ্ব এই যুগের সমাজমানসের মূল সত্য, তাহা মধু ভিন্ন অন্যদের সৃষ্টিতে কেমন বিকশিত হইয়াছে। এবং সেকালের সাহিত্যিক রুচির স্থান কোন নূতন ধরনের রুচি দখল করিয়াছে। ইহাতে প্রমাণ হইবে যে, মধুসূদন ভূমি-স্ফোটক নহেন; বুঝা যাইবে অন্যেরা যাহা বলি বলি করিয়াও বলিতে পারিতেছিলেন না অথচ না বলিতে পারিয়া ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিলেন তাহা মধুসূদন বলামাত্র অগ্রগামী দল অমৃতফল বলিয়া কেন লুফিয়া লইলেন এবং কেনই বা অনুকরণের স্রোত বহিয়া গেল, এবং সেই কথাটি বলিতে পারায় ঐ যুগের মূল সাহিত্যিক সমস্যাও কিরূপে সমাহিত হইল।

(ক) দর্শন ও বিজ্ঞান (প্রাকৃত ও সামাজিক)

রামমোহন রায়—তুহ্ফাৎ-উল্-মুয়াহ্হিদীন (১৮০৩-৪)

এগুলির শেষ ছয়খানি অনুবাদ হইলেও গুরুত্বের দিক হইতে মৌলিক বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য। এগুলির প্রথম তিনখানি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে এবং একেশ্বর-বাদের স্বপক্ষে।	বেদান্তদর্শন (১৮১৫) বেদান্তসার („) কেনোপনিষৎ (১৮১৬) কঠোপনিষৎ (১৮১৭) মণ্ডুকোপনিষৎ (১৮১৯) মাণ্ডুক্যোপনিষৎ (১৮১৭)

রামমোহন রায়—১৮১৭ সাল হইতে ১৮২৬ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে পৌত্তলিকতা, একেশ্বরবাদ, এমন কি মদ্যপান লইয়া বিচারের বহু বিবরণী।

রামমোহন রায় সহমরণের অনৌচিত্য ও নিবারণবিষয়ক বহু পুস্তিকা (১৮১৮, ১৯, ২৯)

" গুরুপাদুকা (পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে ১৮২৩)

" ব্রহ্মোপাসনা (১৮২৮)

" ব্রহ্মসংগীত (")

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার....বেদান্তচন্দ্রিকা (১৮১৭); সম্ভবত রামমোহনের বেদান্তের প্রত্যুত্তর হিসাব লিখিত। সকলকে ইনি রামমোহনের সম্পর্কে সতর্ক হইতে বলিয়াছেন।

স্কুল বুক সোসাইটি....প্রশ্নাবলী (১৮২২ হইতে); Animal Biology

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাকল্পদ্রুম—Encyclopaedia Bengalensis (১৮৪৬ হইতে); এইগুলিকে আপাতবিচারে দর্শন বা বিজ্ঞানের গ্রন্থ বলা না গেলেও, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সর্ববিষয়ে জ্ঞানপ্রচারের শুভেচ্ছা হইতে জাত বলিয়া এই পর্যায়েই সন্নিবিষ্ট হইল। হিন্দুদর্শনের উপর কৃষ্ণমোহনের প্রভূত গবেষণামূলক গ্রন্থ অনেক পরে ১৮৭৬ খ্রীঃ-এ প্রকাশিত হয়। সেইজন্য আমাদের অত্রত্য হিসাবে তাহা ধরা হইতেছে না।

H. H. Wilson....Sketches on the Religious Sects of the Hindus.

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর.... ব্রাহ্মধর্ম (১৮৫২)

রামগতি ন্যায়রত্ন........ বস্তুবিচার (১৮৫৯)

ভূদেব মুখোপাধ্যায়.... পুরাতত্ত্বসার (১৮৫৮)

অক্ষয়কুমার দত্ত........ বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার (২ খণ্ড—১৮৫২ ও ৫৩); George Combe "রচিত Constitution of Man অবলম্বনে লিখিত হইলেও একান্তভাবে অনুবাদ নয়। ইহাতে অক্ষয়কুমারের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ও মতামত অনেক আছে। প্রথম ভাগে শারীর বৃত্তির মিতাচার ও জীবনযাত্রার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি বিচার এবং এবং নিরামিষ ভোজনের যুক্তিযুক্ততা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ২য় ভাগে ধর্ম ও সমাজের নিয়ম প্রতিপালন এবং সুরাপানের দোষ বিচারিত হইয়াছে। বইটির প্রভাবে সেকালে কেহ কেহ জীবনযাত্রাপ্রণালী পরিবর্তিত

করিয়া উপকার লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়।"৯৩

অক্ষয়কুমার দত্ত....ধর্মনীতি (১৮৫৫) বাহ্যবস্তুরই ৩য় খণ্ড বলা চলে।

এই তিনখানি গ্রন্থে এবং দেবেন্দ্রনাথে বিশেষ লক্ষণীয় হইল এই যে, দর্শন বা বিজ্ঞানের নিছক তাত্ত্বিক আলোচনা অপেক্ষা ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র গঠনই হইয়া দাঁড়াইয়াছে মুখ্যতর লক্ষ্য।

এগুলি ছাড়া বিজ্ঞানবিষয়ক বহু পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত ও বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পঠিত ও আলোচিত হইত। সমাজদেহে সেগুলির বহুবিস্তৃত প্রভাব অনস্বীকার্য। উইলসন সাহেবের বই অবলম্বনেই অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় পরে 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' লিখিয়াছিলেন; এবং এই গ্রন্থখানি প্রচুর কৌতূহলের উদ্রেক করিয়াছিল। সেইজন্য এখানিকে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। ইহার উপর ধরিতে হইবে আগেই উল্লিখিত বিজ্ঞান ও সাহিত্যবিষয়ক পত্রপত্রিকাগুলি, যথা—বিজ্ঞান সেবধি, 'বিজ্ঞানসার সংগ্রহ', 'বিবিধার্থসংগ্রহ', 'ব্রাহ্মণসেবধি', 'তত্ত্ববোধিনী' ইত্যাদি।

বিজ্ঞান ও দর্শন আলোচনার যে পরিণতি, অন্তত ১৮৬০ সাল অবধি আমরা অক্ষয়কুমারে আসিয়া লাভ করি (ইঁহাকে বিচার করিতে হইলে বেদের অপৌরুষেয়ত্বের বিরুদ্ধে তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত রচনাগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই সূত্রে কৃষ্ণমোহন, Rev. লালবিহারী দে প্রমুখ ব্যক্তিরা যে তাত্ত্বিক আলোচনার জোয়ার আনিয়াছিলেন তাহাও বিবেচ্য। আবার তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রমুখেরা The Quill ইত্যাদি পত্রিকায় এই ২ পক্ষকেই —অর্থাৎ gospel এবং বেদ—দুইকেই আক্রমণ করিতেছিলেন।) সে পরিণতির মূল কথা rationalism বা যুক্তিবাদ। শতাব্দীর প্রথম দিকে এই যুক্তিবাদ Derozioর মধ্যে প্রবল শক্তিতে প্রকট হইয়াছিল এবং তাঁহার বেশীর ভাগ সাক্ষাৎ ছাত্রদের মধ্যে ইহা যান্ত্রিক বস্তুবাদ (বা mechanical materialism—ইহাই ছিল philosophy of the enlightenment নামে ফরাসী বিপ্লবের মূল দার্শনিক ভিত্তি। ইহার ত্রুটি প্রধানত দুইটিঃ— এক—ঐতিহাসিক পারম্পর্যকে স্বীকার না করা, এবং দুই—জীবনে ঘটনাবলীর বা বস্তুপুঞ্জের পারস্পরিক সম্পর্কের বহু বিচিত্রতা স্বীকার না করা। এই ত্রুটি পরিহার করিয়া যে বস্তুতান্ত্রিক দর্শনের উৎপত্তি তাহাই Dialectical materialism বা দ্বন্দ্বমূলক জড়বাদ—উদ্ভাবক Marx এবং Engels) রূপে সঞ্চারিত হইয়াছিল। কৃষ্ণমোহনেরা ইহারই মধ্য হইতে আবার খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিলেন। তারাচাঁদ চক্রবর্তীরা ঐ যান্ত্রিক বস্তুবাদীই রহিয়া গেলেন

—ভাববাদী হইয়া উঠিলেন না। ব্রাহ্মধর্ম খ্রীষ্টানী আর যান্ত্রিক বস্তুবাদের সমন্বয় করিতে গিয়া শেষ পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথে ভাববাদে পর্যবসিত হইল কিন্তু তত্ত্ববোধিনী সম্প্রদায়ের অক্ষয়কুমার কি বিদ্যাসাগর অতখানি ভাববাদী ছিলেন কি না সন্দেহ। অক্ষয়কুমারের 'বাহ্যবস্তু'তে বস্তুর গুরুত্ব অতিমাত্রায় স্বীকৃত আর বিদ্যাসাগর ত নাস্তিক বলিয়াই খ্যাত ছিলেন।

এই আলোড়নে আর যাহাই হউক, শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের আচারান্ধতা কাটিয়া যুক্তিশীলতা যে আসিল ইহা অনস্বীকার্য। এই যুক্তিশীলতাই গোঁড়ামির এবং কূপমণ্ডুকতার শত্রু। কিন্তু তত্ত্ববোধিনীর যে ভাববাদিতা দেবেন্দ্রনাথে প্রকট হইতেছিল তাহাই শেষ পর্যন্ত কেশবচন্দ্র, গিরিশচন্দ্রের সহায়তায় রামকৃষ্ণের পরিপূর্ণ ভাববাদ এবং সর্বধর্মসমন্বয়ের আড়ালে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানে, কালী-cultএ পর্যবসিত হইল। এই চরম ভাববাদী পরিণতির অন্যান্য কারণের মধ্যে সামাজিক কারণটিই আমাদের কাছে প্রধান। **ব্যক্তিজীবনের পরিপূর্ণ স্ফুরণের পথে এবং সমাজকল্যাণের পথে যে বাধা, রাজনৈতিক পরাধীনতা, পদে পদে দিতেছিল, সেই বাধা প্রথম যুগে সৃষ্টি করিল মধুসূদনের করুণরসাত্মক মহাকাব্যে পৌরুষের পরাজয়ের কাহিনী আর সমাজ-সংস্কারে অসফল কেশবচন্দ্রে পরিপূর্ণ অধ্যাত্মবাদ।**

(খ) গদ্য, উপন্যাস, রম্যরচনা, নাটক, প্রহসন, প্রবন্ধ ইত্যাদি ঃ

আলোচ্য যুগেই—১৮১৫ হইতে ১৮৬০—বাংলা গদ্য একেবারে হাতেখড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া এমন পরিণতি লাভ করে যে ১৮৬৫ খ্রীঃ বঙ্কিম দুর্গেশ-নন্দিনী প্রকাশ করিতে সমর্থ হন। গদ্যের ভাষা নির্মিত হইবার অর্থই হইল ভাষার গণতন্ত্রীকরণ, লেখ্য ভাষার অষ্টপ্রাহরিক রূপে সর্বজনগ্রাহ্যতা, সাক্ষরতা বৃদ্ধি, বাংলাদেশে ফার্সীর প্রাধান্যের লোপ এবং গল্প উপন্যাসের সৃষ্টির সম্ভাবনায় ফলে জনসাধারণের রুচি ও রসবোধের উন্নয়ন—সর্বোপরি পাঠক-সাধারণের সৃষ্টি। এতদিন পর্যন্ত লিখিত সাহিত্য ছিল বিদগ্ধ-জন-গ্রাহ্য। এখন সাহিত্যের সেই উন্নাসিক আভিজাত্যের ছাপ আর রহিল না। সাহিত্যের মর্ত্যায়ন (secularisation) অনুবাদেই শুরু হইয়াছিল ; এখন গল্প, উপন্যাস শুধু যে মানবপ্রধানই হইল তাহা নহে—ব্যক্তিচরিত্রের (individual) প্রাধান্যও বাড়িতে লাগিল, character হইতে চলিল destiny। মঙ্গল কাব্যের, এমন কি ভারতচন্দ্রেরও, অন্ধ অদৃষ্টবাদ ধীরে ধীরে পথ ছাড়িয়া দিতেছিল ব্যক্তির আত্মনিয়ন্ত্রণের **অর্জ্যমান** অধিকারের সম্মুখে। নরনারীর প্রেম, দেশপ্রেম এবং প্রগতিকামী ও রক্ষণশীলদের মধ্যে বিতর্ক—এই সবই ছিল এই যুগের গল্প-

উপন্যাসের মূল উপজীব্য। আর নাটক, প্রহসন বা রসরচনার বেলায় প্রকট হইয়া উঠিল এ যুগের সাহিত্যের প্রচারপরায়ণতা (tendentiousness)। এ সময়ের সাহিত্যিকেরা কলা-কৈবল্যবাদী (art for art's sake) ত ছিলেনই না, এমন কি রসবাদীও ছিলেন কিনা সন্দেহ। ইঁহাদের প্রায় সমস্ত রচনাই উদ্দেশ্য-মূলক—এবং উদ্দেশ্য হইল সমাজ-কল্যাণ, সে অবাঞ্ছিতের সমালোচনা করিয়াই হউক অথবা বাঞ্ছিতের গুণোদ্বোধন করিয়াই হউক :—

বেতাল পঞ্চবিংশতি.........বিদ্যাসাগর......১৮৪৭

অনুবাদ হইলেও গুরুত্বের দিক হইতে এ গ্রন্থখানি অদ্বিতীয় বলিয়া মৌলিক রচনার মধ্যেই গৃহীত হইল।

বাংলার ইতিহাস............বিদ্যাসাগর......১৮৪৭-৪৮

জীবনচরিত.............. ,, ১৮৪৯

কলিকাতা কমলালয়,
নববাবুবিলাস,
নববিবিবিলাস } ব্যঙ্গনিবন্ধ...ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়

কলিরাজার মাহাত্ম্য......বিশ্বনাথ মৈত্র...১৮৫০

কলিচরিত...............রামধন রায়...১৮৫৩

এই জাতীয় নকসার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হুতোম প্যাচার নক্সা বাহির হইয়াছিল ১৮৬০ এর পরে কিন্তু ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছিল এইগুলি। মধুসূদনের প্রহসন দুইখানিকে এই পঙ্ক্তিতে ধরা হয় নাই।

আলালের ঘরের দুলাল—প্যারীচাঁদ মিত্র—১৮৫৪ হইতে 'মাসিক পত্রে'। মধুসূদন এই গ্রন্থের ভাষাকে মেছুনীদের ভাষা বলিয়াছিলেন কিন্তু ইহা বাংলা সাহিত্যের পরম বিস্ময়। গদ্যের ভাষায় ইহা বিপ্লব আনয়ন করিল—গদ্যকে একেবারে যেন অশিক্ষিতের দ্বারে আনিয়া দিল। ভাষা যেন বলিল 'আর কোনো আভরণ রাখিব না। দেখি তাহাতেও তোমাদের হৃদয়ে পৌঁছাইতে পারি কি না।' বাংলা সাহিত্যে এই **প্রথম উপন্যাস** রচিত হইয়াছিল অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত স্ত্রীলোকদের জন্য। তাহাদের বোঝাটাই ছিল প্যারিচাঁদের সার্থকতার মানদণ্ড। নারীর প্রতি এই মনোযোগ, তাহার

কল্যাণের জন্য ব্যাকুলতা অবশ্য তৎকালে প্রগতিশীলদের সকলেরই একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু 'আলাল' সম্পর্কে সর্ব-প্রধান বক্তব্য হইল এই যে ইহা একেবারেই রোমান্টিক উপন্যাস নহে—অনেকখানি ইংরাজী Picaresque ধরনের; তবে দৃষ্টিকোণে অনেকটা Defoe, Smollet, Fielding এর সঙ্গে এবং স্থানে স্থানে Dickens এর সঙ্গে মিল আছে। উদ্দেশ্য সমাজ-সংস্কার। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে গিয়া প্যারীচাঁদ প্রথম বাংলা সাহিত্যে type চরিত্র সৃষ্টি করিলেন। এই type কিন্তু average নয় কেন না average কোন জীবন্ত চরিত্র হইতে পারে না। type তাহাকেই বলিব যাহার মধ্যে প্রদর্শিতব্য গুণগুলির আধিক্য ঘটিয়াছে।

ঐতিহাসিক উপন্যাস—ভূদেব মুখোপাধ্যায়—১৮৫৭ হইতে। ইহার দুইটি কাহিনীই রোমান্টিক। ইহা অবশ্য অনুবাদ কিন্তু ইহার প্রভাবের কথা বিচার করিয়া এবং ভূদেবের রীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইহাকে মৌলিক-কল্প বলা যাইতে পারে। এই গ্রন্থের অঙ্গুরীয়-বিনিময় নামক গল্পটি বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনীর উপর ছায়াপাত করিয়াছে।

উপরি-উক্ত দুইখানি গ্রন্থ বাংলা উপন্যাসের দুইটি ধারায় সম্ভাব্য অগ্রগতির সূচনা করিলেও ভূদেবের ধারাই অনুসৃত হইল, প্যারিচাঁদের নয়; যদিও ভাষার ক্ষেত্রে তাঁহার দান অপরিসীম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ভূদেবকে কেহ ঔপন্যাসিক হিসাবে মনে করিয়া রাখে নাই। হয়ত মৌলিকতার অভাবের জন্য।

বিজয়বল্লভ............গোপীমোহন ঘোষ (১৮৬৩—)

এখানির উল্লেখ করিলাম এই জন্য যে এইখানিকেই রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বাংলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস বলিয়াছেন। কিন্তু ইহাকে উপন্যাস আখ্যা দেওয়া যায় না এই কারণে যে ইহা 'সংস্কৃত আখ্যায়িকা এবং দেশীয় উপকথা'র আদর্শেই রচিত। ভূদেবের 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৮৭৫) আমাদের আলোচ্য যুগের মধ্যে পড়ে না। ইহাতে স্বাদেশিকতাই মূল বিষয়-বস্তু। রামগতি ন্যায়রত্নের 'রোমাবতী' ঠিক আমাদের আলোচ্য যুগের মধ্যে না পড়িলেও ১৮৬২ খ্রীঃ প্রকাশিত বলিয়া, আলোচনার সৌকর্যার্থে এই তালিকায় ধরা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাও ঐ বিজয়বল্লভ জাতীয় রচনা। ইঁহার যে রচনা

আমাদের কাছে মূল্যবান সে 'ইলছোবা' নামীয় উপন্যাস, প্রকাশিত হয় ১২৯৫ সালে। এই উপন্যাসে কিছু বাস্তবধর্মিতা রহিয়াছে।

ভ্রমণকাহিনী......দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—১৮৫৮ খ্রীঃ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত। বাংলা ভাষায় অভূতপূর্ব প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট সরল রচনা।

দেখা যাইতেছে যে গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে সার্থক মৌলিক রচনার, ১৮৬০ পর্য্যন্ত, তেমন সদ্ভাব নাই। প্রচেষ্টা হইতেছে—ভাষায় ও ভাবে উপকরণ সংগৃহীত হইতেছে—সব কিছু যেন বঙ্কিমের অপেক্ষায় রহিয়াছে।

সহমরণ প্রথা নিবারণ-কল্পে ও বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিষয়ে নানাপ্রবন্ধ } রামমোহন রায়

অন্যান্যেরা রামমোহনকে গালাগালি দিতেন আর 'রামমোহন শাস্ত্রীয় বিচার বা ব্যাখ্যা করিতেন যথোপযুক্ত ধীরতা ও গাম্ভীর্যের সহিত।'[৯৫] কৃষ্ণমোহনও গুড়ুম সভার আক্রমণের উত্তর এই ভাবেই দিতেন। এই যুক্তিনির্ভরতাই প্রগতির লক্ষণ। আমাদের দেশে পণ্ডিতী কলহে এই গালাগালিই এখনও পর্য্যন্ত চলে। রসরাজ এবং ভাস্কর পত্রিকায় অপণ্ডিতী কলহের ক্ষেত্রেও এই রীতি ছিল এবং প্রায়ই ইহা অশ্লীলতার পর্যায়ে নামিয়া আসিত। প্রগতি-কামীদের মধ্যে এই রুচিস্খলন কখনও লক্ষ্য করা যায় নাই।

পুরাতন বাংলা কবির (দাশু রায়, ভরতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন ইঃ)
ও কাব্যের বিষয়ে গবেষণার সূত্রপাত .... ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত....
চারুপাঠ-.... .... অক্ষয়কুমার দত্ত....
প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা বিষয়ক প্রবন্ধ- .... ,,
সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

আমাদের খুব সৌভাগ্য যে বিদ্যাসাগর এই সমালোচনাটি বাংলায় করিয়া-ছিলেন ১৮৫৭ খ্রীঃ। উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালীর রুচি এবং রসবোধে কি আমূল পরিবর্তন ঘটিতেছিল তাহার সাক্ষ্য এই ক্ষুদ্র সমালোচনাটি। সুকুমার সেন মহাশয় বলিয়াছেন যে, এই প্রবন্ধে সাগর মহাশয়ের 'অসাধারণ রসজ্ঞতার' পরিচয় আছে। কিন্তু এই রসবোধ যে পূর্বতন শুদ্ধ আদিরসবিলাস নহে, ইহা যে এক নূতন রসবোধ তাহা ঐ রচনার ছত্রে ছত্রে সুপরিস্ফুট। বিদ্যাসাগর বিভিন্ন সংস্কৃত কাব্য ও নাটক বিচার প্রসঙ্গে বারে বারেই প্রচলিত পণ্ডিতী রুচি ও বিচারপদ্ধতির প্রতি শ্লেষাত্মক কটাক্ষ করিয়াছেন: যেমন রঘুবংশ সম্পর্কে, "কিন্তু এতদ্দেশীয় সংস্কৃত-ব্যবসায়ীরা এমনই সহৃদয় ও এমনই রসজ্ঞ যে

সংস্কৃতভাষার সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্য রঘুবংশকে অতি সামান্য কাব্যজ্ঞান করিয়া থাকেন।" এবং শিশুপাল-বধ সম্পর্কে "কিন্তু ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা যে ইহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ইহা কোনোক্রমেই অঙ্গীকার করিতে পারা যায়না। সম্যক্ সহৃদয়তা থাকিলে……"। শেষে নৈষধ সম্পর্কে, "কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরা, বিশেষতঃ নৈয়ায়িক মহাশয়েরা, এমন অত্যুক্তিপ্রিয় ও অনুপ্রাসভক্ত যে তাঁহারা সকল কাব্য অপেক্ষা নৈষধচরিতের সমধিক প্রশংসা করিয়া থাকেন।"[৯৬] নূতন যুগের মানুষের এই যে নূতন রুচি, যাহা বহিরঙ্গ অপেক্ষা অন্তরঙ্গকে বেশী মূল্য দেয়, formকেই সর্বস্ব মনে করেনা, বরং সাহিত্য জীবননিষ্ঠ হইল কিনা ইহাই মুখ্যত দেখে—ইহা পশ্চিমের সঙ্গে সম্পর্কের প্রত্যক্ষ ফল।[৯৭] জীবনকে নূতন করিয়া দেখিবার বাসনার ফলেই এই নব রসবোধের উদ্ভব। নিষ্পান্ন রসটি বীর কি আদি ইহা বিচার করিবার বদলে এই রসবোধ প্রথমে দেখে সাহিত্য জীবনানুগ হইয়াছে কিনা। বিদ্যাসাগর তাই কালিদাসকে স্তুতি করিতে গিয়া বলিয়াছেন কালিদাসের সবই যেন স্বভাবোক্তি অলংকার।

জ্ঞানোপার্জন সভায় পঠিত
বিভিন্ন গুরু প্রবন্ধাবলী— কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়,
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ;
এইগুলি হইতে আমরা বুঝিতে পারি
নব্য বঙ্গের অন্বেষা ও অনুসন্ধিৎসা
কত বিচিত্র পথে চলিয়াছে।

এগুলি ছাড়া, এই যুগে অন্তত দুইখানি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস[৯৭ক], কয়েকখানি ব্যাকরণ, এবং কয়েকখানি অভিধান জাতির ভাষা-চেতনা প্রমাণ করে। প্রবন্ধের মধ্যে আরও ধরিতে হইবে বিদ্যাসাগরের নানা সমাজ-সংস্কার মূলক রচনা ও বিতর্ক, অক্ষয়কুমারের তত্ত্ববোধিনীতে বিচিত্র-বিষয়ক প্রবন্ধ, প্যারিচাঁদ ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সারগর্ভ রচনাসমূহ—এক কথায় তৎকালীয় পত্র-পত্রিকায় সংখ্যাহীন এই জাতীয় রচনাপুঞ্জ। তৎকালে সদ্যোন্মুক্ত বুদ্ধি যেন স্বর্গ-মর্ত্য বিহার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। উনিশ বছরের Derozio India Gazetteএ Kant এর সমালোচনা করিবার সাহস রাখিতেন!

আলোচ্য যুগে নাম দেখিয়া নাটক চেনা যাইত না। 'কৌতুকসর্বস্ব নাটক' কি 'প্রেম নাটক' নামে নাটক হইলেও কাজে নয়। কারণ এগুলি শুধু গদ্যেপদ্যে রচিত পাঠোপযোগী অনুবাদ গ্রন্থ। যেগুলি অভিনয়োপযোগী বা অভিনয়ের উদ্দেশ্যে রচিত নাটক, সে মৌলিক বা অনুবাদিত যাহাই

হউক, সেগুলি বেশীর ভাগই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। কলাকৈবল্যবাদীদের এ যুগে ভালো লাগিবার মত প্রায় কিছুই নাই। সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় এই প্রচারপরায়ণতা স্ফুট হইলেও নাটক ও প্রহসনে ,সেইটাই প্রধান উপজীব্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কারণ নাটক হইল সর্বাপেক্ষা বেশী সমাজ-মুখাপেক্ষী শিল্প। সমাজ-মানসের প্রতিফলন তাই সর্বপ্রথম নাটকেই ঘটে। বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সুরাপান, বেশ্যাসক্তি,—এই কয়টি বিষয়বস্তুকেই সেকালের সার্থক-অসার্থক বেশীর ভাগ নাটকেরই মূল বলা চলে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জীবনের তৎকালে এইগুলিই ছিল পাপমূল (Vices)। রামমোহনের পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ বা সতীদাহ প্রথা লইয়া সম্ভবত কোন নাটক লেখা হয় নাই। তাহার কারণ ঐ দুটির কোনটারই মঞ্চে রূপায়িত হওয়া সম্ভব নয়। তাহা ছাড়া তখনও বাংলাভাষা, বিশেষ করিয়া গদ্য নির্মীয়মান। প্রথমে অবশ্য সংস্কৃত ও ইংরাজী নাটকের অনুবাদ দিয়াই এদেশে অভিনয় শুরু হয়। কিন্তু মৌলিক রচনা আসে সমাজসংস্কারের তীব্র জোয়ারের ফেনায় ভর করিয়া—শুরু হয় রামনারায়ণের পুরস্কার-পাওয়া নাটক কুলীনকুল-সর্বস্ব দিয়া আর শেষ হয়, বলা চলে না, পরিণত হয়, অত্যাচারী চা-করদের মুখোশ খুলিয়া দিবার জন্য লিখিত 'চা-কর দর্পণ' নাটকে। দেখা যাইতেছে যে, সমাজ-সংস্কার-বাসনাই যে নাট্যপ্রচেষ্টার মূলে আছে শুধু তাহাই নয়, নাট্যকারেরা শুধু রসসৃষ্টির জন্য নাটক লিখিতেছেন না বলিলেই চলে। পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্রের যুগেও স্বাদেশিকতা ছিল নাটকের মূল উপজীব্য—অবশ্য রূপায়নের পদ্ধতিতে পার্থক্য ঘটিয়াছিল এবং রামকৃষ্ণের প্রভাবে তাহাতে প্রচুর ভক্তিরস মিশিয়াছিল। কিন্তু প্রথম যুগে drama for reform's sake ই মূল কথা। এবং সেই কারণে প্রথম শ্রেণীর নাটক সে যুগে সৃষ্টি হয় নাই বলিলেই চলে। এমনকি মধুসূদনের নাটক বাদ দিলে, বিশুদ্ধ শিল্পবিচারে নীলদর্পণও ত্রুটিপূর্ণ ঠেকে। কিন্তু দীনবন্ধুর সংস্কারের আগ্রহ শিল্পীর সে নৈর্ব্যক্তিকতার কামনাই করে না। সেই জন্য শুধু দীনবন্ধু নয়, অন্যান্য প্রায় সকলেই সে যুগে propagandists. মধুসূদন প্রহসন দুটিতে কিন্তু প্রচারণার আশ্রয় লইলেও (তাহাও সোজাসুজি নয়) অন্য সৃষ্টিগুলিতে তাহার বহু উর্ধ্বে উঠিয়াছিলেন। তিনি তাই সে যুগের মহত্তম শিল্পী।

এই সকল নাটকের প্লটের ভিত্তি তাহা হইলে সংস্কার-চিকীর্ষার সঙ্গে সংস্কারবিমুখিতার দ্বন্দ্ব—এবং এই সূত্রেই প্রথম সত্যকারের ট্র্যাজিডি বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করে। সেখানি উমেশ মিত্রের বিধবাবিবাহ নাটক। ইহার আগে ট্র্যাজিডির চেষ্টা হইয়াছিল ১৮৫০ [সন ১২৫৮] খ্রীঃ যোগেশচন্দ্র গুপ্তের

[?] কীর্তিবিলাস নাটকে। কিন্তু এখানির নাট্য-গুণ না থাকায় উমেশ মিত্র মহাশয়কেই বাংলাভাষায় প্রথম ট্র্যাজিডি-লেখকের সম্মান দিতে হয়। দুইজন নাট্যকারই সচেতন যে তাঁহারা নূতন কিছু করিতেছেন, এবং দুইজনেই ট্র্যাজিডির প্রবর্তন সম্পর্কে দীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়াছেন। উমেশচন্দ্র বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, নাড়া দিয়া ব্যক্তির চরিত্র পরিবর্তন করিতে হইলে ট্র্যাজিডিই উপযুক্ত মাধ্যম আর যোগেন্দ্রগুপ্ত রসানুভূতির দৃষ্টিকোণ হইতে বলিতেছেন, "অত্যল্প বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে শোকজনক ঘটনা আন্দোলন করিলে মনোমধ্যে এক বিশেষ সুখোদয় হয়....।" এই দুই ভূমিকা পাঠ করিলে ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্ব এবং সেই সঙ্গে নূতন জীবনবোধ-প্রসূত রসানুভূতিই ট্র্যাজিডি সৃষ্টির জন্য দায়ী। যখনই প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ব্যক্তির সম্যক্ স্ফুরণের পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হইয়া দাঁড়ায় তখনই নব শক্তিতে উদ্দীপ্ত পুরুষ একাকী তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া আত্মবলি দেয়। এই নবশক্তি সব সময়ে যে কল্যাণকর তাহা নয়। কল্যাণকর হয়ত সেই শক্তি হইতে পারিত অনুকূল সামাজিক পরিবেশে কিংবা আত্মপ্রকাশের কোনো মহত্তর মাধ্যম পাইলে। যেমন Macbethএর দুরাকাঙ্ক্ষা কোনো শ্রেয়োতর মাধ্যম পাইলে হয়ত রাজহত্যার পথে যাইত না। কিন্তু ঐ সামাজিক পরিবেশে ম্যাকবেথের জীবন ট্র্যাজিক না হইয়া উপায় নাই। ইহার অর্থ এই নয় যে, সমাজ আর ব্যক্তির দ্বন্দ্বের নিরসনের সঙ্গে সঙ্গে ট্র্যাজিডিরও লোপ ঘটিবে। কেন না এই দ্বন্দ্বের নিরসন একেবারেই হইয়া যাইবে এমন কোনো লক্ষণ এখনও দেখা যাইতেছে না বরং নূতন নূতন সমাজ-ব্যবস্থা নূতন নূতন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিতেছে। বাংলাদেশে উনিশ শতকের মাঝামাঝি এই দ্বন্দ্বই জটিল আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এবং তাহাই ট্র্যাজিডির জন্ম দিয়াছিল। (**এই ট্র্যাজিক চেতনার কাব্যিক প্রকাশ 'মেঘনাদবধ' মহাকাব্যে আর নাটকীয় সুষ্ঠু প্রকাশ 'কৃষ্ণ-কুমারী নাটকে'**)।[৯৭খ]

ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের **দ্বন্দ্বের মুখ্য এবং গৌণ রূপের** কথা আলোচিত হইয়াছে। প্রগতির সঙ্গে রক্ষণশীলতার যে বিরোধ সেইটিই **দ্বন্দ্বের গৌণ রূপ**। আর ব্যক্তির স্ফুরণের পথে পরাধীনতা যে বাধা স্থাপন করিয়াছিল, যাহা মধুসূদন, রসিককৃষ্ণ, রামগোপাল, বিদ্যাসাগরের মত ব্যক্তিকে মহত্ত্বের এবং সার্থকতার উচ্চতম শিখরে উঠিতে দেয় নাই, যাহা মধুসূদনকে মক্কেলের খোশামোদ করিতে আর বিদ্যাসাগরকে গর্ডন ইয়ং আর হ্যালিডের কাছে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছিল, যাহা দীনবন্ধুকে কোনোদিন প্রাপ্য উন্নতি লাভ করিতে দেয় নাই, যাহা দেশীয়দের জন্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের

পদকেই চূড়ান্ত করিয়া রাখিয়া সকল উচ্চাশার মূলে কুঠার হানিয়াছিল, সেই রাজনৈতিক বাধাই আরও মূলীভূত বলিয়া তাহাকেই **মুখ্য দ্বন্দ্ব** বলা হইয়াছে। কিন্তু মধুসূদনে ছাড়া আর কাহারও মধ্যে এই দ্বন্দ্বটি সাহিত্যিক রূপ গ্রহণ করিল না। **এই কারণেই মধুসূদন যুগন্ধর।** মধুসূদনে যে ব্যক্তির পৌরুষের অহেতুক পরাজয়ের চেতনা তাহার মূলে আছে জীবনের এই বাস্তব পরাজয়। এমন কি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় গৃহতাড়িত হইয়া রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে যে ইংরাজী লেখনী আঘাত করিলেন সেই আঘাতের মূল কথা সনাতনীদের সঙ্গে নবতনীদের দ্বন্দ্ব; পৌরুষবান ব্যক্তির জীবন অন্য যে মৌলিক কারণে পিষ্ট হইতেছে তাহা তাঁহার দৃষ্টির অগোচরেই রহিয়া গেল। অবশ্য ১৮৩১ খ্রীঃ এই চেতনা আশা করাও হয়ত ভুল। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বরের সমাচার দর্পণে কৃষ্ণমোহনের 'The Persecuted' নাটক সম্পর্কে লেখা হইয়াছে: "....গ্রন্থকর্তা বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোর স্থানে আমরা 'তাড়িত' নামক এক নাটকগ্রন্থ প্রাপ্ত হইলাম। ঐ গ্রন্থ তিনি অতি নৈপুণ্যরূপে রচনা করিয়াছেন। ইংরেজী ভাষা ঐ বাবুর দেশীয় ভাষা নহে অতএব ইহা বিবেচনা করিলে তাঁহার ঐ ভাষাতে লিখন অত্যুত্তম জ্ঞান হয় কিন্তু কলিকাতাস্থ লোকেরা এইক্ষণে যে প্রকার দলাদলে বিভক্ত আছেন তদ্দৃষ্টে ঐ পুস্তকের মর্ম প্রকাশ করা আমাদের সুকঠিন। তাহাতে লেখেন যে ব্রাহ্মণেরা আপন শিষ্যেরদিগকে ফাঁকি দিয়াও ঐ শিষ্যেরদের ভ্রান্ততাপ্রযুক্ত ধনোপার্জ্জনে প্রাণ-ধারণ করেন। অপর লেখেন যে হিন্দুরদের ভাগ্যবান লোকেরা ধর্মবিষয়ক বিধি পরিত্যাগ করিয়া লাম্পট্যাদিতে আসক্ত আছেন যদ্যপি ইঁহার এতদ্রূপ দোষ অর্পণ করা কঠিন বোধ হয় তথাপি তাহা যে অযথার্থ নহে ইহা কহিতে আমাদের সঙ্কোচ নাই। রাজধানীনিবাসি লোকেরদের আচার ব্যবহার সকল শিথিল হইয়া গিয়াছে। এবং যাঁহারা নাস্তিক বলিয়া সংপ্রতি হিন্দুধর্ম ত্যক্ত ব্যক্তিরদিগকে তিরস্কার করেন তাঁহারা যদি আপনারদের পরমমান্য ধর্মশাস্ত্রের দ্বারা বিচারিত হন তবে তাঁহারাই পরম দোষী হইতে পারেন।" [৯৮]

কাব্য

বিস্মিত হইতে হয় Derozioর ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের লেখা 'আমার স্বদেশের উদ্দেশে' কবিতা পাঠ করিয়া। রক্তে পুরা ভারতীয় না হইয়াও, জাতীয়তা-বোধ যে রক্ত-নিরপেক্ষ এবং স্বাদেশিকতা মানে যে দেশে জন্মিয়া মানুষ হইয়াছি তাহাকেই ভালোবাসা—ইহা তিনি জীবন দিয়া ত প্রমাণ করিলেনই—লেখাতেও তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি ভারতের ভগ্নদশা দেখিয়া

মর্মাহত হইয়াছেন। Derozio স্বভাবতই ইংরাজীতে লিখিয়াছেন কিন্তু তাঁহার প্রভাবের গভীরতা ভাবিয়া দেখিলে তাঁহার ইংরাজী লেখাকেও তৎকালীয় বাংলা সাহিত্যের একটী সাংগঠনিক ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। আজকের দিনের ইউরেশিয়ানদের ভারতের প্রতি মনোভাবের সঙ্গে Derozioর এই মনোভাবের আকাশপাতাল পার্থক্য। আমাদের আরও বিস্ময়ের কারণ এই যে কোনো বাঙালী বা রক্তে ভারতীয় কেহ এই চেতনায় দীপ্ত হইবার আগেই Derozio চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন ভারতের পতিতাবস্থা। ইহার তিন বৎসর পরে কাশীপ্রসাদ ঘোষ প্রথম দেশপ্রেমমূলক কবিতা ইংরাজীতে লেখেন। Derozioর To India—My Native Landএ ভারতের যে দুর্দশার কথা বলা হইয়াছে তাহার মধ্যে রাজনৈতিক পরাধীনতার কথা স্পষ্ট করিয়া না থাকিলেও পাঠকের বুঝিতে কষ্ট হয় না তিনি কিসের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছেন :

My country, in thy day of glory past
A beauteous halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast. ৯৮ক
Where is that glory, where that reverence now ?
Thy eagle pinion is chained down at last,
And grovelling in the lowly dust art thou :
Thy minstrel hath no wreath to weave for thee
Save the sad story of thy misery...............

(Fakeer of Jungheera কাব্যের উৎসর্গপত্র)

Derozio র বিভিন্ন কবিতায় এই স্বাদেশিকতার প্রকাশ হইতেই আমরা বুঝিতে পারি তাঁহার শিষ্যেরা দেশোন্নয়নের ঐ তীব্র বাসনা কোথা হইতে পাইতেন। আবার Freedom of the Slave কবিতায় ডাক দিয়া কবি বলিতেছেন :

Blest be the generous hand that breaks
The chain a tyrant gave,
And, feeling for degraded man,
Gives freedom to the slave.

ইহাই হইল সেই কণ্ঠস্বর যাহা মুক্তির প্রেরণা জাগায়। ইহার মধ্যেই কি ফরাসী বিপ্লবের সুর, Shelleyর Song to the Men of England এর সুর ধ্বনিত হইতেছে না? এই ছত্র কয়টির ভিতরে যেন Tom Paine,

Jefferson, Rousseau এবং Godwin এর মিলিত কণ্ঠস্বর শোনা যায়। আবার Derozioই, ইংরাজীতে হইলেও, বাংলার মাটিতে প্রথম romantic কাহিনী-কাব্য লেখেন Fakeer of Jungheera (অসম্পূর্ণ)। তিনিই প্রথম এদেশে, কবিতাতে হইলেও, কবি-কল্পনার প্রকৃতি সম্পর্কে রোমান্টিক মতবাদের প্রবর্তক ঃ

কবিতা (Poetry)

Sweet madness,—when the youthful brain seized
With that delicious phrenzy which it loves,
It roving reels, to very rapture pleased,—
And then through all creation wildly roves :
Now in the deep recesses of the sea,
And now to highest Himalaya it mounts ;
Now by the fragrant shores of Araby,
Or classic Greece, or sweet Italia's founts,
Or through her wilderness of ruins ;

ইহা যেন A Midsummer Night's Dream এ Shakespeare-এর কবি-বর্ণনা। মধুসূদনও এই রীতিতেই মধুচক্র তৈয়ারী করিয়াছিলেন।

ইহার পরেই নাম করিতে হয় কাশীপ্রসাদ ঘোষের। ইনিও কবিতায় ডিরোজিওর শিষ্য। তবে ইহার মধ্যে স্বদেশপ্রেম আরও বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ইংরাজীতে ইনি রাসলীলা এবং বাঙালীর অন্যান্য উৎসব লইয়া কবিতা লিখিয়াছেন, যেমন লিখিয়াছেন মধুসূদন চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে।

নব্যভাবের বাংলা কবিতার প্রথম আবির্ভাব লইয়া মতবিরোধ আছে। সুকুমার সেন মহাশয় ভারতচন্দ্রের জীবন-বেদ বা বিষয়বস্তুর মধ্যে এমন কিছু আধুনিকতা দেখিতে পান নাই [৯৯] কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, "তাঁহার আদর্শ ছিল ভারতচন্দ্র। এই হিসাবে ঈশ্বর গুপ্ত প্রাচীনপন্থী। নবীনত্ব দেখা দিল তাঁহার কবিতার বিষয়বস্তুতে। ব্যঙ্গরচনা ত ছিলই, কেন না ইহাতেই তাঁহার কবি-প্রকৃতির মুখ্য প্রকাশ। উপরন্তু নীতি-আদর্শ, দেশপ্রিয়তা, সমাজ-সেবা, ঈশ্বর ভক্তি ইত্যাদি নূতনতর বিষয়ে কবিতা লিখিয়া এবং ইংরেজী কবিতার অনুবাদ বা অনুকরণ করিয়া ইনি নূতন পন্থা নির্দেশ করিলেন।"[১০০] কিন্তু শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় ভারতচন্দ্রকে ত নব মানবতা-বাদের কবি বলিতেছেনই, ঈশ্বরগুপ্তকে এবং ভারত আর ঈশ্বরের মধ্যবর্তী কবিওয়ালা টপ্পাওয়ালাদেরও তিনি মানবতাবাদের কবি বলিতেছেন এবং

মধুসূদন প্রমুখ কবিদের পথনির্মাতা বলিয়া ইঁহাদেরই মনে করিতেছেন। শশীবাবু বলিতেছেন, "ভারতচন্দ্রের প্রধান কাব্যখানি 'অন্নদামঙ্গল।'....কিন্তু সকল অনুষ্ঠানকে ব্যর্থ করিয়া এই দেবী-মাহাত্ম্যকে পশ্চাতে ঠেলিয়া দিয়াছে যুগধর্ম, সেখানে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে মানুষ।...ভারতচন্দ্র যে শুধু বিদ্যাসুন্দরের স্থূলতম আদিরসের বাড়াবাড়ি দ্বারাই তাঁহার কাব্যকে মানবীয় সুর দান করিয়াছিলেন এমন কথা মনে করিলে ভারতচন্দ্রের উপর অবিচার করা হইবে। এখানে সেখানে টুকরা টুকরা হইয়া ছড়াইয়া আছে তাঁহার মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গী।.... 'দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান'....দেবীর নিকটে কোন মোক্ষমুক্তির বর নহে,—রাজ-ঐশ্বর্যের বর নহে,—খেয়াঘাটের পাটনীর শুধু প্রার্থনা—'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'! বুঝিতে পারিতেছি সাহিত্যে জীবনকে কত নিবিড় করিয়া পাইতে আরম্ভ করিয়াছি,—একটি সহজ সরল প্রার্থনায় খেয়াঘাটের পাটনীর মনের আকাঙ্ক্ষাটি কেমন মধুর হইয়া উঠিয়া কাব্যকে কাব্যত্ব দান করিতে আরম্ভ করিয়াছে।" কিন্তু একই সঙ্গে দাশগুপ্ত বলিতেছেন, "ভারতচন্দ্রের পূর্বে মুকুন্দরামের ভিতরেও আমরা পাই এই জাতীয় সুকুমার মানবীয় স্পর্শের সন্ধান।" তাহা হইলে কি ষোড়শ শতক হইতেই এই নব মানবতাবাদ আমাদের সাহিত্যে এবং জীবনে আসিতে শুরু করিয়াছে? আবার গোপাল হালদার মহাশয় তাঁহার বাংলা সাহিত্যের রূপরেখায় বলিতেছেন, "এ কথা পরিষ্কার, মধ্যযুগ তখন বিগতপ্রায়। অথচ ভারতচন্দ্রকে আধুনিক যুগের কবি বলাও অসম্ভব, মধ্যযুগের শেষ কবি বলাও দুঃসাধ্য। তাঁর মনের গড়নে আবেগবাহুল্য নেই—সেখানে বুদ্ধির প্রাখর্যই প্রবল, ধর্মবোধে তিনি ভারাক্রান্ত নন, দেবদেবীরা মানবমানবীর মতোই তাঁর নিকটে রসিকতার উপাদান; ঐহিকতা (secularity) তাঁর চিন্তার ও কাব্যের স্বাভাবিক গুণ, তিনি কালিকাকে দিয়ে সুন্দরকে ত্রাণ করান কিন্তু বিদ্যা ও সুন্দরের বিহারকে বৃন্দাবনী অপার্থিবতায় শোধন করিয়ে নেন না।....এই বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য, এই ঐহিকতাবাদ ও প্রণয়রচনায় বাস্তবতাবাদ —আধুনিক কালধর্ম।........তথাপি ভারতচন্দ্রের কবিতা একালের নয়—তা অষ্টাদশ শতকের ছাড়া আর কোনো কালের নয়। কৃত্রিম কালের তা কৃত্রিম সৃষ্টি;—তার মানুষও কৃত্রিম।"[১০২]

এদিকে ঈশ্বরগুপ্ত সম্পর্কে শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় বলিতেছেন, "ভারতচন্দ্রের পরে প্রায় এক শতাব্দী জুড়িয়া চলিয়াছে কবিওয়ালাদের যুগ। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে অসাবধানে-অবজ্ঞাত এই কবিওয়ালাদের যুগটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কারণ, ভারতচন্দ্রের ভিতরে আমরা দেখিতে পাইলাম যে নব-

যুগের সন্ধান, কবিওয়ালাদের সঙ্গীত ও কবিতাগুলির ভিতর দিয়া আমরা স্পষ্ট করিয়া পাই সেই যুগ-পরিবর্তনের পরিচয়।....কবি ঈশ্বরগুপ্তের ভিতরে আসিয়া দেখিতে পাইলাম, মানুষের সাহিত্যের বিষয়বস্তু মুখ্যতঃ মানুষ। মাঝামাঝি কবি হিসাবে ঈশ্বরগুপ্তের বৈশিষ্ট্য এইখানে যে নবযুগের মানুষ হইয়াও তিনি খাঁটি দেশীয় কবি, এবং খাঁটি দেশীয় ধারার তিনিই শেষ কবি।....পশ্চিমের আলোকপাতে তাঁহার ভাব বা ভাষার ভিতরে কোনও রঙ্ ধরে নাই।"[১০৩] নব মানবতাবাদের কবি হইয়া তিনি আবার দেশীয় ধারার শেষ কবি হন কি করিয়া? তাহা হইলে কি তিনি মানবতাবাদের দেশীয় রূপ প্রস্ফুট করিয়াছিলেন আর মধুসূদন (রঙ্গলালও) বিদেশীয়? নবযুগকে তিনি অঙ্গীকার করিলেন আবার ধারাটিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই বিশুষ্ক হইল। এখানে কি শশীবাবু Content এবং formএর (বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের পার্থক্যের) কথা বলিতেছেন? তিনি কি বলিতে চান যে, নূতন ভাবধারা ঈশ্বরগুপ্ত যে ভাষায় প্রকাশ করিতেছিলেন সেই ভাষা, ইংরাজীর সঙ্গে সম্পর্কবিহীন খাঁটি বাংলা ভাষা—তাহাতে তখন বিদেশীয় ছোঁয়া লাগে নাই? মধুসূদন বা তৎপরবর্তী কালের কবিদের ভাষা আর তেমন খাঁটি দেশী নহে—তাহাতে যেন সমুদ্র-পারের গন্ধ।

ভাষার প্রশ্নে আসিবার আগে এই নব মানবতাবাদের কথাটি আলোচনা করিয়া লওয়া যাক।

দাশগুপ্ত মহাশয় মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র এবং ঈশ্বরগুপ্তের মধ্যে একই প্রকারের জীবনমুখিতা ও ঐহিকতা লক্ষ্য করিয়াছেন—অবশ্য পরিমাণের তারতম্য আছে বই কি। আর এই নব মানবতাবাদ [মানবতাবাদ আর ঐহিকতা কিন্তু এক জিনিষ নহে। উল্লিখিত তিন কবির মধ্যে ঐহিকতার অস্তিত্ব নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু মানবতাবাদ আছে কিনা সন্দেহ। ইংরাজী secularism এবং humanism যে এক কথা নয় ইহা ত সর্বজনবিদিত। আবার ইহাও সত্য যে humanismএর কেন্দ্রে আছে secularity। পার্থক্য হইল এই যে নিছক secularity বা ঐহিকতা মানুষের মহৎ সম্ভাবনায়, মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বে বিশ্বাস নাও করিতে পারে; ঐহিকতা শুধুমাত্র আত্মপরতায় পর্যবসিত হইতে পারে। মানবতাবাদ মানুষের স্বরাট্-সাধনার তত্ত্ব আর ঐহিকতা হইল কেবল দুধে-ভাতে থাকিবার তত্ত্ব।] আবার মধুসূদন প্রমুখ শিল্পীদেরও জীবনবেদ। তাহা হইলে কবিকঙ্কণ হইতে মধুসূদন, এবং তাহার পরে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মানুষের ভাবলোকের কোনো মৌলিক পরিবর্তনই হয় নাই—এই কি দাশগুপ্ত মহাশয়ের বক্তব্য?

ইংরাজ কবি চসারের ক্যাণ্টারবেরি টেল্‌স্‌-এ ঐহিকতার কিছু অভাব নাই। তাঁহার সাহিত্যেই প্রথম মানুষের সাক্ষাৎ পাই চতুর্দশ শতকে। আবার ঐহিকতায় পোপও কিছু কম যান না। উনবিংশ শতকের প্রথম তৃতীয়কে যে রোমাণ্টিক কাব্য জন্মাইল তাহার মধ্যেও প্রধান সুর ঐহিকতার। কিন্তু আমরা যে অর্থে রোমাণ্টিক কাব্যের ঐহিকতার কথা বলি সেই অর্থে চসারের কিংবা পোপের কাব্যের ঐহিকতার কথা বলি না। Jane Austen আর Dickensএর ঐহিকতার প্রকৃতি নিশ্চয়ই এক নয়। কেহ কেহ Chaucerএর humanismএর কথা বলেন। কিন্তু কখনই তাঁহারা চতুর্দশ-শতকের ঐহিকতা-সর্বস্ব humanism আর রোমাণ্টিক যুগের মানুষ-সর্বস্ব humanismকে এক করিয়া দেখেন না। Chaucerএ মানুষ প্রধান নয় এই অর্থে যে মানুষকেই তিনি চরম ও পরম বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। Shelley বা Keats বা Heine তাহাই করিয়াছিলেন। চসার কখনও বলিতে পারিতেন না, পোপও নয়: A thing of beauty is a joy for ever

কিংবা

The desire of the moth for the star
of the night for the morrow
The devotion to something afar
Beyond the sphere of our sorrow.

অতএব কবিকঙ্কণ বা ভারতচন্দ্রের ঐহিকতাকে আধুনিকতার লক্ষণ বলিয়া ধরিলে চলিবে না। আর কৃষ্ণচন্দ্রের সভার কৃত্রিম ভাববিলাসে লালিত ভারতচন্দ্রের ত নয়ই। তাহা হইলে ত ইংলণ্ডের Restoration যুগের অশ্লীল (কিন্তু ঐহিকতায় পরিপূর্ণ—ঠিক ভারতচন্দ্রের মত) সাহিত্যকে আধুনিকতার চূড়ান্ত বলিতে হয়। কোনো ইংরাজ-সমালোচক তাহা বলেন নাই যদিও সাহিত্য-বিচারের ক্ষেত্রে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনে যুক্তিবাদ স্বপ্রতিষ্ঠ হইবার সম্ভাবনা ঘটায় Dryden হইতেই কোনো কোনো সমালোচক আধুনিক যুগের আরম্ভ বলিয়া গণ্য করিলেও বেশীর ভাগের মতেই নূতন যুগের আরম্ভ Renaissance হইতে এবং Restoration যুগের রাজসভা-সাহিত্যকে সকলে কৃত্রিম আখ্যাই দিয়াছেন। [অনেকে ইংলণ্ডের Renaissanceকে প্রথম Romantic যুগ ও Industrial Revolution এর সমকালীন নব-জাগরণের দ্বিতীয় পর্যায়কে দ্বিতীয় Romantic যুগ বলেন।

Renaissance যুগের দীপ্ত প্রবর্তনা যখন শুকাইয়া আসিল তখনই সুরু হইল Restoration যুগের।]

ঈশ্বরগুপ্ত সম্পর্কে দাশগুপ্ত মহাশয় কেন, অনেকেই খাঁটি বাংলার কথা তুলিয়াছেন। তিনিই না কি খাঁটি বাংলাভাষার শেষ কবি। আচার্য কৃষ্ণকমল বলিয়াছেন খাঁটি বাংলাভাষার শেষ কবি দাশু রায়। এই খাঁটি বাংলা কি? বাংলা ভাষাতত্ত্ব বলে না যে ভারতচন্দ্র কি ঈশ্বরগুপ্ত মহাশয়ের যুগে বাংলাভাষা খাঁটি ছিল। ফার্সী হইতে আরম্ভ করিয়া পোর্তুগীজ পর্যন্ত সব রকম মিশোলই তাহাতে তখন প্রচুর হইয়া গিয়াছে। পরবর্তীকালে সামান্য কিছু ইংরাজী মিশিয়াছে। অতএব খাঁটি বাংলা বা দেশীয় ধারা বলিতে ইঁহারা নিশ্চয়ই ঐ অর্থে খাঁটি বলেন নাই। মনে হইতেছে ইঁহারা খাঁটি বলিতে ভাষার শব্দ-প্রয়োগের বিশেষ ধরনের কথা বলিতেছেন—বাঙালা ধরণ। বাংলাভাষায় পদবিন্যাসের মূল রীতি সেই দোঁহার যুগ হইতে আজও চলিয়া আসিতেছে। যখন হইতে বাংলাভাষার সৃষ্টি হইয়াছে তখন হইতেই বাক্যে এই পদবিন্যাস-রীতি বাংলাভাষার মূল লক্ষণ। সেই বিন্যাসের রীতি মধুও যেমন মানিয়া চলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি। বাংলা বুলি এবং প্রবচন সকল সার্থক শিল্পাই প্রায় সমভাবেই ব্যবহার করিয়াছেন। পার্থক্যের মধ্যে এই দেখি যে ভারতচন্দ্র সংস্কৃত ও ফার্সী হইতে প্রায় সম সংখ্যাতেই শব্দ-চয়ন করিয়াছেন, মধু এবং মধূত্তর সাহিত্যিকেরা বেশী ধার করিয়াছেন সংস্কৃত হইতে। কিন্তু সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক নিশ্চয়ই ফার্সীর চেয়ে বেশী। অতএব সংস্কৃত হইতে ধার করিলে বাংলার খাঁটি রূপ ঘোচে না, যদি ইতিমধ্যেই ফার্সী হইতে ধারের ফলে ঘুচিয়া না থাকে। ঈশ্বরগুপ্ত ফার্সী শব্দ কম ব্যবহার করিয়াছেন। ব্যঙ্গ কবিতায় ইংরাজীর বিকৃতি ব্যবহার করিয়াছেন। দেশী শব্দের প্রয়োগে ঈশ্বরগুপ্ত ভারতচন্দ্র অপেক্ষা অনেক অমার্জিত, এবং অনেক ক্ষেত্রে অতি গ্রাম্য বা অতি-নাগরিক (cockney)। সেই অতি-গ্রাম্যতা বা অতি-নাগরিকতা নিশ্চয়ই খাঁটি বাংলার গৌরব পাইতে পারে না। তবে অনেক ক্ষেত্রে সরল মনোভাবের যে সরল প্রকাশ আছে তাহাই হয়ত অনেককে মুগ্ধ করিয়াছে। কিন্তু এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে সেখানে ভাবটি সরল বা সেকালের অনাড়ম্বর জীবনধারা-প্রসূত বলিয়াই ভাষার ঐ সারল্য। ভাবলোকে যে জটিলতা, যে সূক্ষ্মতা, যে চিক্কণতা নবভাবে আলোকিত শিক্ষিত বাঙালীর জীবনে আসিল গুপ্ত মহাশয় তাহার সন্ধান রাখিতেন না। বিদেশের ঠাকুরকে রাখিয়া ঘরের কুকুরকে অভ্যর্থনা জানাইবার কথাটি যেমন সহজে গুপ্ত মহাশয় বলিতে পারিয়াছেন তত সহজে কি ঐ কথা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে

বলা সম্ভব? কিন্তু তাই বলিয়া কি বলিব রবীন্দ্রনাথের বাংলা খাঁটি বাংলা নয়? গুপ্ত কবি সংসার-যাঁতার কথা বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন: 'শুধু প্রাণধারণের শুধু দিন যাপনের গ্লানি'র কথা।

দুইজনের ভাবে কিছু সাদৃশ্য আছে কিন্তু তবু কত পার্থক্য। আবার এই পার্থক্য আছে বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ আধুনিক। এই পার্থক্য নিশ্চয়ই কোন ভাষাগত নয়। নারীর সৌন্দর্য্য-বর্ণনা ভারতচন্দ্রও করিয়াছেন। কিন্তু ঐ দু'জন আর রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পার্থক্য কি মৌলিক এবং ভাবগত নয়? পূর্বোক্ত দুই জনের কাছে নারী শুধু দেহ আর শেষের জনের কাছে নারী পরিপূর্ণ ব্যক্তি। এই দৃষ্টিকোণের বিভিন্নতাই কবিতার ভাষায় বিভিন্নতার কারণ।

ঈশ্বরগুপ্ত যে ধারার কবি সেই প্রাচীন ধারার সঙ্গে আধুনিক ধারার পার্থক্য মৌলিক—তাই ঈশ্বরগুপ্তের ধরণের সঙ্গে, ভাষার সঙ্গে, মধুসূদনের, এবং পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের ভাষার এত ভিন্নত্ব। ইহা খাঁটি আর অখাঁটি বাংলার পার্থক্য—এ কথা বলিলে মূল সত্যটি প্রচ্ছন্নই থাকে।

তাহা হইলে ঈশ্বরগুপ্তের তথাকথিত স্বাদেশিকতার ব্যাখ্যা কি?

আমাদের মনে হয় যে ঈশ্বরগুপ্তের স্বাদেশিকতা (অর্থাৎ স্বদেশের কুকুরটিকেও ভালো বলা) নূতনকে গ্রহণ না করিবার আগ্রহ হইতেই উদ্ভূত। তাই নূতনের মধ্যে তিনি শুধু মদ খাওয়া, খানা খাওয়া আর বিবির নাচ দেখিয়াছেন আর মেয়েদের স্কুলে যাইতে দেখিয়া রাগিয়া আগুন হইয়াছেন। এই পুরাতনকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই তিনি প্রাচীন কবিদের জীবনী সংগ্রহ করিয়াছেন (অবশ্য ইহাতে আমাদের উপকার হইয়াছে)। এই স্বাদেশিকতাকে তাই প্রগতিশীল স্বাদেশিকতা বলিতে পারি না। এ স্বাদেশিকতা কেবল পিছন দিকে মুখ ফিরাইতে বলে। অথচ সিপাহী-বিদ্রোহের বেলায় তিনি কিন্তু ঝান্সীর রাণীকে কটু-কাটব্য করিতে ও ক্যানিং-এর স্তুতি করিতে দ্বিধা করেন না। এক-হাত-ওয়ালা লর্ড হার্ডিঞ্জের স্তুতি করেন শিখদের তিনি হারাইয়াছেন বলিয়া। দেশে শান্তিস্থাপন করার জন্য এবং মধ্যবিত্তের জীবনকে নিরাপদ করার জন্য তিনি ইংরাজের কাছে কৃতজ্ঞ। এ যেন নিতান্ত স্বার্থপরের কৃতজ্ঞতা। মিউটিনির প্রতিকূলতা করেন নাই এমন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সেকালে প্রায় ছিলেন না বলিলেই চলে কিন্তু তাঁহারা প্রগতির পথে স্বদেশের উন্নতি চাহিয়াছিলেন। ঈশ্বরগুপ্ত তাহা চাহেন নাই। তাঁহার কলিকাতার 'রেতে মশা দিনে মাছি'ও ভালো লাগে। ইঁহার সঙ্গে তুলনায় দাশু রায় মহাশয়ের মধ্যে যুগোপযোগী প্রগতিশীলতা সত্যই ছিল: বিধবাবিবাহের গানই তাহার প্রমাণ।

আমরা সেইজন্য সেকালের কাব্যে আধুনিকতার সুর খুঁজিতে গিয়া প্রথম বিস্মিত হই কবিওয়ালাদের এবং টপ্পাওয়ালাদের রচনায়। নিধুবাবুর 'নানা দেশের নানান ভাষা' ত আছেই। এই স্পষ্ট স্বাদেশিকতার অপেক্ষাও নিশ্চিততর নিদর্শন হইল এই কবি বা রচকদের প্রেমের প্রতি নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে: ভালোবাসিবে বল্যে ভালোবাসি নে

অথবা

যারে তারে মন দিতে বলে গো (নয়ন আমার)
নিবারণ করি যদি অগ্নি ভাসে জলে গো।
মন নয় মনেরি মত
নয়নেরি অনুগত
বুঝায়্যে রাখিব কত নানা পথে চলে গো॥

ইহা কি মনে করাইয়া দেয় না রবীন্দ্রনাথের ঠিক বিপরীত সমস্যামূলক কবিতাটি:

তবে পরাণে ভালোবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে?

মনের মিল এবং একনিষ্ঠতাই যে সার্থক প্রেমের ভিত্তি-স্বরূপ নিধুবাবুর এই চেতনা একান্তভাবে আধুনিক অথচ ভারতচন্দ্রের নায়ক শুধু দেহোপভোগেই বিদগ্ধ এবং সেই উপভোগ-বাসনাই তাহার প্রেমের আদ্যন্ত। কারণ সে নায়ক নায়িকার ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস করে না। তার প্রেম দেহসর্বস্ব।

[এইখানে ময়মনসিংহ-গীতিকার কথা তুলিলাম না কারণ সেখানে যাহাদের কাহিনী ব্যক্ত হইয়াছে তাহারা দরিদ্র এবং অন্তেবাসী বলিয়া, সমাজের উপরিতলের লোকের জীবনের কৃত্রিমতা ও ভণ্ডামি তাহাদের পাইয়া বসে নাই। তাহাদের জীবন তখনও ১৬শ-১৭শ শতাব্দীতে অনেকখানি সরল ও সহজ, প্রকৃতিচালিত। কুলীনপ্রথা সে সমাজে নারীকে পঙ্গু করে নাই আর অর্থনৈতিক জীবনে, সে সমাজে, নারীর দান পুরুষের প্রায় সমান। তাই ময়মনসিংহ-গীতিকায় আছে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম, জাতি-মৈত্রী, সরল হৃদয়াবেগ। কিন্তু এই স্বতঃস্ফূর্ততা আর আমরা যে নবযুগের চেতনার কথা বলিতেছি তাহা এক নয়। এই স্বতঃস্ফূর্ত সারল্য ত অনেক অতি-প্রাচীন ছড়া (ballad)তেও আছে।]

ইঁহাদের পরে বা সমকালে এবং মধুসূদনের আগে নাম করিবার মত কাব্য রচনা করিলেন ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানি পদ্মিনী-

উপাখ্যান। ইনি ছাড়া দ্বারকানাথ রায় প্রমুখেরা যাহা লিখিয়াছেন তাহা শুধুই প্রাচীন বিষয়গুলির পুনরাবৃত্তি। প্রবন্ধকার, উপন্যাস-লেখক, অনুবাদক, এমন কি বিজ্ঞান বিষয়ে যাঁহারা এ যুগে লিখিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যেও বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, রাজেন্দ্রলাল, প্যারীচাঁদের মত প্রতিভার উদ্ভব হইয়াছিল কিন্তু প্রথম শ্রেণীর কবি মধুসূদনের আগে কেহ জন্মান নাই এবং কেহই যুগমানসের পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি দিতে পারেন নাই। মধুসূদনের পূর্ববর্তী কোনো মৌলিক কাব্য, তাই, আমাদের বিচারে প্রায় নাই বলিলেই চলে।

(রঙ্গলালের পদ্মিনী-উপাখ্যানে "শিক্ষিত বাঙ্গালী আপনার চিত্তের এক গূঢ় অনুভূতিকে মূর্ত দেখিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিল। পদ্মিনী-উপাখ্যানের (এবং রঙ্গলালের পরবর্তী কাব্যগুলির) আত্যন্তিক মূল্য বেশী নয়। কিন্তু তাহা দ্বারা 'নিশীথিনীর মৌন যবনিকা' অপসারণের প্রথম সঙ্কেত ধ্বনিত হইয়াছিল বলিয়া আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট মূল্য আছে। কাব্য রঙ্গভূমিতে মধুসূদন প্রবেশ করিবার পূর্বে রঙ্গলাল প্রস্তাবনা গাহিয়া গিয়াছিলেন।"[১০৪] রঙ্গলাল কাব্যের বিষয়বস্তু লইয়া-ছিলেন Toddএর গ্রন্থ হইতে। কিন্তু এই নির্বাচনের প্রবর্তনা আসিয়াছিল দেশপ্রেম হইতে। এই দেশপ্রেম অবশ্য শিক্ষিত বাঙালীকে ইংরাজ-বিতাড়নে উদ্বুদ্ধ করে নাই; তাহা করিতে পারে না। কারণ ইংরাজই তখনও বাঙালীর কাছে নবযুগের বর্তিকাবাহক; কারণ এই মধ্যবিত্ত ইংরাজেরই সৃষ্টি এবং এই ইংরাজই ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষে প্রথম আইন শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া মধ্য-বিত্তের স্ফুরণের পথ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু তবু অসন্তোষ যে মনে মনে ছিল তাহা আমরা আগে প্রমাণ করিয়াছি এবং শুধু অসন্তোষই নহে, ইহা যে তীব্র মোহভঙ্গের রূপও কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রহণ করিতেছিল তাহাও আমরা অনুধাবন করিয়া দেখিয়াছি। এই অবস্থায় যখন সিপাহী-বিদ্রোহ ঘটিল তখন মধ্যবিত্তের চেতনায় কি পরিবর্তন আসিল তাহা শিবনাথ শাস্ত্রী বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং কালীপ্রসন্ন হুতোম প্যাঁচার নক্সায় বাঙালীর ভীরুতা ও নকলনবিশিকে ব্যঙ্গ করিয়া পরোক্ষে বিদ্রোহের নীতিকে যেন সমর্থনই করিয়াছেন। এই পটভূমিকায় পদ্মিনী-উপাখ্যানকে দেখিলেই বুঝা যাইবে পদ্মিনীহরণের অর্থ কি এবং যবন আসলে কে। রঙ্গলালের যুগেও শিক্ষিত বাঙালীর মনে সাম্প্রদায়িকতা যে প্রবল ছিল তাহা আমরা আগে দেখিয়াছি। তাই যবনকে কাব্যে দেখি নাশকের রূপে। কিন্তু ইতিমধ্যে যে যবনের স্থান আর একজন দখল করিয়াছে তাহা বুঝিতে কি বাঙালীর বাকী থাকিতে পারে?

"স্বাধীনতা হীনতায়" তাই ১৮৬৭ সালে হিন্দু-মেলায় গীত হইয়াছিল। তখনও কিন্তু মেলাটি 'হিন্দু'।

যাহা হউক, 'রঙ্গলালের কাব্যের ভাবে নূতনত্বের সঞ্চার হইলেও ভাষা ও রূপ ছিল পুরাতন।"[১০৫] যেখানে আধার সম্পূর্ণ পুরাতন সেখানে নূতন আধেয় স্বরূপে প্রকট হইতে পারে না। তাহার পায়ের বেড়ি তাহার গতিকে পদে পদে ব্যাহত করে। পয়ারে নিসর্গ-বর্ণনা প্রতি দুই ছত্র অন্তর, এমন কি ছত্রে ছত্রে থামিয়া যায়; প্রাচীন গতানুগতিক অলঙ্কারগুলি অলঙ্কার বলিয়াই মনে হয় না। অবশ্য নিসর্গ-বর্ণনা প্রকৃতির সম্পর্কে নূতন দৃষ্টি-কোণের সূচনা করে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। সেকালের পাঠক কিছু মগ্ন হইলেও আমরা আর হই না। রঙ্গলাল বায়রনের ভক্ত হইলেও পোপের যে তিনি আরও বড় ভক্ত তাহা তাঁহার কবিতার প্রতি পংক্তিতে পরিস্ফুট। তবে পোপের মার্জনা (polish), নিপুণ ব্যঙ্গ ও শ্লেষ তাঁহার নাই। কারণ পোপ প্রধানত ব্যঙ্গের কবি, রঙ্গলাল আখ্যায়িকার। কিন্তু যে বৈদগ্ধ্য থাকিলে, অর্থাৎ যুগোপযোগী বৈদগ্ধ্য ও কর্ষণা থাকিলে তিনি ঐ আখ্যায়িকাকে প্রাণবন্ত করিতে পারিতেন এবং এ যুগেও তাঁহার কাব্য বাঁচিয়া থাকিত তাহা তাঁহার ছিল না। তিনি 'স্বাধীনতা-হীনতা'র কথা বলিয়াছেন কিন্তু সেই স্বাধীনতা-হীনতায় জীবনধারণের গ্লানি এবং পৌরুষের পরাজয় যে কতখানি ঘটিতেছে তাহার কোনো বোধ তাঁহার নাই। সে বোধের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে মধুসূদনের মেঘনাদবধ পর্যন্ত।

গ

এই দীর্ঘ বিশ্লেষণ হইতে যুগমানসের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি আত্মপ্রকাশ করিল:—

(১) রক্ষণশীলতার সঙ্গে প্রগতিশীলতার দ্বন্দ্ব

(২) প্রবল সমাজ-সংস্কার বাসনা

(৩) বাংলা ভাষার নবরূপ পরিগ্রহ—ভাষার গণতন্ত্রীকরণ

(৪) তীব্র ব্যক্তি-স্বাধীনতাবাদ

(৫) নারীর প্রতি নূতন দৃষ্টিভঙ্গী—নারীর ব্যক্তিসত্তার ক্রমবর্ধমান স্বীকৃতি—বিচিত্ররূপিণী নারীর (typical Renaissance woman—Cleopatra) ভাবকল্পনা; কোনো একটি চরিত্রে এই নূতন নারীকে অবশ্য পাওয়া যাইবে না। কিন্তু মৌলিক ও অনুবাদ সাহিত্যের সার্থক নিদর্শনগুলির যোগফলে ইহাকে পাওয়া যাইবে; কাদম্বরী, সীতার বনবাস, শকুন্তলা ও বিক্রমোর্বশী; শেক্স-

পীয়রের Romeo & Juliet এবং Merchant of Venice; নীলমণি বসাকের 'নবনারী', নবীনকালী দেবীর 'কামিনী-কলঙ্ক', 'কীর্তি-বিলাস' নাটক ও উমেশমিত্রের 'বিধবা-বিবাহ নাটক' (সুলোচনা চরিত্র বিশেষ করিয়া); বৈষ্ণব পদাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া কবিওয়ালা টপ্পাওয়ালাদের গানে প্রেমের নূতন ধারণার ক্রমবির্বতন; বিধবা-বিবাহ, বহুবিবাহ ও সতীদাহ-সম্পর্কিত আন্দোলনের ফলে সম্পূর্ণ অবজ্ঞার পাত্র হইতে শ্রদ্ধার পাত্রে নারীর উন্নয়ন; শেষে ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর চমকপ্রদ কীর্তি এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রঙ্গলালের 'পদ্মিনী-উপাখ্যান'—এই সব কিছু মিলাইয়া পুরুষের কল্পনায় এবং বাসনায় নারীর নবরূপের সৃষ্টি; ইহারই প্রথম পরিপূর্ণ প্রকাশ মধুসূদনের প্রমীলা ভাব-কল্পনায়, পরে বীরাঙ্গনায় এবং শেষে ইহার অপূর্ব স্ফূর্তি রবীন্দ্রনাথে: সুরেন্দ্রনাথ 'মহিলা' কাব্যে হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিয়াছেন:

'মহীয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার।'

(৬) তীক্ষ্ণ যুক্তিবাদ—ইহারই পরিণতি বিদ্যাসাগরের 'নাস্তিকতা';[১০৬] এবং Derozian তারাচাঁদ চক্রবর্তীর ব্রাহ্মদের এবং খ্রীষ্টিয়ানদের একই সঙ্গে সমালোচনা। Derozian দের মধ্যে কেহ কেহ খ্রীষ্টিয়ান হইয়াছিলেন, কেহ পরে ধর্ম এমন কি ভূতপ্রেতেও বিশ্বাস করিতে শুরু করিয়াছিলেন। কিন্তু এই যুক্তিবাদিতাই হইল সে-কালের মানসোৎকর্ষের এবং নবযুগের চেতনার মূলীভূত সম্পদ।

(৭) নব মানবতাবাদ। ইউরোপে রেনেসাঁর আগে যে humanism তাহার পথ প্রস্তুত করিয়াছিল সে সম্পর্কে আমেরিকান দার্শনিক Howard Selsam বলিতেছেন: As a social movement humanism exerted an influence toward the freeing of mankind from the fetters of the medieval ecclesiastical world view in the name of the rights and values of human personality. Humanism was an ideology of a comparatively narrow circle of educated people............In Italy the leading humanists of the fourteenth century were great poets and scholars like Petrarch and Boccaccio, and in the fifteenth century, figures like Pico della Mirandolla. Italian humanism in its matnre phase aspired to free morality from the asectic standards of the existing

conception of christianity, fought for the right of the healthy exercise of the physical senses and emotions, unmasked the hypocrisy of monasticism.....Some of the humanists, like Erasmus of Rotterdam (sixteenth century) limited themselves to ridiculing obscurantism, parasitism, and ignorance attacking monks and priests. Others, such as the English humanist Thomas More, author of *utopia,* put forward projects for the reconstruction of society based on the principle of equality of labour."[১০৭] এই মানবতাবাদই রামমোহন এবং তাঁহার উত্তরসাধক বিদ্যাসাগরের জীবনের মূলমন্ত্র। ইহা মানুষকেই জগৎ-ব্যাপারের নায়ক [স্রষ্টা বা ঐ জাতীয় কিছুকে নহে] বা প্রধান বলিয়া মনে করে এবং সর্বপ্রকারে সেই মানুষের কল্যাণবিধানে নিযুক্ত হয়। পরকালে ইহার কোন আস্থা নাই; ইহকালই ইহার কাছে সব; কিন্তু এই ঐহিকতা আত্মপরতার নামান্তর নয় এই জন্য যে, মানবতাবাদী ব্যক্তিকে সমষ্টির অঙ্গ বলিয়া মনে করে, সমষ্টির আনুকূল্য ভিন্ন ব্যক্তির জীবনে সার্থকতা আনা, তাহার মতে, কিছুতেই সম্ভব নহে।

কিন্তু এই মানবতাবাদ যে দৃষ্টিভঙ্গী হইতে জন্মায় তাহা অন্তত উনবিংশ শতকের মধ্যপাদে বাংলাদেশে সহজলভ্য ছিল না। শুধু উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীই এই উচ্চ দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করিতে পারিয়াছিল; তাহাও আবার সকলে সমভাবে নয়। টাকা উপার্জন, যে যুগে, সাধারণভাবে, জীবনের পরম কাম্য হইয়া উঠিয়াছিল (এবং যাহা এখন পরমতম কাম্য হইয়া উঠায় সেই উনিশ শতকী মানবতাবাদ আজ লুপ্তপ্রভাব) সে যুগে বিদ্যাসাগরের মত অতি-অগ্রগামীদের জীবনে দুঃখ অনিবার্য। ইহার দুইটি কারণ :—

(এক) রক্ষণশীলতার প্রকোপ এবং অসাধুদের তাঁহার সাধুতার সুযোগ গ্রহণ। সে যুগের জীবনযাত্রার কুৎসিত দিকটির শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় নিম্নলিখিত বর্ণনা করিয়াছেন : "তখন মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, উৎকোচ, জাল, জুয়াচুরী প্রভৃতির দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া ধনী হওয়া কিছুই লজ্জার বিষয় ছিল না। বরং কোনও সুহৃদ্‌গোষ্ঠীতে পাঁচজন লোক একত্র বসিলে এরূপ ব্যক্তিদিগের কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা হইত।...ধনী গৃহস্থগণ প্রকাশ্যভাবে বার-বিলাসিনীদিগের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিতে লজ্জা বোধ করিতেন না।.... এমন কি বিদেশিনী ও যবনী কুলটাদিগের সহিত সংস্পৃষ্ট হওয়া দেশীয় সমাজে

প্রাধান্য লাভের একটা প্রধান উপায় স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল।....এই সময়ে ও ইহার কিঞ্চিৎ পরে সহরে গাঁজা খাওয়াটা এত প্রবল হইয়াছিল যে সহরের স্থানে স্থানে এক একটা বড় গাঁজার আড্ডা হইয়াছিল। বৌবাজারের দলকে পক্ষীর দল বলিত।....(অশ্লীল পাঁচালী শোনা), বুলবুলির লড়াই দেখা ও ঘুড়ী উড়ান সে সময়ে সহরের ভদ্রলোকদিগের একটা মহা আনন্দের বিষয় ছিল।....অন্নের বিচারই ধর্মের কাষ্ঠাভাব ছিল; অন্নশুদ্ধির উপরেই বিশেষরূপে চিত্তশুদ্ধি নির্ভর করিত।....কলিকাতার বিষয়ী ব্রাহ্মণেরা ইংরাজদিগের অধীনে বিষয় কর্ম করিয়া স্বদেশীয়দিগের নিকট ব্রাহ্মণজাতির গৌরব ও আধিপত্য রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। তাঁহারা কার্য্যালয় হইতে অপরাহ্ণে ফিরিয়া আসিয়া অবগাহন স্নান করিয়া ম্লেচ্ছ সংস্পর্শজনিত দোষ হইতে মুক্ত হইতেন এবং সন্ধ্যা-পূজাদি শেষ করিয়া দিবসের অষ্টম ভাগে আহার করিতেন।"[১০৮] এই বহিরঙ্গপ্রধান জীবন যাহারা যাপন করে তাহারা বিদ্যাসাগরকে যে ঠকাইবে, তাঁহার সমস্ত প্রচেষ্টা যে পণ্ড করিবে এবং তাঁহাকে ব্যর্থতার বোঝা বহাইয়া কর্মাটারে পাঠাইবে, সরল সাঁওতালীদের মধ্যে সরল সততার খোঁজে—ইহাতে আর আশ্চর্য কি? আচার্য কৃষ্ণকমল 'পুরাতন প্রসঙ্গে' বলিয়াছেন, "শেষাশেষি বিদ্যাসাগর কতকটা misanthrope (বা নরজাতিবিদ্বেষী) হইয়াছিলেন। বিস্তর লোকের ব্যবহার তাঁহার প্রতি এরূপ কদর্য হইয়াছিল যে অনেক সহ্য করিয়া শেষটা তিনি অসংযত-বাক্ হইয়া পড়িয়াছিলেন।....এইরূপ মনের ভাব লইয়া তিনি শেষাশেষি সভ্যজাতি ও সভ্যতাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ অসভ্য জাতিদিগের সরলতা ও অকপটতার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা দিন দিন বাড়িতে লাগিল।"[১০৯] বিদ্যাসাগরের এই মোহভঙ্গই জাতীয় জীবনের বৃহত্তর ট্র্যাজিডির ইঙ্গিত।

(দুই) বিদ্যাসাগরের ব্যর্থতার এবং আস্থাক্ষয়ের যে কারণ উপরে নির্দেশ করা গেল তাহা অপেক্ষাও গূঢ়তর কারণ হইতেছে তাঁহার জীবনের শিক্ষাবিস্তারের মহৎ কার্যক্রমে অনপনেয় সরকারী বাধা এবং পরে বহু-বিবাহ ও বাল্যবিবাহের আন্দোলনের ব্যাপারে সরকারের চরম ঔদাসীন্য। সিপাহী বিদ্রোহের পরে সরকার আর ক্ষীণতম সমাজ কল্যাণমূলক কাজে হাত দিতে রাজী হইলেন না। আচার্য কৃষ্ণকমলের মতে, "মহারাণী ভিক্টোরিয়ার গভর্ণমেণ্ট যখন আরব্ধ হইল তখন হইতে লোকের মন রাজনীতির দিকে ঝুঁকিল।"[১১০] ব্যক্তির প্রয়াসের ব্যর্থতা, ব্যক্তির পৌরুষের পরাজয়—যাহা বিদ্যাসাগর, মধুসূদনের মত স্পর্শকাতর মনকে উদ্বেলিত করিতেছিল তাহাই

রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করিল। ইহারই স্পষ্ট ফল 'নীল দর্পণ'। এই পরাজয়ের চেতনাই বিদ্যাসাগরকে শেষ দিকে নিষ্পেষণ করিতেছিল। এই চেতনার ব্যাপকতা আমরা আগে সমাচার দর্পণ ও হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার ছত্রে লক্ষ্য করিয়াছি। কবি বিহারীলালের তৎকাল-প্রকাশিত পূর্ণিমা পত্রিকাতে ইহার প্রকাশ আরও তিক্ত ও রূঢ়; "সত্য বটে অধুনা এদেশে বিদ্যালয়ের অভাব নাই, পাঠার্থীরও সংখ্যা অল্প নহে, কিন্তু বিদ্যালয়ের মতন বিদ্যালয় কয়টা আছে এবং ছাত্রগণের মধ্যে কয়জনই বা মানুষের মতন হইয়া বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইয়া থাকে? মানুষ প্রকৃত বিদ্বান হইলে **কখনও পরাধীন হইয়া আত্মাকে** দূষিত করিতে চাহেন না, কিন্তু এদেশের অসংখ্য অসংখ্য ছাত্র বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইয়া কি নিমিত্তে **দাসত্বের শরণ লইয়া মনুষ্যত্ব নষ্ট** করে?"[১১]

এই চেতনার তীক্ষ্ণতর প্রকাশ: "যাঁহারা বহুতর জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া অন্তঃকরণে অনেক সার সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারাও মাতৃভাষায় এক পংক্তি রচনা করিতে সক্ষম হইতেছেন না, স্বজাতীয় ভাষায় প্রায় কাহারও যত্ন নাই, লোকে বাঙ্গালি হইয়া বাঙ্গালিকে ঘৃণা করিয়া সাহেবের লাঙ্গুল ধরিয়া বেড়াইতেছে এবং সেই কারণে খোষামুদে জাতি বলিয়া বিদেশীয়েরা বাঙ্গালি জাতিকে পশুবৎ অশ্রদ্ধা করিতেছে।....যুবকদিগের আড়ম্বরে এক্ষণে সময়ে সময়ে যে সকল সভা সংস্থাপিত হইতেছে তাহাও জলবিম্ববৎ ক্ষণমাত্রে বিলীন হইয়া যাইতেছে।"[১২]

বাংলা ভাষায় মহৎ রচনার অভাব শিক্ষিত বাঙালীকে কি পরিমাণ পীড়া দিতেছে তাহাও এই সম্পাদকীয়তেই স্পষ্ট: "স্বজাতীয় ভাষার উন্নতিসাধনে পরাঙ্মুখ থাকিয়া যাহারা কেবল ইংরাজীভাষায় রচনা করিয়া খ্যাতিলাভের আশা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের আশা দুরাশামাত্র এবং সমস্ত শ্রম পণ্ড শ্রমমাত্র।' **ইহার পরে নিশ্চয়ই মধুসূদনের প্রতি বীটনের বাণীর অতিশয়িত প্রভাবের কথা আর কেহ বলিবেন না।**

বিহারীলাল শেষ পর্যন্ত আর সহ্য করিতে না পারিয়া, গায়ের জ্বালায় বলিয়া উঠিতেছেন, "কে বলে ইহারা লোভী? মাসিক দশ টাকার জন্য চিরজীবন দাসত্ব করিতে নিপুণ, এমন কি আর কোন জাতি আছে?"

যুগমানসে অন্তর্লীন এই চেতনা হইল মূলীভূত ব্যর্থতার চেতনা। ইহারই কাব্যিক প্রকাশ রাবণ, মেঘনাদ, সীতা ও প্রমীলা।

(৮) এক নূতন রসবোধের আবির্ভাব ঘটিল এই যুগে। তথাকথিত আট, নয়, কি দশটি রস এবং তাহাদের উদ্দীপনের জন্য শাস্ত্রানুমোদিত

ভাব, অনুভাব এবং অলঙ্কারাদির প্রয়োগে যে শাস্ত্রানুগ সাহিত্যের অনুশীলন চলিত সেই ধরাবাঁধা কৃত্রিম জগৎ হইতে সাহিত্য এই সময়ে নিষ্ক্রান্ত হইতে শুরু করিল। ইহার প্রমাণ মধুসূদন ত বটেনই। কিন্তু তাহারও আগে এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহিত্য সমালোচনায়। তিনি এদেশীয় পণ্ডিতদের সাহিত্যের বহিরঙ্গ-প্রিয়তাকে তীক্ষ্ণ সমালোচনা করিয়াছেন[১১২ক] এবং অলংকার-বাহুল্য যে সাহিত্যের দোষ তাহা বারে বারে উল্লেখ করিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে জীবনানুগতাই, Realismই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গুণ এবং সেই জন্য তিনি একাধিকবার সমালোচকের 'সহৃদয়তার' কথা বলিয়াছেন। এই সহৃদয়তাকে ইংরাজীতে বলা যাইতে পারে cultivated taste। বিদ্যাসাগরের কাছে এই tasteএর অর্থ অলংকার-প্রিয়তা নয়; এই taste হইল, কবি বাস্তবকে কতখানি রূপায়িত করিতে পারিলেন, তাহা বিচার করিবার ক্ষমতা। কালিদাসকে যে বিদ্যাসাগর শ্রেষ্ঠ কবি এবং নাট্যকার বলিয়াছেন তাহার কারণ, 'কালিদাসে সবই যেন স্বভাবোক্তি অলঙ্কার।' স্বভাবোক্তি মূলত অলংকার কিনা এ বিষয়ে অনেক আলংকারিকের সন্দেহ আছে। ইহার আসল কথা হইল 'কবি যেমনটি দেখিবেন তেমনটি বলিবেন।' ইহাই ত realism বা বাস্তবতাবাদ। কালিদাসে জীবনের সত্য প্রতিফলন আছে বলিয়াই বিদ্যাসাগর তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন এবং মাঘ বা ভারবির অতি-প্রশস্তিমূলক প্রবচনগুলি (উদিতে নৈষধ কাব্যে বা পুষ্পেষু জাতী ইঃ)র তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। বিদ্যাসাগরের সমস্ত বক্তৃতাটির মূল উদ্দেশ্যই হইল এদেশীয় পণ্ডিতদের রুচি-বিকৃতির ও অহেতুক ভাষাবিলাসের (যাহাকে Plato তাঁহার বহু diologueএ sophistry বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন) পরিবাদ করা এবং নবতর, অন্তর্মুখী রুচির প্রতিষ্ঠা করা। এমন কি বিদ্যাসাগর প্রচলিত অলংকার শাস্ত্রে নাটকের (রূপক) প্রকৃতিবিচারের যে নিরিখ আছে তাহাকে অযৌক্তিক বা irrational বলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন, "আলঙ্কারিকেরা দৃশ্য কাব্যের এই যে অষ্টাবিংশতি বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাদের বিশেষ ভেদগ্রাহক তাদৃশ কোন লক্ষণ নাই। সর্বপ্রধান ভেদ নাটকের যে সমস্ত লক্ষণ নিরূপিত আছে, দৃশ্যকাব্যের অন্যান্য ভেদের, অঙ্কসংখ্যার ন্যূনাধিক্য প্রভৃতি, যে কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন তাহা এমন সামান্য যে সেই অনুরোধে, দৃশ্যকাব্যের অষ্টাবিংশতি বিভাগ কল্পনা না করিয়া, যাবতীয় দৃশ্যকাব্যকে কেবল নাটক নামে নির্দ্দেশ করাই ন্যায়ানুগত বোধ হয়।"[১১৩] বিদ্যাসাগর Aristotleএর মত অলংকার শাস্ত্র প্রণয়ন করেন নাই কিন্তু

বিচারের যে ধারা নির্দ্দেশ করিতেছেন তাহাই হইল আধুনিক সাহিত্যবিচারের ভিত্তি—বহিরঙ্গ ছাড়িয়া অন্তরঙ্গে দৃষ্টিদান এবং সাহিত্যের জীবনানুগতা। এই বিচারে তথাকথিত রসগুলি প্রধান কথা নয়, প্রধান কথা **মানবরস**। তাই তিনি জয়দেবের রচনা-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়াও তাঁহাকে কবিত্ব-শক্তিতে হীন বলিয়াছেন আর নৈষধ সম্পর্কে বলিতেছেন, "কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরা, বিশেষতঃ নৈয়ায়িক মহাশয়েরা এমন **অত্যুক্তিপ্রিয়** ও **অনুপ্রাসভক্ত** যে তাঁহারা সকল কাব্য অপেক্ষা নৈষধচরিতের সমধিক প্রশংসা করিয়া থাকেন।" [১১৩]

তাহার উপর, রসের সংখ্যা ছয়, আট, দশ, যাহাই হউক না কেন, সেকালে রস বলিতে বুঝাইত আদিরস। ভারতচন্দ্রই তাহার প্রমাণ। কিন্তু নবরুচিবান বাঙালীর আর সে জিনিষ যে তেমন পছন্দ হইতেছে না, সে যে অন্য জিনিষ চাহিতেছে, সে যে জীবনের বহুবিচিত্রতার সাহিত্যিক প্রতিফলনের প্রয়াসী, সে কথা সোমপ্রকাশের দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন : "এখন আর লোকের মন সুখময় **আদিরস সাগরে মগ্ন হইতে তাদৃশ উৎসুক নহে**। এখন দিন দিন লোকের **মন যেমন উন্নত হইতেছে** তেমনি উন্নত পদ্য সৃষ্টিও আবশ্যক হইয়াছে।" [১১৪] এই নূতন যুগে জীবন-রসই একমাত্র রস বলিয়া অনুভূত হইতেছে—জীবনরস, অর্থাৎ বাস্তব-নিষ্ঠা, বিচিত্র, জটিল জীবনধারার সত্য রূপায়ণ। "আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের যথার্থ উদ্ভব হইল ইংরেজি সাহিত্যশিক্ষা ও **তজ্জনিত নব রসবোধের** ফলে। রঙ্গলাল-মধুসূদন-ভূদেব-বঙ্কিমের সাহিত্য-সৃষ্টি ইংরেজি-শিক্ষার পরোক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবজাত। ইংরেজি সাহিত্যের রসগ্রাহী শিক্ষিত বাঙ্গালীর চিত্তে যে আত্মসম্মানজ্ঞান দেশাত্মবোধ এবং আত্মপ্রকাশেচ্ছা জাগরূক হইয়া উঠিল তাহাই আধুনিক বাঙ্গালা-সাহিত্যকে সৃষ্টি করিয়াছে। এই সাহিত্য-সৃষ্টির রূপে যে বিদেশী অনুকরণপ্রচেষ্টা দেখা যায় তাহা বড় কথা নয়, কিন্তু সেই সাহিত্যস্রষ্টার মনে যে বিদেশী সাহিত্যের রসানুভূতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল তাহারি গুরুত্ব সমধিক।"[১১৫] **আর সেই নবজীবনরসের প্রধান রস হইল করুণ রস কেন না জীবনে পরাজয়ই হইল এ যুগের স্পর্শকাতর মনের প্রধান চেতনা—সে বিদ্যাসাগরই হউন, মধুসূদনই হউন আর কবি বিহারীলালই হউন**। এমন কি রঙ্গলালের পদ্মিনী-উপাখ্যান, কর্ম্মদেবীর মূলীভূত চেতনাও এই ক্ষয়ের, পরাজয়ের—সার্থকতার নয়। এই চেতনাই সীতার বনবাসে, কীর্ত্তিবিলাস, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি নাটকে।

আর প্রহসন বা নক্সাগুলির হাস্যরসের পিছনে আছে রক্ষণশীলতার সঙ্গে

সংস্কার-চিকীর্ষার বিরোধের একটি উপর-উপর রূপ মাত্র। আমরা সমাজ মানসের যে মূলীভূত দ্বন্দ্বের কথা বলিয়াছি এগুলি সেই গভীরতর স্তরে পৌঁছাইতে পারে নাই।

(৯) ব্যক্তি-স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই স্পর্শকাতর কবি-মানসে আসিল আত্মকেন্দ্রিকতা (ego-ism, ego-centrism)। এই আত্মকেন্দ্রিকতাই আবার জন্ম দিল সেই যুগের lyricismএর (lyric কথাটির বাংলা করা হইয়াছে গীতিকবিতা। কিন্তু lyricএর প্রাণ যে subjectivism—আত্মগত-প্রাণতা, সেইটির কোনো নিশানা গীতিকবিতা কথাটি হইতে পাওয়া যায় না); ব্যক্তি চেতনার এই আত্মগত বিকাশ চিত্তমুক্তির অনুগামী। যে মুহূর্তে ব্যক্তি স্বাধিকার-সচেতন হইল সেই মুহূর্তে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে তাহার মানস-বিচরণের পথে আর কোনো বাধা থাকিল না। আত্মসম্প্রসারণই হইয়া উঠিল তাহার ধর্ম। ছ'টি-ছ'-ঘায়ে-চলা রক্ষণশীলতা মধুসূদনীয় লীলার তাণ্ডবে ভয়ে আত্মগোপন করিল। বিহারীলালের যে lyricismএর কথা রবীন্দ্রনাথ প্রমুখেরা বলিয়াছেন তাহার উৎসমূলই রহিয়াছে মধুসূদনে (এমন কি রঙ্গলালেও)। 'আত্মবিলাপ' সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ lyric কবিতা হইলেও সমগ্র মেঘনাদবধে lyricismএর অকুণ্ঠ বিস্তার ঘটিয়াছে; এবং ইহাই স্বাভাবিক।

মধুসূদনের ব্যক্তি-জীবন
ও
যুগস্পর্শ

মধুসূদন যখন হিন্দুকলেজের সিনিয়র বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছেন, ১৮৪৩ সালে, তখন নূতন আলোর প্রথম চোখ-ঝলসানো দীপ্তি চোখ-সহা হইয়া আসিয়াছে। প্রথম যাঁহারা ইংরাজী শিখিয়া, ইংরাজদের মুৎসুদ্দীগিরি করিয়া সমাজের মাথা হইয়া বসিলেন তাঁহারা রামমোহনের আন্দোলনের কিছু কিছু অংশভাগী ছিলেন। কিন্তু সে আন্দোলনে উচ্ছ্বাস অপেক্ষা কর্মের ভাগ বেশী ছিল এবং রামমোহনের যুক্তিবাদ একেশ্বর-বাদে পরিণত হওয়ায় তাঁহার অনুগামীদের শুধুমাত্র জীবনোপভোগে আত্মোৎসর্গ করা সম্ভব ছিল না। তাহা ছাড়া প্রতীচ্যের যুক্তিবাদী, বিপ্লবী ভাবধারার সিঞ্চন তখনও ধারাবর্ষণের রূপ গ্রহণ করে নাই এবং সেই ভাবধারা তখনও প্রথম আসিতেছে বলিয়া উন্মাদনার জন্য যে প্রচুর নিষেকের প্রয়োজন তাহা তখনও ঘটিয়া উঠে নাই। তাই প্রথম দলের নবীনেরা তাঁহাদের নূতন জ্ঞানের সাহায্যে, নূতন পরিবেশে, অর্থসঞ্চয়কে অন্যতম প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন; অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-সংস্কারকেও। আত্মীয়সভায় তাই আলোচনা হইত না এমন বিষয় নাই। সভাসমিতিও তখন হইতেই স্থাপিত হইতে শুরু করিয়াছে। কাশীপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখেরা ইংরাজীতে কবিতাও লিখিয়াছেন; কিন্তু কলেজ স্কোয়ারে গো-মাংসের সঙ্গে প্রথম মদ্যপানের উল্লাসটি আসিয়াছে রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের যুগে। মধুসূদন-রাজনারায়ণদের সময়ে কার্যটি যেন ইয়ং বেঙ্গলের কর্তব্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে! সাক্ষাৎ Derozianদের গৌরব তাঁহারা পাইতেছেন না। কিন্তু সে গৌরব না পাইলেও উনিশ শতকের নবজাগরণ তখন শুরু হইয়া গিয়া রোদ পাকিতে শুরু করিয়াছে। নিষিদ্ধ মাংস, নিষিদ্ধ পানীয় ভক্ষণ, প্রথম খ্রীষ্টিয়ান হওয়া, ইংরাজী পোষাক পরা, বিলাত যাওয়া, ভগবান না মানা, ইংরাজীতে কথা বলা এবং বাংলাকে ঘৃণা করা, ইত্যাদি নবযুগের বহিরঙ্গের যেগুলি চটকদার ঘটনা সেগুলি সবই ঘটিয়া গিয়া মধুসূদনের খ্রীষ্টান হইবার সমকালে যুগমানসে স্থিতি আসিয়াছে, পরিপক্কতা আসিয়াছে এবং আমরা যুগমানসের বৈশিষ্ট্য বলিতে

পূর্ব অধ্যায়ে যাহা বুঝিয়াছি সেগুলি প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। **সেই যুগ মধুসূদনকে স্পর্শ করিল।** ১৩ বৎসর বয়সে তিনি যখন কলিকাতায় আসিয়া হিন্দুকলেজে প্রবেশ করিলেন তাহার আগেই তিনি পিতাকে দেখিয়াছেন কলিকাতা যাতায়াত করিতে; পিতৃব্যদের দেখিয়াছেন নূতন-গড়া সব সহরে বড় বড় চাকুরী করিতে যাইতে; এবং অনুভব করিয়াছেন তাঁহাদের গৃহের আবহাওয়ার পরিবর্তন। যে গৃহে এতগুলি সুশিক্ষিত ব্যক্তি, কেহ কলিকাতায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল, কেহ সেরেস্তাদার, কেহ বা মুন্সেফ, সেই গৃহে কালোচিত কূপমণ্ডুকতা থাকিতে পারে না; সেখানে রুচির পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী— সেখানে ব্যক্তিস্বাধীনতার কিছু অনুপ্রবেশ নিশ্চিত ঘটিয়াছে এবং সর্বাপেক্ষা মৌলিক যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা হইল নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে। মধুসূদনের মাতা "জাহ্নবী নানাগুণে গুণবতী ছিলেন। রাজনারায়ণ দত্ত ইঁহাকে বিশেষ সম্মান করিয়া চলিতেন।"[১১৬] এই সম্মানের পিছনে আছে পরিবর্তিত যুগ-চেতনা। তাহা না হইলে দ্বিতীয়বার দ্বার-পরিগ্রহ করিয়া যে মিনতি-ভরা চিঠি তিনি লিখিয়াছিলেন সেরকম চিঠি সেই কুলীনপ্রথার যুগে কোন স্বামী কোন স্ত্রীকে লিখিয়া থাকে? লিখিতেছেন, "আমি যে কুকার্য করিয়াছি তাহা তুমি শুনিয়াছ; যদি ইহাতে আমার উপরে অসন্তুষ্ট হও, তবে আমার জীবন পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ······কেবল তোমার জন্যই সংসার-আশ্রমে রহিয়াছি। যখন শুনিব, তোমার ভালোবাসায় আমি বঞ্চিত হইয়াছি, তখনই এ সংসার ত্যাগ করিব।"[১১৭] রাজনারায়ণের অপরাধ-চেতনা এখানে স্পষ্ট। আর এই ঘটনার পরে জাহ্নবী দেবী রাজনারায়ণকে যে অভিশাপ দিয়াছিলেন তাহার মধ্যে তাঁহার প্রধানতম অভিযোগ হইতেছে এই যে রাজনারায়ণ নারীত্বের অপমান করিয়াছেন।

এই মাতার কাছে মধুসূদন মানুষ হইয়া আত্মসম্মান-বোধের প্রথম পাঠ লইয়াছিলেন আর রামায়ণ মহাভারত আত্মস্থ করিয়াছিলেন। পরে আসিয়া ভর্তি হইলেন সেই হিন্দুকলেজে যাহা তৎকালে বিপ্লবীচেতনার মাতৃকাসন এবং যেখানে তখন পড়াইতেছেন নৈষ্ঠিক যুক্তিবাদী Derozian নহেন, ভাব-বিলাসী, ব্যক্তি-স্বাধীনতার পূজারী কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে উচ্ছৃঙ্খল ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন। রাজনৈতিক মতবাদে টোরী হইলেও তিনি তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চার করিতেন তীব্র মর্ত্যপ্রেম (intense love of life) আর সৌন্দর্য-পূজা, আর কাব্যের গরিমার চেতনা (an exalted idea of poetry)।[১১৭ক] Derozio মধুসূদনের শিক্ষক হইলে কি হইত বলা যায় না কিন্তু রিচার্ডসন তাঁহার গুরু হইবার ফলে মধুর জন্মগত প্রবণতা-

গুলিই রসসিঞ্চিত হইল। রাজনারায়ণ তাঁহাকে শাসন করিতেন না সত্য, প্রশ্রয় দিতেন এ কথাও সত্য, কিন্তু সে প্রশ্রয়ের ফলে মধুর নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটিয়াছিল এমন কথা মধুর পরম শত্রুও বলিতে পারেন নাই। (যোগীন বসু মহাশয়ের ঐ মর্মে ইঙ্গিতের কোনো ভিত্তি নাই)। তবে রাজনারায়ণের প্রশ্রয় আর রিচার্ডসনের শিক্ষা দুই-এ মিলিয়া, যুগের সঙ্গে যোগ দিয়া, মধুর মধ্যে সেই মর্ত্যপ্রেম জাগরূক করিল যাহা নব মানবতাদেরই অঙ্গঃ—যে মর্ত্যপ্রেম শেক্সপীয়রকে Romeo & Juliet এবং Antony & Cleopatra সৃষ্টিতে প্রণোদিত করিয়াছে, মিল্টনকে দিয়াছে Satan সৃষ্টি করিবার সাহস, ওয়ার্ডবার্থকে প্রকৃতিপ্রেম আর শেলী ও বায়রণকে দুঃসাহসিক উদ্দামতা,—সেই প্রেমে সার্থক জীবনের দিকে মধু ব্যাকুল বাহু প্রসারিত করিলেন—ভাবিলেন ইংলণ্ডে গিয়া ঐ জীবনের স্রোতে অবগাহন করিতে পারিলেই কাব্যলক্ষ্মী তাঁহার কাছে ধরা দিবেন।[১১৭খ] তিনি শুধু কবি হইবেন না, একেবারেই গতানুগতিকতার মূলোচ্ছেদ করিবেন, এই তাঁহার বাসনা। তাই Blank Verse (অমিত্রাক্ষর ছন্দ)—এই নামে সনেট লিখিয়া বসিলেন এবং তাহার বিষয়বস্তু হইল অপার্থিব—'Evening in Saturn।' সনেটের আবার একটি ভূমিকাও লিখিয়া দিলেন। সেই ভূমিকাটি উল্লেখযোগ্য :—

"Reader, whoever publishes a sonnet with a preface? I hear or fancy that I hear you say, 'None!' Well, I publish. I am an enemy to what men call 'custom.' But be that as it is, I publish my sonnet with a preface; I have to teach the world something new, Don't get offended. Behold! I have written a sonnet in Blank Verse! what a rare experiment! I have done succes-fully what none dared do before me! I have laid my scene in the planet Saturn. I despise everything earthly," (জীবনচরিত পৃ—৮৯, ৯০)। রাজনারায়ণ তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করিবার অনেক আগেই তিনি ইংলণ্ডে যাইবার প্রবল বাসনা গৌরদাসের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। এবং বন্ধুর কাছে স্থির বিশ্বাসে বলিয়াছেন যে তিনি বড় কবি হইলে গৌরদাস যেন তাঁহার জীবনী লেখেন।

তাঁহার এই আত্মপ্রস্তুতির পথে প্রথম বাধা আসিল বিবাহের প্রস্তাব। শুনিয়াছি অনুরূপ ক্ষেত্রে রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রতিবাদের জোরে পিতামাতাকে

রুখিয়াছিলেন। মধুসূদনের জীবনেও আসিল তাঁহার ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপে প্রথম প্রতিবাদের উপলক্ষ। তাঁহার আপত্তির কারণ ছিল তিনটি—১১৯
(ক) ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপে আপত্তি—১১৯
(খ) প্রাগ্‌বিবাহ প্রেম ভিন্ন বিবাহে অবিশ্বাস—১১৯
(গ) অশিক্ষিত, ব্যক্তিত্বহীন পুঁটুলিবিশেষ বাঙালী মেয়েকে বিবাহে অনিচ্ছা—১১৯

[নারীসম্পর্কে মধুসূদনের তৎকালীন মনোভাব তাঁহার, স্ত্রীজাতির শিক্ষার উপর সেই সময়ে রচিত, ইংরাজী নিবন্ধতেই সুপরিস্ফুট: The happiness of a man who has an enlightened partner is quite complete···In India, I may say in all the oriental countries, women are looked upon as created merely to contribute to the gratification of the animal appetites of men. This brutal misconception of the design of the Almighty is the source of much misery to the fair sex, because it not only makes them appear as of inferior mental endowments, but no better than a sort of speaking brutes. The people of this country do not know the pleasure of domestic life, and indeed they cannot know until civlization shows them the way to attain it." পৃঃ ১১৭—জীবনচরিত]

এই তিনটিই বিবাহ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার সম্পূর্ণ পরিবর্তন সূচিত করে। অর্থের বা জীবিকার দিক হইতে পিতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন না করিয়াও, হৃদয়ের বা ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই স্বাধীনতার স্পৃহা সৃজ্যমান গণতান্ত্রিক চেতনারই ফল, নব মানবতাবাদেরই অঙ্গবিশেষ। অর্থনৈতিক ভিত্তি গঠিত হইবার আগেই জীবনে এই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বৃহত্তর সমাজজীবনেও দেখা দিয়াছিল। অর্থনীতি ব্রিটিশের করায়ত্ত হইলেও নব্য বাংলা আদর্শ ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বরাট-সাধনা শুরু করিয়া দিয়াছিল। মধুও ত সেই সমাজ-দেহেরই অংশ। যে প্রতিজ্ঞার জোরে কৃষ্ণমোহন স্ব-প্রণয়িনী বিন্ধ্যবাসিনী দেবীকে স্বমতে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা নব জীবনবোধের জোর। সেই জোরেই মধুসূদন বিবাহে আপত্তি করিয়া এমন এক পথে পা দিলেন যে পথে তিনি 'নবকুমারের' অপেক্ষাও একা কেননা তখনও কোন কপালকুণ্ডলার সন্ধান তিনি পান নাই। নূতন এই পথে পা দিবার সিদ্ধান্ত করিবার আগে মধুসূদন যে সব কথা

ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন তাহা সম্ভব নয় কিন্তু ইহা ঠিক যে এই সিদ্ধান্তই মধুসূদনের জীবনের ক্রান্তিকারী সিদ্ধান্ত। ইহার পরেই শুরু হইল তাঁহার নিঃসঙ্গ সাধনার জীবন: ইউরোপের বিচিত্র সাহিত্য ও ভাষার অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার শিক্ষা; চুরি করিয়া মাঝে মাঝে মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং আত্মসম্ভ্রমবোধে আঘাত লাগিলে কলেজকর্তৃপক্ষের সঙ্গে দ্বন্দ্ব এবং সেই দ্বন্দ্বে কর্তৃপক্ষের নতি স্বীকার। এই তিনবছর কয়েকমাস বিশপস্ কলেজ যেন মধুসূদনের গুরুগৃহ হইয়া উঠিল। পাদরিদের কাছে পড়িতেছিলেন বলিয়া নয়, অভাবিতপূর্ব আত্মপ্রস্তুতির মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন বলিয়া।

হিন্দুকলেজে ইংরাজী সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় সম্পূর্ণ হইয়াছিল। 'সম্পূর্ণ' কথাটি ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করিতেছি। আক্ষরিক অর্থে সম্পূর্ণতা অর্জন কাহারও সাধ্য নয় এ কথা না বলিলেও চলে কিন্তু ঐ বয়সেই মধুসূদনের অধিগত বিদ্যা সকল সাধারণ সীমা ছড়াইয়া গিয়াছিল এবং তিনি তৎকালীন ইউরোপের কবি-মার্তণ্ড বায়রণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মতে, যে সকল প্রেমোচ্ছ্বাসপূর্ণ কবিতা লিখিতে শুরু করিলেন তাহা শুধু যে তাঁহার অকালপক্কতারই নিদর্শন তাহা নহে, তাঁহার ভবিষ্যৎ হৃদয়ঘটিত উচ্ছৃঙ্খলতারও সূচক। বসু মহাশয় মধুর নীতি-হীনতা লইয়া বড় বেশী ব্যস্ত হইয়া না উঠিলে দেখিতে পাইতেন যে খাস ইংলণ্ডেও খুব বেশী কবি ঐ বয়সে মধুর মত বিদ্যা এবং ভাষার উপর অধিকার লইয়া কবিতা লিখিতে শুরু করেন নাই। মধুসূদনের বাল্যবয়সের এই রচনাগুলি পড়িলে হঠাৎ বায়রণের রচনা বলিয়া ভুল যে হইতে পারে সেইখানেই তাঁহার সার্থকতা। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা রিভিউ পত্রিকার সম্পাদক মধুসূদনকে Westminster Abbeyর কবি-কোণে স্থান পাইবার উপযুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন; অবশ্য তখন মধু মাদ্রাজে এবং কবি হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মিল্টন, কি Shakespeareকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিবার মত মানসিক পরিপক্কতা তখনও, এমন কি মাদ্রাজ প্রবাসকালেও তাঁহার আসে নাই। ইহার কারণ প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বাস-প্রবণতা। সত্য বলিতে কি, শেলী, বায়রণ, স্কট, যাহারা যৌবনে না পড়িল তাহাদের আর কখনও প্রাণ ভরিয়া পড়াই হইয়া উঠিবে না। কিন্তু রাজা পুরুর কাহিনী লিখিতে বসিয়া ১৮৪৩ সালেই যে দেশাত্মবোধের পরিচয় মধু দিতেছেন তাহা কি বায়রণের অনুকরণের ফলে, না Fakeer of Jungheera পাঠের, না নিজের আন্তরিক অনুভূতির?

But where, oh ! where is Porus now ?
And where the noble hearts that bled
For freedom—with the heroic glow
In patriot bosoms nourished—
Hearts, eagle-like that recked not death,
But shrank before foul Thraldom's breath ?
And where art thou—Fair freedom !—thou—
Once goddess of Ind's sunny clime !……
That glory hath now flitted by !
The Crown that once did deck they brow
Is trampled down—and thou sunk low :
Thy Pearl, thy diamond, and thy mine
Of glistening gold no more is thine !
Alas !—each conquering tyrant's lust
Has robb'd thee of thy very dust !
Thou standest like a lofty tree
Shorn of fruits—blossoms—leaves and all—
Of every gale the sport to be,
Despised and scorned e'en in they fall.

উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ। শেষের কয় পংক্তির উপমার সঙ্গে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গের নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তির মিল স্পষ্ট :—

বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
একে একে কাঠুরিয়া কাটি, অবশেষে
নাশে বৃক্ষে··· [পংক্তি ৯১-৯৩]

কিন্তু সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট হইতেছে যথার্থ আবেগের সুর। এ আবেগে কৃত্রিমতা আছে বলিয়া ত বোধ হয় না। অথচ ইহা তাঁহার খ্রীষ্টান হইবার পরে লেখা। মধু ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন ১৮৪৩ এর ৯ই ফেব্রুয়ারী আর *King Porus* Literary Gleaner পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৮৪৩ এর সেপ্টেম্বর মাসে। মধু তখন হয়ত Dacres লেনে স্মিথ সাহেবের বাসায় বনবাস যাপন করিতেছিলেন। তিনি যে প্রাণের একান্ত আবেগে ধর্মান্তর গ্রহণ করেন নাই এ কথা কৃষ্ণমোহনও জানিতেন। অতএব ধর্মান্তর গ্রহণ করা সত্ত্বেও তিনি যে মনে মনে বাঙালী ছিলেন ইহা আমাদের প্রামাণ্য

নয়; আমাদের প্রামাণ্য হইতেছে এই যে স্বদেশীয়তা শুধু মধুর কেন, সে যুগের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং মধুর যে বিজাতীয়তার কথা যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিয়া শেষ করিতে পারিতেছেন না বা যাহাকে কোট-পেণ্টলুন রূপে মধুর কাব্য ফুঁড়িয়া বাহির হইতে রাজনারায়ণ বসু মহাশয় দেখিতে পাইতেছেন, সেই বিজাতীয়তা মধুসূদনের অন্তরে কোনদিন ছিল না। পরে তিনি নিজেকে যে হিন্দু বলিয়া রাজনারায়ণ বসুর কাছেও উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু কৈশোরের শুধু এই উদ্ধৃত কাব্যাংশটি নয় আরও অনেক খণ্ড কাব্য, পরবর্তী কালের বীরাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতা, বিদ্যাসাগরের মধ্যে বাঙালা মায়ের স্নেহশীলতা আবিষ্কার, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বাঙালীদের সঙ্গেই আন্তরিক মেলামেশা—এই সবই তাঁহার বাঙালীত্বের এবং স্বাদেশিকতার প্রমাণ। বাহিরে তাঁহার যে বিজাতীয়ত্ব তাহাকেও আজিকার দিনে কেহই ঐ নামে অভিহিত করিত না—বলিত যে আধুনিক জীবনযাপনের তাগিদ হইতেই ঐ সভ্য অভ্যাস তাঁহার হইয়াছে। কলেজ স্কোয়ারে ইয়ং বেঙ্গল যে গোমাংস আর মদ খাইতেন সে কি তাঁহাদের বিজাতীয়তা—অর্থাৎ বঙ্গীয়েতর জাতির প্রতি ভালবাসা দেখাইবার জন্য, না স্বদেশীয়দের কুসংস্কার এবং আচারান্ধতা দূর করিবার জন্য? মধুসূদন যে কবিরাজী চিকিৎসা করাইতে রাজী হন নাই, মিস্টার বলিয়া না ডাকিলে ক্ষুণ্ন হইতেন এগুলি এখনকার নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আবার বিচিত্র কুসংস্কার বলিয়া গণ্য হইতে পারে। মধুসূদন কিন্তু ঐ গুলিকে উচ্চতর স্তরে জীবনযাপনের অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। সাহেব তিনি যে মনে মনে হন নাই তাহা তাঁহার ঢাকার বিখ্যাত উক্তিতেই স্পষ্ট [সা. স, চ. পৃ ৯১]। কিন্তু তাঁহার কাব্যে যে গুণের প্রাচুর্যের জন্য যোগীন বসু, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখেরা বিজাতীয়তার অভিযোগ আনিয়াছিলেন তাহা হইল প্রতীচ্যের **'নব মানবতাবাদ'** এবং সম্পূর্ণ নূতন রসবোধ। মধু তাঁহার সহাধ্যায়িদের ভবিষ্যৎ কিরূপ কল্পনা করিতেন সে সম্পর্কে তাঁহার বিখ্যাত কবিতাটি (ডিরোজিওকে অনুকরণ করা সত্ত্বেও) সে যুগের মানুষের নব জীবনাদর্শের এক সম্পূর্ণ পরিচয় বহন করিতেছে—

Oh how my heart exulteth while I see
These future flow'rs, to deck my country's brow,
Thus kindly nurtured in this nursery !

(হিন্দূ কলেজ বুঝাইতেছেন)

Perchance, unmark'd some here are budding now,

Whose temples shall with laureate wreathes be crown'd,
Twined by the sister Nine whose angel tongues
Shall charm the world with their enchanting songs
And time shall waft the echo of each sound
To distant ages. some, perchance, here are,
Who, with a Newton's glance, shall nobly trace
The Course mysterious of each wandering star;
And like a God, unveil the hidden face
Of many a planet to man's wondering eye,
And give their names to immortality!

অর্থাৎ মধু ভাবিতেছেন তাঁহারা Shakespeare (বা Milton) আর Newton হইয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করিবেন। Shakespeare বা Milton অবশ্য তিনিই হইবেন এবং তখনও ভাবিতেছেন যে সে কাব্য ইংরাজীতেই হইবে কেন না বাঙলা ভাষার উপর তাঁহার এবং তাঁহাদের অনেকেরই তখনও পর্যন্ত কোনো আস্থা নাই, আস্থা জন্মাইবার কোনো কারণও ঘটে নাই। প্যারীচাঁদ, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার, দ্বিজেন ঠাকুর, রঙ্গলাল—কেহই তখনও বাঙলাভাষার সামর্থ্যের পরখ করেন নাই। কিন্তু আদর্শ মধুসূদন ঠিকই তুলিয়া ধরিয়াছেন। সেই আদর্শ বাঙালীর জীবনে কেন যে পূর্ণ হইল না তাহা আমরা আগের অধ্যায়ে দেখিয়াছি। **এই অপূর্ণতার, এই পরাজয়ের চেতনাই পরিণত বয়সে মধুকে মেঘনাদ সৃষ্টি করাইয়াছিল।** তাই মেঘনাদে যাঁহারা বিজাতীয় ভাব দেখেন তাঁহারা মধুসূদনের কাব্যের উৎসমূলের সন্ধান রাখেন না। তাহা ছাড়া সেই যুগেরই যাহারা মানুষ তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না সেই যুগকে সম্পূর্ণ বিচার করা। রাজনারায়ণ বা অন্যান্যেরা সেই জন্যই বিচারে ভুল করিয়াছিলেন। তবে যোগীন বসুর ভুলের কারণ ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং যুগমানসের মূল্যায়নে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব।

মধুসূদন খ্রীষ্টান না হইলে যে শেষ পর্যন্ত ডেপুটিগিরিতেই জীবন শেষ করিতেন এবং কাশীপ্রসাদ কি রাজনারায়ণ বসুর মত দুই চারিটি চোস্ত ইংরাজী কবিতা লিখিয়া জীবলীলা সাঙ্গ করিতেন ইহা যোগীন বসুও স্বীকার করেন।

খ্রীষ্টান হইয়া মধুসূদন প্রথম বুঝিলেন একাকিত্ব কাহাকে বলে। তাঁহার স্বতঃপ্রসারশীল সত্বা আপনার মধ্যে আপনি গুমরাইয়া উঠিল। ভালো না বাসিয়া যে থাকিতে পারিত না সে একেবারে জলের বাহিরে মাছের মত হইয়া বারে বারে গৌরদাসকে লিখিতে লাগিল অন্য বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে লইয়া স্নিগ্ধ

সাহেবের বাড়ীতে আসিতে। শেষে তাঁহাকে আসিতে হইল শিবপুরে বিশপ্‌স্‌ কলেজে। সেখানে শুরু হইল কঠিন বিদ্যাভ্যাস—একই সঙ্গে গ্রীক, ল্যাটিন ও সংস্কৃত শিক্ষা। এক সঙ্গে তাঁহার সামনে উদ্‌ঘাটিত হইল ইংরাজী, গ্রীক, ল্যাটিন ও সংস্কৃত সাহিত্যের—অর্থাৎ আর্য জাতির প্রায় সমগ্র সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের, ভাবসম্পদ এবং সঙ্গে সঙ্গেই কাটিয়া যাইতে লাগিল রুচির যাহা কিছু সঙ্কীর্ণতা ছিল সব; জাগিতে লাগিল নব রসবোধ। ২১ বছর কয়েক মাস বয়সের মধুসূদন ইংরাজী, গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যে এবং প্রতীচ্যের নব মানবতার আদর্শে পরিপূর্ণ দীক্ষিত হইলেন; আবিষ্কার করিতে লাগিলেন সংস্কৃত সাহিত্যের সম্পদ। খ্রীষ্টিয়ান না হইলে মেঘনাদবধ কাব্যের কবি কি এমনি করিয়া আত্মপ্রস্তুতি করিতে পারিতেন ?

কিন্তু চারিদিকের একাকিত্ব এবং শেষে পিতার পরিপূর্ণ অসহযোগ আত্মাভিমানী মধুসূদনকে মর্মপীড়িত করিল। যাহাদের ভালোবাসিতেন তাহাদের কাছ হইতে দূরে, ভিন্নদেশীয়দের সাহচর্যে, কলেজের কঠিন নিয়ম শৃঙ্খলা পালন করিতে করিতে, এবং শেষ পর্যন্ত হ্যালিডের কাছে ধর্ণা দিয়াও কোনমতে বাংলাদেশে আত্মসম্মান লইয়া থাকিবার সুযোগ না পাইয়া তিনি একান্ত অভিমানভরেই, সকলের অজ্ঞাতে, গৌরদাসেরও, মাদ্রাজের পথে পাড়ি দিলেন। তখনও মধুসূদনের 'আশার নেশা', কাটে নাই। কাটিবার কথাও নয়; তখনও তিনি সন্ধান করিয়া ফিরিতেছেন।

ইতোমধ্যেই বাংলাদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রতিষ্ঠা ও প্রসার ঘটিয়াছে; ক্রীতদাস প্রথার বিলোপ ঘটিয়াছে; কৃষ্ণনগরে আর একটি কলেজ স্থাপিত হইয়াছে; দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন; দ্বারকানাথ দ্বিতীয়বার বিলাত গিয়াছেন এবং টমসন আসিয়া বক্তৃতা দিয়াছেন; কৃষ্ণমোহনের বিদ্যাকল্পদ্রুম প্রকাশিত হইতেছে; বিদ্যাসাগর বেতালপঞ্চবিংশতি প্রকাশ করিয়াছেন। এই ঘটনাগুলি মোটামুটি মধুসূদনের খ্রীষ্টান হইবার কাল হইতে মাদ্রাজ যাইবার কালের মধ্যে সংঘটিত হইয়া গেল। বাংলাদেশের সমাজ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে যে আলোড়ন শুরু হইল মধুসূদন সুদূর মাদ্রাজ হইতে তাহা সতৃষ্ণমানসে দেখিতে লাগিলেন।

মাদ্রাজে একাকিত্বের বোঝা হইল ভারী; কবিখ্যাতি কিছু হইল বটে কিন্তু ইহা বুঝিতেও দেরী হইল না যে ইহাতে চলিবে না। বিবাহ করিয়াও মানস-সঙ্গিনী লাভ করিতে অসামর্থ্য ("For aught I know to the contrary I can confidently say that Modhu was disappointed in his first wife"—পৃ ৬৫৪ জীবনচরিত—গৌরদাস বসাকের মধুস্মৃতি),

অবিরাম অর্থকৃচ্ছ্রতা এবং তাহার সঙ্গে কলিকাতার বিদ্বৎ-সমাজের Captive Ladyর প্রতি কৃপা-মিশ্রিত অবজ্ঞা (Hindu Intelligencerএ কাশীপ্রসাদ ঘোষের ও হরকরার সমালোচনা, Bethuneএর অভিমত, কলিকাতায় ৪০ খানিও বিক্রি না হওয়া) মধুসূদনের একাকিত্বকে বাড়াইল বই কমাইল না। **স্বদেশ ও স্বভাষা হইতে বহুদূরে থাকিয়া তিনি যেন বাংলা ভাষার সঙ্গে নূতন করিয়া প্রেমে পড়িলেন। কাছে আসিবার জন্য দূরে যাওয়ার তাঁহার প্রয়োজন ছিল।** খ্রীষ্টিয়ান হইয়াও স্বদেশে থাকিবার ফলে যে ব্যবধান আত্যন্তিক হইয়া উঠে নাই মাদ্রাজে গিয়া তাহাই হইল। বিদেশিনী, নীলকরের কন্যা, স্বভাবতই মধুর মধুক্ষরা বাণীর মোহ কাটাইয়া উঠিয়া দেখিলেন ভদ্রলোকের কবিতার বই বিক্রী হয় না। বিক্রী যখন হয় না তখন সে কেমন কবিতা? অর্থের অভাবে কবিতার কঙ্কাল বাহির হইয়া পড়িল। মধু আশ্রয় খুঁজিলেন Henriettaর সাহচর্যে, পরে প্রেমে। নিজের কৃতকার্যের জন্য কোন অনুতাপ মধু করেন নাই। তাঁহার স্বাধীনতালিপ্সার সমালোচনা করায় তিনি গৌরদাসকে লিখিয়াছিলেন, "I tell you that in this world we have all to cut out paths for ourselves. How can you then expect a fellow to be in his mother's apron"? [১২০] কিন্তু ঐ একই সময়ের আর একটি চিঠিতে লিখিতেছেন কেমন করিয়া অর্থাভাব তাঁহার কবিতার শ্বাসরোধ করিতেছে: All that I want to make me a regular man of letters is a decent situation with a few hundreds a month. Who will give it me? Is there none in India? Time will show"! [১২১] আজকাল ইহা অতি সাধারণ কথা বলিয়া মনে হইবে কিন্তু যে মধুসূদন ঐশ্বর্যময় ঐহিক জীবনের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ যে ইংলণ্ডে ঘটে সেইখানে চলিয়া যাইতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, যিনি সেই জীবনপিপাসায় সব কিছু পরিত্যাগ করিয়া মাদ্রাজে পাড়ি জমাইলেন, এবং যিনি সেই ঐশ্বর্য-ভিত্তিক পরিপূর্ণ আত্মিক জীবনের আশায় লোকলজ্জা বিসর্জন দিয়া Henriettaকে লইয়া পলাইয়াছিলেন, সেই মধুসূদনের পায়ে অর্থের বেড়ী পরাইয়া দিলে চলিবে কেমন করিয়া? অর্থ তাঁহার প্রয়োজন—**প্রাচুর্যই তাঁহার অনুকূল পরিবেশ।** শুষ্ক মরুভূমিতে কাঁটাগাছ চিবাইয়া নিজের মুখের রক্তে যে উট পিপাসা নিবারণ করে তাহার সঙ্গে আধুনিক কালের নির্মোহ, নিজের চেতনায় নিজেই উত্যক্ত, হতাশ কবির সাদৃশ্য থাকিতে পারে। মধুসূদনের প্রতিভা ঐশ্বর্যের মাঝে লালায়িত হইতে চাহে, দৈন্যের মধ্যে নহে।

তাই মধুর শ্রেষ্ঠ কীর্তি অনর্জিতই রহিয়া গেল। তিনি শুধু শুরু করিয়াছিলেন মাত্র। কিছু পরেই বুঝিতে পারিলেন, "But I suppose, my poetical career is drawing to a close."[১২২] **তিনি সত্যই আমাদের অলিখিত মহাকাব্যের কবি।**[১২৩] অর্থকে তিনি শুধু উপকরণ মাত্র মনে করিতেন, পরমার্থ মনে করিতেন না: "এইক্ষণে তোমার অর্থের কোন প্রয়োজন দেখি না যে, কষ্ট করিয়া আমি তাহা পরিশোধ করি। যখন তোমার অন্নকষ্ট হইবে তখন দিব।"[১২৪] ১৮৬১ সালে মধুসূদন কমিউনিস্ট ছিলেন না; তিনি প্যারিসে গিয়া ফরাসী সম্রাটকে দীর্ঘজীবী হইবার আশীর্বাদ করিয়াছিলেন; কিন্তু এহ বাহ্য। আমাদের কাছে বর্তমানে আশ্চর্য ঠেকিলেও মধুর কাছে মানুষই ছিল প্রধান আর অর্থ সেই মানুষের সুখী হইবার উপায় মাত্র। সে অর্থের কোনো একান্ত অধিকারী থাকিতে পারে ইহা মধুসূদন স্বীকার করিতে চাহিতেন না।[১২৪ক] অথচ সেইটিই সামাজিক সত্য। মধুসূদনের জীবনেই প্রমাণ যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সমাজ-বিকাশের একটি অপরিহার্য স্তর হইলেও তাহা সেই সমাজেরই শ্রেষ্ঠ প্রতিভার বিকাশের ক্ষেত্রে কঠিনতম বাধা হইয়া উঠিতে পারে। ইহা যে হয় তাহা বহু প্রতিভার অকালমৃত্যুর ক্ষেত্রেই আমরা দেখিতে পাইতেছি কিন্তু তবু 'ইহাই ভবিতব্য' অথবা 'কিই বা করিবার আছে' ইত্যাদি আপ্ত বচনের পুনরুল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি। ভাবিয়া দেখিতেছি না যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন করিবার ক্ষমতাই যদি সমাজে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক হয় তাহা হইলে আর মনুষ্যত্ব বলিয়া কিছু থাকে না; এবং স্বভাবতই সেই সম্পত্তি এমন সব ব্যক্তির হাতে সঞ্চিত হইতে পারে যাঁহারা মনুষ্যত্বের বিরোধী, এবং যাঁহারা মনুষ্যত্বের বিকাশে সহায়তা করেন তাঁহারা জীবনধারণের ঐ উপকরণটি না পাইলে স্ব-কর্মে নিঃশেষে নিজেদের নিযুক্ত করিতে পারেন না। ব্যক্তিগত সম্পত্তির এই মহৎ ত্রুটি মধুসূদনের সচেতন দৃষ্টি এড়ায় নাই। তিনি দূর প্রবাস হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিখিতেছেন: Our Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to polish it up. Such of us as, owing to early defective education, know little of it and have learnt to despise it, are miserably wrong. It is, or rather, it has the elements of a great language in it. I wish I could devote myself to its cultivation, but, as you know, I have not sufficient means to lead a literary life and do nothing in the shape of real work for a living. I am too poor, perhaps,

too proud to be a poor man always. **There is no honour to be got in our courtry without money.** If you have money, you are বড় মানুষ ; if not, nobody cares for you ! We are still a degraded people. Who are the "বড়মানুষ" among us ? The **nobodies of** chorebagan and Barrabazar ! Make money, my Boy, make money ! If I haven't done something in the literary line, if I do possess talents, I have not the means of cultivating them to their utmost content and our nation must be satisfied with what I have done. [১২৫] নিজের কার্তি এবং ব্যর্থতা সম্পর্কে ইহাই মধুর নিজের বিশ্লেষণ আর ইহাই সত্য বিশ্লেষণ। প্রমথনাথ বিশী মহাশয় তাঁহার 'মধুসূদনের জাবনভাষ্য' গ্রন্থে অর্থকে যে প্রাধান্য দিয়াছেন, তাহা, এই জন্য, মধুসূদন সম্পর্কে, সত্য নয় ; আপাতদৃষ্টিতে যতই সত্য বলিয়া মনে হউক না কেন।

মাদ্রাজে জীবনের তিক্ততার সবটুকুই মধুসূদনের পানপাত্রে আসিয়া জমা হইয়াছিল। জীবনের কুশ্রী ভিত্তিমূল তাঁহার দৃষ্টির সামনে অবারিত হইল। যাহা কিছুর জন্য তিনি স্বজন সম্পদ ও স্বদেশ ত্যাগ করিয়া আসিলেন সেই সব কিছুই হাত ফসকাইয়া যাইতে লাগিল। কতবার তিনি এই সময়ে আশার ছলনার কথা বলিলেন :

When thou, O ! gentle charmer, Hope ! art nigh ! [১২৬]

অথবা

Ah ! fly false hope ! why soothe to dream
of things that cannot be,
And dazzle but a while, to leave
In gloom and misery ! [১২৭]

শেষ পর্যন্ত বলিয়া উঠিলেন :

Richard (মাদ্রাজের বন্ধু) ! there is a grief which few can feel ;
It cuts into the bosom's deepest core,
And with un-wearied fingers aye doth steal
Its Summer gladness, and its faery store
Of hopes and aspirations···
The heart is as a tideless sea, [১২৮]

এবং এই grief এর কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া বলিতেছেন :

And such dark grief is his, whose sleepless soul
Strives ; but in vain, to burst the galling thrall
Of circumstance [১২৯]

এই circumstance যে কি তাহা আমরা পূর্ব পরিচ্ছেদে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছি। ইহা হইল তাৎকালিক সামাজিক রাজনৈতিক পরিবেশে ব্যক্তির পৌরুষের, ব্যক্তির পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের বাসনার পরাজয়। এই চেতনাকেই শশাঙ্ক মোহন সেন [১৩০], মোহিতলাল মজুমদার [১৩১] প্রমুখেরা অনতিক্রমণীয় নিয়তির চেতনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

মাদ্রাজে মাতৃভাষার চর্চা ১৮৪৯ সালেই মধু আরম্ভ করিলেন—ইচ্ছা, এইবার তিনি সাধন করিবেন 'the great object of embellishing the tongue of my fathers."। [১৩২] এই উদ্দেশ্যে পৌঁছাইবার জন্য তাঁহার প্রয়োজন ছিল জীবনে এই তিক্ততা ও মোহভঙ্গের। প্রেমও যে তাঁহাকে ফাঁকি দিল, তাহার আংশিক কারণ দারিদ্র হইলেও, আসল কারণ মধুর আত্মকেন্দ্রিকতা —চূড়ান্ত individualism এবং self-absorption। শশাঙ্কমোহন সেন ঠিকই বলিয়াছেন 'সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে তাঁহরে প্রেম আত্মবিলাসের নামান্তর। মাত্র।"[১৩৩] আত্মবিলাসই যে রোমান্টিক চেতনার মূলে রহিয়াছে। "কিন্তু উহা যে একটা Titanic element, ভারতীয় আদর্শে একটা আসুরিক ভাব, তাহাও আমাদিগকে বুঝিয়া লইতেই হইবে।" [১৩৪] এই চেতনা কখনও নিজেকে ছাড়া পরকে বোঝে না— পরকে দেখে কেবল নিজের প্রতিফলন হিসাবে :

> মর্ত্যের মৃত্তিকা মোর
> তাই দিয়ে অমৃত মুরতি যদি সৃষ্টি করে থাকো
> তাহারই আরতি হোক তব সন্ধ্যা বেলা।[১৩৫]

Henrietta সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার সঙ্গে মধুসূদনের বিরোধ বাধে নাই। প্রতিবাদ করিলে হয়ত Rebeccaর দশাই হইত। এই ভাববিলাসী রোমান্টিক নিজের মূল্য সম্পর্কে অতিচেতন। সে কাহারও কাছে পরাজয় ত স্বীকার করেই না ; নিজে হারিয়া গেলে উঠানের দোষ দেয়। Irving Babbitএর উক্তি মধু সম্পর্কে একেবারে হুবহু প্রযোজ্য :

"For though the romanticist wishes to abandon himself to the rapture of love, he does not wish to transcend his own ego. The object with which Pygmalion is in love is after all only a projection of his own genius. But such

an object is not in any propr sense an object at all. There is in fact no object in the romantic universe—only Subject. This subjective love, amounts in practice to a use of the imagination to enhance emotional intoxication, or if one prefers, to the pursuit of illusion, for its own sake" [১৩৬] প্রেমের ক্ষেত্রে মধুসূদন এই illusion বা মায়ারই পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছেন এবং জীবনের বিস্তৃততর ক্ষেত্রেও এই ঐশ্বর্য, প্রাচুয ও আত্মবিকাশের মায়ার পিছনে পিছনে ছুটিয়াছেন। মধুসূদনের প্রতিভা তাই মূলত lyric-ধর্মী, [১৩৬ক] আখ্যানধর্মা নয়।

পিতার মৃত্যু এবং পিতৃ-সম্পত্তি উদ্ধারের একান্ত প্রয়োজনীয়তা যে উপস্থিত হইল ইহাই রক্ষা, তাহা না হইলে মধুসূদন Henrietta কে লইয়া মাদ্রাজে কি যে কারতেন তাহা কল্পনা করাই দুষ্কর। মধুসূদন মাদ্রাজ হইতে পলাইয়া বাঁচিলেন। তাঁহার মন তখন স্বদেশ ও স্ব-ভাষার একান্ত অভিমুখী। স্বদেশের প্রতি টান তাঁহার হিন্দু কলেজে পাঠের সময়েও দেখা গিয়াছিল; শুধু তাহার মধ্যে নয়, তৎকালায় প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান হিন্দু কলেজায়ানদের মধ্যেইঃ "Like many young students of the Hindu College Madhusudan began to write English Verse...love and misanthropy were the favourite themes in those times when Byron's poetry still held the world in thrall, but some patriotic poems, like that on king Porus indicate, that Madhusudan felt for his country like the other young men of his day"।[১৩৭] মাদ্রাজের অভিজ্ঞতা মধুসূদনের মাতৃভাষার প্রতি আকর্ষণকে দৃঢ়তর করিল; প্রস্তুতি ত চলিয়াই আসিতেছিল। হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার সময় নিম্নলিখিত ভাষাগুলি ও তৎ তৎ সাহিত্যে যে পারদর্শিতা অর্জন করিয়া অর্ধস্ফুট বাঙলা সাহিত্যকে মধু সাজাইতে আসিলেন তাহা ইতিপূর্বে, ঐকালে, অন্য দেশে অন্য কেহ করিয়াছেন বলিয়া জানা নাইঃ ইংরাজী, গ্রীক, ল্যাটিন, ফার্সী, ইটালিয়ান, ফরাসী, তামিল, তেলেগু, হিব্রু। তবে রেবেকার সঙ্গে বিচ্ছেদ না হইলে এবং মধুসূদন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য না হইলে বাঙলা সাহিত্য তাঁহাকে ফিরিয়া পাইত কিনা ইহা বলা যায় না। সুযোগ না ঘটিলে, কলিকাতায় ফিরিয়া না আসিয়া তিনি হয়ত ভারতবর্ষেরই কোনো দূরতর অঞ্চলে কিংবা বর্মা, মালয়ে চলিয়া যাইতে পারিতেন। বাঙলা সাহিত্যের ঘুম ভাঙাইবার জন্য তাঁহার প্রস্তুতিই যে প্রথম এবং সার্থক এ সম্পর্কে রমেশ দত্ত যে

মন্তব্য করিয়াছেন তাহা অনুধাবনযোগ্য : Madhusudan was thus the first student of the Hindu College, properly educated in English, who turned to Bengali literature. All the renowned authors who had hitheto served their mother tongue, Iswarchandra Gupta, Aukshoy kr. Dutta, Vidyasagar and others were men who had acquird an imperfect knowledge of English, mostly by their own endeavours. The alumnii of the Hindu College had hitheto looked with contempt on Bengali literature, had written prose and verse in English, had hoped to distinguish themselves in English literature. The truth came like a flash of inspiration to M. S. Dutta that true genius mistakes vocation when it struggles in a foreign tongue. Madhusudan lived to correct his mistakes.[১৩৮]

সুদূর মাদ্রাজে থাকিয়া শুধু বাঙলা ভাষার জন্য নহে, বাঙলা দেশের জন্যও তাঁহার উদ্বেগ যে কি তীব্র ছিল তাহা তাঁহার Visions of the Past নামক খণ্ডকাব্যের বিভিন্ন অংশে পরিস্ফুট। এমন কি বাঙলা দেশে ডাকাতের উপদ্রব সম্পর্কে তিনি তাঁহার সম্পাদিত Hindu Chronicle এ সম্পাদকীয় লিখিতেন এবং সারা ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক খুঁটিনাটি ঘটনা সম্পর্কেও যে তিনি আগ্রহান্বিত ছিলেন তাহা ১৮৪৯ সালে কোহিনুর হারকখণ্ডকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া খণ্ড বিখণ্ড করিবার প্রতিবাদে Hindoo পত্রিকায় তাঁহার প্রবন্ধই প্রমাণ। এই প্রবন্ধ শ্রীরামপুরের Friend of India পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল।[১৩৯]

মাদ্রাজে থাকিতে থাকিতেই পারিবারিক আর দুটি ঘটনা মধুসূদনকে বিশেষ আলোড়িত করিয়াছিল—একটি তাঁহার মাতার মৃত্যু। ইহার ফলে তিনি আরও বেশী একাকী বোধ করিতেছিলেন; আর দ্বিতীয়টি তাঁহার পিতার পুনঃ পুনঃ দারপরিগ্রহ। এই দ্বিতীয় ঘটনাতে তিনি নিজের মাতার অপমানে শুধু যে অপমানিত বোধ করিয়াছিলেন তাহা নহে, বোধহয় আমাদের সমাজ সম্পর্কেই বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার আধুনিক মনে এই ঘটনা তাঁহার পিতার প্রতি সম্ভবত ঘৃণারই উদ্রেক করিয়া থাকিবে। রমেশ দত্ত বলিতেছেন "Madhu sudan's father and mother were no doubt worthy people but young Madhusudan must have contemplated with grief and humiliation the domestic arrangment under which his

mother shared her husband's affection with three other fellow-wives।[১৪০] এবং মধুসূদন ফিরিয়া আসিয়া প্রথম যখন তাঁহার বিমাতা উদ্ভিন্ন-যৌবনা এবং রূপসী হরকামিনীকে অন্নাভাবে ও অযত্নে ক্লিষ্ট দেখিলেন তখন তাঁহার মনস্তাপের অবধি রহিল না। সেই বৎসরেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নেতৃত্বে বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হয়। তাঁহার চিঠিপত্রে তিনি এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের প্রভূত স্তুতি করিয়াছেন। কিন্তু এই আন্দোলনে তিনি কোনো অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা বলা যায় না।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া মধুসূদন দেখিলেন যে বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ প্রমুখেরা শুধু যে বাঙলা ভাষার নানা প্রকারের রূপরচনায় ব্যস্ত আছেন তাহা নহে, বাঙলা ভাষা স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। অসংখ্য পত্র পত্রিকায় সারগর্ভ বিচিত্র প্রবন্ধাদিতে বাঙালীর বলিষ্ঠ অনুসন্ধিৎসার প্রকাশ, বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনের জন্য বহু বিদ্বৎসভার প্রতিষ্ঠা ; বাঙলা নাটকের আবির্ভাবের সম্ভাবনা এবং সর্বোপরি কলিকাতার সমাজে ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের যথেষ্ট সংখ্যাবৃদ্ধি এবং সমাজে প্রতিষ্ঠা—এই সবই তাঁহাকে আশান্বিত করিল। শিক্ষার বিস্তার এবং সমাজ-সংস্কারে বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত সমাজের বিপুল উদ্যম—প্রথম বিধবা বিবাহ এবং তুমুল উত্তেজনা ; স্ত্রী শিক্ষার বিশেষ প্রসার ; ডালহৌসির স্বত্বলোপ নীতির ফলে রাজন্যেরা চটিলেও সারা ভারতে প্রথম জাতীয় ঐক্য-বোধের সূচনা—এই সমস্ত কিছু জটিল আবর্তের কেন্দ্র কলিকাতায় মধুসূদন উপস্থিত হইলেন এবং নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া ধীরে-সুস্থে চারিদিকে চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিবার অবকাশ পাইলেন একটি চাকরী জুটিয়া যাওয়ায়। সাঁওতালবিদ্রোহ বাঙলা দেশে হয় তিনি মাদ্রাজে থাকিতেই। এখন তিনি কলিকাতায় আসিয়া বসিতে না বসিতেই শুরু হইল সিপাহী-বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের ফলে মধ্যবিত্ত বাঙালীর চেতনায় যে জটিল আবর্তের সৃষ্টি হইল তাহাতে মধুসূদনের মনও নিশ্চয়ই আলোড়িত হইয়াছিল। তাঁহার মনকে তৎকালীয় উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সূচীমুখ বলা যাইতে পারে। সেই স্পর্শকাতর মনে ঠিক কি কি ভাবতরঙ্গ উঠিয়াছিল তাহা আজ আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না ; কিন্তু আগের অধ্যায়ে দেখানো হইয়াছে এবং শিবনাথ শাস্ত্রীও তাঁহার পরস্পর-বিরোধী মন্তব্যের দ্বারা ইহা সমর্থন করিয়াছেন যে, সিপাহী-বিদ্রোহকে বাঙালী একেবারেই সমর্থন করে নাই, এই রকম-সরল ভাষায় সেকালের বাঙালীর মনোভাব ব্যাখ্যা করা যায় না। শাস্ত্রী মহাশয়ও একথা স্বীকার করিয়াছেন যে নাড়া খাইয়া বাঙালী আত্মসচেতন হইয়া উঠিয়া স্বদেশানুরাগী হইয়া উঠিল। কেন না মধ্যবিত্ত

নিজের অস্তিত্বের জন্য বৃটিশের মুখাপেক্ষী হইলেও বৃটিশ যে সেই মধ্যবিত্তের পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা না করিয়া অলঙ্ঘ্য বাধারই সৃষ্টি করিয়াছিল ইহা আগেই নির্ণীত হইয়াছে। এই বিদ্রোহের ফলে ভারতবর্ষ ব্রিটিশের খাস তালুকে পরিণত হওয়ায় এবং ব্রিটিশ তাহার পরে আর কোন সমাজকল্যাণ-মূলক কার্যকলাপে হাত না দেওয়ায় বাঙালী মধ্যবিত্তের এই ক্ষোভ, এই অভিযোগ হতাশায় পর্যবসিত হইতে লাগিল। **কবির মনে হইতে লাগিল, ইহাই ভাগ্য, ইহাই নিয়তি**। মানুষের প্রচেষ্টা নিয়তি এমনি করিয়াই পণ্ড করিয়া দেয়। কবি ভাব লইয়া, আবেগ লইয়া কারবার করেন বলিয়া এই ভাব ও আবেগের পিছনে যে কারণগুলি রহিয়াছে **তাহা প্রত্যক্ষভাবে কবি-মানসে পরিস্ফুট না হইতেও পারে এবং মধু-মানসেও হয় নাই। তাঁহার কাব্যের দুর্নিরীক্ষ্য নিয়তি যে ব্রিটিশ-সৃষ্ট পরাধীনতার নিয়তি তাহা কবি হিসাবে তাঁহার বুঝিবার প্রয়োজন হয় নাই।**

ইহার পরেই আসিল ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের নীলের হাঙ্গামা এবং বাঙালী মধ্যবিত্ত কর্তৃক নীলচাষীদের পরিপূর্ণ সমর্থন; হিন্দু পেট্রিয়টে নীলকরদের নীতির তীব্র সমালোচনা। এই ঘটনার প্রতি মধুসূদনের শুধু যে সমর্থন ছিল তাহাই নহে, রীতিমত দরদ ছিল তাহার প্রমাণ নীলদর্পণের অনুবাদ। কথিত আছে যে দিগম্বর মিত্রের বাড়ী বসিয়া মধুসূদন নাকি এক রাত্রিতে নীলদর্পণের অনুবাদ করিয়াছিলেন! ইহা অতিশয়োক্তি হইলেও প্রমাণ করে মধুসূদনের তীব্র সমাজচেতনা ও সামাজিক দায়িত্ব-বোধ। কিন্তু ইহার আগেই মধুসূদন বাঙলা ভাষায় প্রথম সার্থক রোমাণ্টিক নাটক, প্রথম সার্থক প্রহসন এবং তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য রচনা করিয়া ফেলিয়াছেন। মেঘনাদবধ কাব্য রচনার প্রস্তুতি তাঁহার শেষ হইয়াছে।

খ

শর্মিষ্ঠা নাটকের সৃষ্টি-প্রেরণার যে ইতিহাসটুকু আমরা পাই তাহা নিতান্তই বাহিরের ঘটনা। এই গল্প হইতে এবং তিলোত্তমাসম্ভব সম্পর্কেও ঐ জাতীয় গল্প হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পরে মধুসূদনকে সমালোচনা কারিতে গিয়া বলিয়াছিলেন "এখনকার কবিরা যেমন 'এস, একটা এপিক লেখা যাক' বলিয়া সরস্বতীর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া এপিক লিখিতে বসেন প্রাচীন কবিদের মধ্যে অবশ্য সে ফেশিয়ান ছিল না।" [১১]. রত্নাবলী নাটকের রামনারায়ণ তর্করত্নকৃত অনুবাদের বেলগাছিয়া মঞ্চে মহলা দেখিয়া মধুসূদনের মনে জাগিল মাতৃভাষার এই দৈন্যে বিষাদ; তখনই ঠিক করিলেন

একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। মধুসূদনের স্বদেশপ্রেম, যাহার নিদর্শন আমরা তাঁহার হিন্দুকলেজ যুগ হইতেই পাইতেছি, মাদ্রাজে গিয়া যাহা তীক্ষ্ণতর হইয়াছে এবং দেশে আসিয়া বাংলা ভাষার এবং সমাজের দ্রুত উন্নতি দেখিয়া যাহা স্ফুট হইতে চাহিয়া সিপাহী-বিদ্রোহের ফলে নব বল লাভ করিল—তাহাই রহিয়াছে শর্মিষ্ঠার সৃষ্টির মূলে। মধুসূদন যে নূতন কিছু করিবেন সে কথা আমরা সেই ১৮৪১-৪২ সাল হইতেই জানি। নাটক রচনায় সংস্কৃত রীতি পরিহার তাঁহার কীর্তি নয়। তাহা 'কীর্তিবিলাস' ও উমেশ মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ' নাটকে ইহার আগেই হইয়া গিয়াছে। নাটক রচনায় প্রতীচ্য পদ্ধতি অনুসৃত হইতে শুরু করিয়াছে। এমন কি সংস্কৃতের বিধি ভাঙিয়া বাংলায় ট্র্যাজিডি রচনার প্রয়াসও হইয়া গিয়াছে। কিন্তু নাটকের প্রধান কথা যে অভিনেয়তা সেই কথাটি না রামনারায়ণ, না উমেশমিত্র কেহই বুঝেন নাই :—"বাঙ্গালী নাট্যকারে ও দত্তজয়ে এই বিশেষ প্রভেদ যে পূর্ব্বোক্তেরা অভিনয়ে কি প্রকার ফলোৎপত্তি হইবে তাহার বিবেচনা না করিয়া নাটক রচনা করেন; দত্তজ তাহার বিপরীতে অভিনয়ে কি প্রয়োজন; কি উপায়ে অভিনেয় বস্তু সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইবে; এবং কোন প্রণালীর অবলম্বনে নাটক দর্শকদিগের আশু হৃদয়গ্রাহী হইবেক ইহা বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক শর্ম্মিষ্ঠা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।"[১৪২] এবং শর্মিষ্ঠা লিখিতে গিয়া মধুসূদন, কি করিতে যাইতেছেন সে সম্পর্কেও যে সচেতন ছিলেন তাহা নিম্নলিখিত চিঠিতেই স্পষ্ট: "I am aware, my dear fellow, that there will, in all likelihood, be somethieg of a foreign air about my Drama; but if the language be not ungrammatical, if the thought be just and glowing, the plot interesting; the characters well maintained, (এই প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যই রচনার অন্তরঙ্গ সম্বন্ধে প্রযোজ্য, বহিরঙ্গ সম্পর্কে নয়। এই অন্তরঙ্গের দিকে চোখ ফিরাইতে প্রথম বিদ্যাসাগরই বলেন; এবং ইহাই নবযুগের রসবোধের বৈশিষ্ট্য।) what care you if there be a foreign air about the thing? Do you dislike Moore's poetry beeause it is full of orientalism? Byron's poetry for its Asiatic air? Carlyle's prose for its Germanism? Besides, remember, that I am writing for that portion of my countrymen who think as I think, whose minds have been more or less imbued with western ideas and modes

of thinking; and that it is my intention to throw off the fetters forged for us by a servile admiration of everything Sanskrit.

Do not let me frighten you by my audacity. I have been showing the second act, already complete, to several persons totally ignorant of English, and I do assure you, upon my word, that they have spoken of it in terms so high···

In matters literary, old boy, I am too proud to stand before the world in borrowed clothes·········

Don't let thy soul be perturbed, old cock, for I promise you a play that will astonish the old (rascals) in the shape of Pandits·········"[১৪৩] মধুসূদন সচেতনসভাবেই সাহিত্যে বিপ্লব সংঘটিত করিতেছিলেন। পরে মেঘনাদবধ রচনার সময় তিনি সদম্ভে বলিয়াছিলেন যে তিনি 'tremendous literary rebel.'[১৪৪] শর্মিষ্ঠায় এই বিপ্লব তিনি ঘটাইলেন দুটি স্তরে :—১। আঙ্গিক ২। বিষয়বস্তু

(১) আঙ্গিকের দিক দিয়া মধুসূদন সংস্কৃত নাটকের গঠনপ্রণালী কিছুই গ্রহণ করেন নাই; তাঁহার গর্ভাঙ্ক ইংরাজী sceneই বটে; অঙ্ক সেনেকা বা এলিজাবেথীয়দের অনুকরণে ৫টি; অতিপ্রাকৃত যাহা আছে তাহা শেক্সপীয়র অপেক্ষাও অল্প; ৪র্থ অঙ্কে সন্ধিস্থল (climax); পঞ্চমাঙ্কে সমাধান। সমগ্র নাটকটি সম্পূর্ণভাবে অভিনয়যোগ্য; এলিজাবেথীয় নাট্যকলার প্রথম যুগে যেমন প্রত্যক্ষ নাট্যের বদলে পরোক্ষ বিবরণ-দানই চলিত শর্মিষ্ঠাতেও তাহাই ঘটিয়াছে। এই শেষটিই হইল নাটকের ত্রুটি। ভাষায় সংস্কৃতের স্পর্শ কিছু বেশী এবং উপমা-উৎপ্রেক্ষা (কোন কোন স্থলে বেশ দীর্ঘ) প্রচুরই বলা চলে; তবু এ ভাষা মনোহর। যে উচ্ছ্বাসটুকু এখনও রহিয়াছে তাহা কৃষ্ণকুমারীতে হাত দিবার আগেই চলিয়া যাইবে। তাহা ছাড়া মনে রাখিতে হইবে যে কয়েকমাসের মধ্যেই মধু প্রহসন দুটিতেও হাত দিয়াছিলেন। ঐ প্রহসনের ভাষা ঐ যুগে যাঁহার হাত দিয়া বাহির হইয়াছে তাঁহার ভাষার উপর অধিকার লইয়া আর কিছু বলা চলে না। তাঁহাকে শুধু ভাষার যাদুকরই বলিতে হয়।

(২) বিষয়বস্তুর দিক হইতে ইহাই বাংলা সাহিত্যে প্রথম রোমান্টিক ট্র্যাজি-কমেডি। এই নাটকের বীজ হইল প্রথম দর্শনেই প্রেম (love at first sight) এবং একনিষ্ঠ প্রেমের সম্ভাব্যতা বিচার। শেক্সপীয়রও

A Midsummer Night's Dream, All's Well That Ends Well, Twelfth Night প্রভৃতি নাটকে এই বিশেষ দুটি বিষয়কেই গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত মধ্যযুগীয় নারী-পুরুষ সম্পর্কের যে পরিবর্তন রেনেসাঁ যুগে হইল তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে এই দুইটি বিষয়ের নাট্যে আবির্ভাবের ঘটনাটি দেখিতে হইবে এবং সেই অর্থে এই দুইটিই হইল আধুনিক বিষয়বস্তু— ব্যক্তি-স্বাধীনতার এবং নারীর সামাজিক অধিকার স্বীকৃতির ফল। সুকুমার সেন মহাশয়ের মতে ইহার বীজ সখী সপত্নীর 'সৌভাগ্যের' ঈর্ষা। কথাটির ঠিক অর্থবোধ হইল না। আর সখী-সপত্নীর ঈর্ষা বলিতে সেন মহাশয় কি সপত্নীভূত সখীর প্রতি ঈর্ষা বুঝাইতে চাহিতেছেন? দেবযানীর শর্মিষ্ঠার প্রতি ঈর্ষা? তাহা হইলে সৌভাগ্যে ষষ্ঠী বিভক্তি কেন? না কি তিনি বুঝাইতে চাহিতেছেন সখী আর সপত্নীর পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা। সে ক্ষেত্রে সপত্নী কথাটির অর্থ হয় না। তাহা ছাড়া শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীর পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা মহাভারত উপখ্যানের বিষয়বস্তু হইতে পারে; উহা মধুসূদনের নাটকের নয়। শর্মিষ্ঠা নাটকের বিষয়বস্তু হইল যযাতির একনিষ্ঠার অভাবে দেবযানীর মনোবেদনা এবং তাঁহার স্খলনের কারণ হিসাবে শর্মিষ্ঠার প্রতি ক্রোধ। দেবযানীর চেতনায় তাই অপমান-বোধই হইল প্রধান। তাঁহার নারীত্বকে, নারী হিসাবে তাঁহার ব্যক্তিত্বকে যযাতি অপমান করিয়াছেন। অপরপক্ষে যযাতি মধুসূদনের নাটকে নায়ক হইলেও, আসলে পৌরাণিক চরিত্র বলিয়া তাঁহার মধ্যে মধুসূদন দেখাইতে পারিয়াছেন একনিষ্ঠার সঙ্গে বহু-বল্লভতার দ্বন্দ্ব। যযাতি দুষ্মন্তের ছাঁচে ঢালা। কিন্তু নারী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি একনিষ্ঠায় বিশ্বাসী, বহুবিবাহের একান্ত বিরোধী (নিজের পিতাকে সে জন্য তিনি কখনও ক্ষমা করেন নাই), প্রেমের আধুনিক সংজ্ঞায় আস্থাশীল মধুসূদন যযাতির মত চরিত্রের প্রতি সহানুভূতিশীল হইলেন কেমন করিয়া? কালিদাসের দুষ্মন্ত এমন চোখের উপর দুইটি নারীকে একের পর এক ভালোবাসিয়া একনিষ্ঠার অসম্ভাব্যতা সূচিত করেন নাই। যযাতি দেববানীকে ভালবাসিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন; আবার সে ভালোবাসা ক্ষীণ হইল কি হইল না বুঝিতে পারিবার আগেই শর্মিষ্ঠাকে প্রণয় নিবেদন করিতে শুরু করিলেন। তিনি কি একই সঙ্গে দুইজনকে কামনা করিতে লাগিলেন? না ইহা মধুসূদনের নিজের জীবনেরই প্রতিফলন। রেবেকাকে তিনি কি সত্যই ভালবাসিয়াছিলেন? কিন্তু পরে যখন লিখিলেন—প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সুখে

কি ফল লভিলি?

তখন কিন্তু Henriettaকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেছিলেন। এই দুই নারী পর পর তাঁহার জীবনে আসিয়া কি দেবযানী আর শর্মিষ্ঠার রূপ পরিগ্রহ করিল ? এবং যে সমাধান তিনি জীবনে করিতে পারেন নাই তাহাই নাটকে করিলেন, সপত্নীদের মিলন ঘটাইয়া ? না কমেডি লিখিতে হইবে বলিয়াই পূর্বতন বিষয়বস্তুর চাপে পড়িয়া এই মিলন ঘটাইতে বাধ্য হইলেন ? আর যযাতি কি দেবযানীকে গ্রহণ করিলেন শুক্রচার্যের ভয়ে ? না হইলে শর্মিষ্ঠাকেই গ্রহণ করিতেন দেবযানীকে পরিত্যাগ করিয়া ? মোট কথা মধুসূদন একনিষ্ঠ প্রেমের অবতারণা করিয়াও শেষ পর্যন্ত আপোষ করিলেন। 'যযাতেরিব শর্মিষ্ঠা ভর্তুর্বহুমতা ভব'—ইহা সত্য হইয়াও হইল না। পূর্বতন বিষয় বস্তুর লোকগ্রাহ্যতা, হয়ত বা স্বকীয় অভিজ্ঞতার অনুরোধেই মধুসূদন শর্মিষ্ঠা নাটকে যতখানি করিতে চাহিয়াছিলেন ততখানি করিতে পারিলেন না। কিন্তু প্রেমে একনিষ্ঠতাই যে এই নাটকের সমস্যা তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠে মহাভারতের দেবযানীর সম্পূর্ণ পরিবর্তনে। মহাভারতে শুক্রাচার্যের কাছে দেবযানীর যযাতির বিরুদ্ধে অভিযোগের কারণ হইল যযাতি তাঁহাকে দিয়াছেন দুইটি পুত্র আর শর্মিষ্ঠাকে দিয়াছেন তিনটি পুত্র। ইহা একেবারে সপত্নীর ঈর্ষা। কিন্তু মধুসূদনের নাটকে দেবযানীর অভিযোগ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাহা হইল, "সে দুশ্চারিণী দৈত্যকন্যা শর্মিষ্ঠাকে গান্ধর্ব বিধানে পরিণয় করে আমার যথেষ্ট অবমাননা করেছে।" পরে অবশ্য আছে, "তবে কি আপনার দুহিতা চিরকাল সপত্নী-যন্ত্রণা ভোগ করবে ?" কিন্তু ইহা শুধু সপত্নীর প্রতি ঈর্ষা নহে। ইহা দেবযানীর প্রেমের অবমাননায় বেদনা। তাই শুক্রাচার্য যখন বলিতেছেন, "ক্ষত্রিয় রাজার সহিত যখন তোমার পরিণয় হয়েছিল, তখন আমি জানি, যে এরূপ ঘটনা হবে, তা পূর্বেই এ বিষয়ের বিবেচনা উচিত ছিল," তখন দেবযানী কোনো সান্ত্বনা না পাইয়া, বা ইহাকে একেবারেই মানিয়া না লইয়া বলিতেছেন, "তাত ! তবে আমাকে আজ্ঞা করুন, আমি যমুনাসলিলে প্রাণত্যাগ করি।"

আর যযাতি মধুসূদনের কাছে সমস্যা—যেমন সমস্যা Shakespeare এর কাছে Demetrius তাঁহার A Midsummar Night's Dream নাটকে। কিন্তু Shakespeare অতিপ্রাকৃতের সাহায্যে সমস্যার যে বলিষ্ঠ এবং একমাত্র সমাধান দিয়াছেন সে সমাধান, অতিপ্রাকৃতকে ব্যবহার করিয়াও, মধু দিতে পারেন নাই। তিনি শেষ পর্যন্ত শর্মিষ্ঠা আর দেবযানীকে যযাতির দুই পাশে বসাইয়াছেন। যে মধুসূদন নিজেকে literary rebel বলিতেছিলেন তাঁহার কীর্তির এই ত্রুটির মূল কারণ সমাজ-মানসে

পুরাতনের প্রকোপ। **প্রতিক্রিয়া আর প্রগতিশীলতার যে বিরোধ যুগের একটি বৈশিষ্ট্য হিসাবে আগেই উল্লেখ করা গিয়াছে, শর্মিষ্ঠা নাটকের এই দুর্বলতা, সেই বিরোধেরই প্রকাশ মাত্র।** ইহা সত্ত্বেও ভাষায়, ভাবে এবং আঙ্গিকে শর্মিষ্ঠাই বাংলাভাষায় প্রথম সার্থক আধুনিক নাটক। তবে শেষে এই সন্দেহ মনে থাকিয়া যায় যে দেবযানীর প্রতি রাজার অনুকম্পা (বা স্নেহ) শুক্রাচার্যের অভিশাপের ভয়ে নয় ত? কেন না শর্মিষ্ঠা সমস্ত সংবাদ শুনিয়া ত্রাসে, যযাতিকে যখন দেবযানীর অনুসরণে দৈত্যপুরে যাইতে মিনতি করিতেছেন তখন যযাতি বলিতেছেন, "প্রিয়ে, আমি সকলই জানি, কিন্তু তোমাকে একাকিনী রেখে আমি দৈত্যদেশে ত কোনমতেই গমন কত্তো পারি না। ফণী কি শিরোমণি কোথাও রেখে দেশান্তরে যায়?" শুক্রাচার্যের ভয় না থাকিলে যযাতি স্বেচ্ছায় পতিগৃহত্যাগিনীকে কি আবার গ্রহণ করিতেন? বিশেষ জরা আক্রমণ না করিলে?

কিন্তু একনিষ্ঠ প্রেমের জয়গান করিতে গিয়া যযাতি দেবযানীকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিলে কি নাটক চলিত, না অভিনীত হইত। নির্মিত ঐতিহ্যকে নির্মীয়মান নূতন ঐতিহ্য অস্বীকার করে না, বরং গ্রাস করিয়া নূতন পথে চলে। মধু তাহাই করিয়াছেন।

(গ)

নাট্যকলার ক্ষেত্রে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিতে গিয়া মধুসূদনের মনে বারে বারে নিশ্চয়ই উঁকি দিয়াছিল ইংলণ্ডের রেনেসাঁ যুগের নাট্যকলা এবং ব্ল্যাঙ্ক ভার্সের কথা। কিন্তু সে কথা পরে।

১৮৬০ সালের গোড়াতেই প্রহসন দুইখানি পাইকপাড়ার রাজাদের ব্যয়ে মুদ্রিত হয়। হিসাব করিলে দেখা যায় যে তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মধুসূদন এই প্রহসন রচনায় হাত দেন। দুইখানি প্রহসন এক সঙ্গে পাঠ করিলে এবং উহাদের একখানিও যে তখনও অভিনীত হয় নাই এই কথা মনে রাখিলে বুঝিতে পারা যায় মধুসূদনের সমাজ-চেতনা শুধু প্রবল নয়, কত সূক্ষ্ম এবং যুক্তিনিষ্ঠ ছিল। পানদোষের তীক্ষ্ণ সমালোচনা 'একেই কি বলে সভ্যতা'-তে থাকিলেও, দুটি প্রহসনের মূল কথা ভণ্ডামির মুখোস খুলিয়া দেওয়া—তথাকথিত নব্যের ও সমাজ-শাসক প্রাচীনের। যে নবজীবনের আলোকে নব্যবঙ্গের সার্থক পুরোধারা নিজেদের জীবনের দীপ জ্বালাইয়া লইয়াছিলেন তাহার মূল কথাই হইল সত্য আচরণ—জীবনের বহিরঙ্গকে প্রাধান্য না দিয়া অন্তরঙ্গকে প্রাধান্য দেওয়া—কথায় ও কাজে

যুক্তনিষ্ঠা ও সত্যানুরাগ। এই সত্যনিষ্ঠা না থাকিলে স্বাধীনতায় কোনো অধিকার ব্যক্তির থাকা উচিত নয়। নূতন সভ্যতার নামে মিথ্যাচরণ করে যে নব-বাবু আর প্রাচীন পবিত্রতার নামে মিথ্যাচরণ করে যে সমাজের জমিদার—এই দুই প্রকারের কপটকেই মধুসূদন আমাদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। সত্য বলিতে কি ইংরাজীতে যাহাকে farce বলে সেই অর্থে এই নাটক দুইখানিকে যে কেন প্রহসন বলা হয়, এবং মধুই বা কেন এই নামে উহাদের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা বুঝা যায় না। ইংরাজীতে বেন জনসনের ব্যঙ্গাত্মক নাটক (Satire যথা Everyman in His Humour, Volpone, the Alchemist) কিংবা শেরিডানের ব্যঙ্গ-নাটক (The Rivals, the School for Scandal) এমন কি গোল্ড-স্মিথের ঐ জাতীয় নাটক (She Stoops to Conquer)—ইহাদের সঙ্গেই কি মধুসূদনের নাটক দুইখানি তুলনীয় নয়? কারণ ইহাদের লক্ষ্য হাস্যরস হইলেও ইহাদের বিষয়বস্তু মানুষের চারিত্রিক ত্রুটির ব্যঙ্গ। অর্থাৎ বিষয়বস্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। Farce বা প্রহসনে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার যে লঘু ত্রুটিগুলি যে লঘু অথচ উচ্চ হাস্যের খোরাক যোগায়, বেন জন্‌সন্ বা মধু কেহই সেই লঘুরসের অবতারণা করেন নাই। এবং তাহা বুঝিয়াই ঐ জাতীয় ইয়ং বেঙ্গলেরা পাইকপাড়ার রাজাদের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়া ঐ নাটকখানির (একেই কি বলে সভ্যতা?) অভিনয় বন্ধ করিয়াছিল। মধু নিজেও চিঠিতে লিখিয়াছিলেন ঃ—

'I half regret having published these two things. You know that as yet we have not established a national theatre, I mean, we have not as yet got a body of sound, classical dramas to regulate the national taste and therefore we ought not to have farces. [১৪৫]

ফার্স বা প্রহসন কখনও এত গুরুতর ব্যাপার হইয়া উঠিতে পারে না। জানি ১৮৭৬ সালে একখানি খুব স্থূল প্রহসন লইয়াই জল এতদূর গড়াইয়াছিল যে Dramatic Performances Act চালু করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সেই ব্যাপারে সরকার জড়িত ছিল। তাহা না হইলে ঐ সামান্য প্রহসনের আলোড়ন আপনিই মিলাইয়া যাইত। সত্য বলিতে কি, আমরা কি মধুসূদনের নাটক দুইখানিকে 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' অথবা 'চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে' অথবা 'বুঝলে কি না'-র সঙ্গে এক শ্রেণীতে ফেলিতে রাজী আছি? তাহা যদি না থাকি তাহা হইলে ঐ দুইখানিকে বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক প্রতীচ্য-

ভাবাপন্ন কমেডি বলিতেই হইবে। মধুসূদন তাঁহার কমেডিতে জাতীয়-জীবনের প্রধান যে ত্রুটি ভণ্ডামি তাহাকেই ব্যঙ্গবিদ্ধ করিয়াছেন এবং যে বহিরঙ্গ-সর্বস্বতা প্রকৃত, গুণার্জনের বিরোধী, নবজীবন-বেদের বিরোধী, যাহা জাতিকে চিরকাল দুর্বল ও অনুকরণচিকীর্ষু করিয়া তুলিয়া মেরুদণ্ডহীন, প্রকৃত পরিবর্তন-বিমুখ করিয়া তোলে তাহারই নির্মম সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার কমেডিতে Golden Mean—অর্থাৎ বেশী আধুনিকতাও খারাপ আবার বেশী রক্ষণশীলতাও খারাপ এবং মধ্যপন্থাই গ্রহণীয়—এই রকম কোনো প্রচারের বাসনা ত দূরের কথা, এই মধ্যপন্থার দর্শনের কাছ দিয়াও যান নাই। 'বুড়ো শালিক'নাটকে পঞ্চানন বাচস্পতি ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ; এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা'তে কর্তামহাশয় —ইঁহারা দুইজনেই পুরাতনপন্থী। তবু ভক্তবাবু আর নববাবুর তুলনায় তাঁহাদের চরিত্র মহত্তর। প্রধান কথা সেইজন্য 'মধ্যপন্থা' নয়, প্রধান কথা হইল চরিত্রের সততা, নিষ্কাপট্য, ও স্বমতানুযায়ী কর্তব্য করিবার সাহস। লোকে যাহাতে আমার সত্য পরিচয় না পায় এবং লোকে আমার বাহিরটি দেখিয়া যাহাতে ভোলে ইহাই কপটাচারী, আত্মসর্বস্ব-দের একমাত্র চিন্তা —সে তাহারা রক্ষণশীলই হউক আর তথাকথিত নব্যপন্থীই হউক। জাতীয় চরিত্রের এই অধঃপতনের বিরুদ্ধেই মধুসূদনের জেহাদ, কেনো মধ্যপন্থা অনুসরণের জন্য নয়।

আর এক কথা : বুড়ো শালিক নাটকে সুস্থ, স্বাভাবিক, মাটির কাছাকাছি যে মানুষটিকে মধু আঁকিয়াছেন সে একজন মুসলমান কৃষক এবং যে মেয়েকে কেন্দ্র করিয়া নাটকীয় ঘটনা ঘটিতেছে সে একটি মুসলমান রমণী। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের রাগের মূল কারণও বোধহয় এইখানে। ভক্তপ্রসাদ বাবু হিন্দু হইয়া চরিত্রহীন আর হানিফ মুসলমান হইয়াও চরিত্রে মহত্তর। তাহার উপর ভক্তপ্রসাদের নজর গিয়া পড়িল কি না এক মুসলমানীর উপর। বিশেষ করিয়া সেই যুগে যখন হিন্দুকলেজে মুসলমানের প্রবেশ কিছুকাল আগেও নিষিদ্ধ ছিল। অথচ মধুসূদনের চোখ গিয়া পড়িল, এই উপরিতলের জাতিপ্রথা ভেদ করিয়া, তলদেশের শোষক আর শোষিতের ভিত্তিমূলক সমস্যাটির উপর। তাঁহার কাছে ভক্তপ্রসাদ অত্যাচারী, লম্পট জমিদার, যে মুখে হিন্দুয়ানী বজায় রাখিয়াই পরিতৃপ্ত, শিকারের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানে সমান রুচিই দেখাইয়া থাকে। আর হানিফ শোষিত মানুষের হইয়া লড়িয়াছে এই নাটকে। মধুসূদনই আমাদের দেশে প্রথম প্রকৃত স্রষ্টা যিনি জাতিভেদের নাগপাশ সম্পূর্ণ

কাটাইয়া উদার মানবতার পাদপীঠে দাঁড়াইয়া হিন্দুমুসলমানকে দেখিয়াছেন—এবং তাহা আবার সিপাহীবিদ্রোহের পরে। দীনবন্ধুর তোরাপের জনক হইল মধুসূদনের হানিফ গাজী।

সর্বশেষে বিবেচ্য এই নাটকদ্বয়ে ভাষার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন। মধুসূদনের আগে, কিছু কিছু ব্যঙ্গাত্মক রচনায় এবং বিশেষ করিয়া উমেশ মিত্রের বিধবাবিবাহ নাটকে কথ্য ভাষার প্রয়োগ ঘটিয়াছে কিন্তু মধুসূদন যাহা করিলেন তাহা অভাবিতপূর্ব। হুগলি-চব্বিশপরগণার কথ্য ভাষা যথোচিত মার্জনানন্তর মধুসূদনের হাতে যে রূপ পরিগ্রহ করিল তাহারই অতি-নাগরিক রূপ দেখিতে পাই হুতোমে। কথ্যভাষার এই শক্তি মধুসূদনের আগে অপ্রকট ছিল। ইহাতে ঘটিল ভাষার সম্পূর্ণ গণতন্ত্রীকরণ; কিন্তু প্রকৃত প্রগাঢ় ও ধ্বনিগম্ভীর লেখার জন্য মধুকেই আবার উদ্ভাবন করিতে হইয়াছিল মেঘনাবদধের বা তাহার পূর্বেই (প্রহসনগুলির আগেই) তিলোত্তমাসম্ভবের ভাষার। স্বরের উচ্চ-নীচ দুই গ্রামেই যাহাদের গলা সাধা তাহারাই কেবল স্বরের পরিপূর্ণ ধনভাণ্ডারের পরিচয় রাখে এবং উদ্ঘাটন করিতে পারে। মধুও তেমনি প্রাকৃত এবং অভিজাত—ভাষার দুই রকম প্রয়োগেই সিদ্ধিলাভ করিয়া মেঘনাদবধে হাত দিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসা করি কোন বাঙালী সাহিত্যিক (রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত ধরিয়া) ভাষার এই সর্ববিধ প্রয়োগে এমন পটুত্ব দেখাইয়াছেন? রবীন্দ্রনাথের ভাষা সর্বথা কাব্যময়—হানিফ গাজীর ভাষা তাঁহার আয়ত্তের বাহিরে।

এই তিনখানি কমেডি একাধারে মধুসূদনের তীব্র সমাজ-চেতনা ও প্রেমের ক্ষেত্রে নরনারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আকুলতা প্রকাশ করিতেছে। তীব্র সমাজচেতনা সেকালের নাট্যসাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং বিধবাবিবাহ লইয়া যত নাটক লেখা হইয়াছে সেগুলির সবই এই সমাজ-চেতনার আয়নায় ভণ্ডামির প্রতিফলন দেখাইতে যত্নশীল। কিন্তু মধুসূদনের মত আর কেহই মূল কথাটি ধরিতে পারেন নাই। উমেশ মিত্র ট্র্যাজিডি লিখিয়াছেন; করুণা জগাইয়াছেন; কিন্তু ভক্তপ্রসাদের মত ভণ্ডেরাই যে আসলে সমাজ সংস্কারের পথে বাধা ইহা মধুসূদনের আগে কেহই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই--অন্তত নাটকে নহে। মধুসূদন যে rational philosphy of life (যুক্তিবাদী জীবন-দর্শন) এর ভিত্তিভূমিতে দাঁড়াইয়া আক্রমণ করিয়াছেন তাহা আর কাহারও ছিল না বলিয়াই, অন্যেরা 'ইয়ং বেঙ্গলকে' গালি দিতে ত্রুটি না করিলেও, একমাত্র মধুসূদনের নাটকেই, সেই ইয়ং বেঙ্গল নামধারীরা তটস্থ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

আর প্রেমের ক্ষেত্রে শর্মিষ্ঠা-যযাতি theme নিঃসন্দেহে স্বনির্বাচনের ভিত্তিতে একনিষ্ঠ প্রেমের সূচনা—সে দেবযানী-শর্মিষ্ঠার প্রতি দ্বৈত অনুরাগ সত্ত্বেও। অপর পক্ষে, এ নাটকেও যে দৈত্যরাজবালা শর্মিষ্ঠা ঋষিকন্যা দেবযানীকে পরাভূত করিল ইহা, মধুসূদনের শিল্পকথার পরবর্তী অধ্যায়ের কথা মনে রাখিলে, নিঃসন্দেহে একটি বিশিষ্ট ঘটনা। নাটকের নাম শর্মিষ্ঠা, এবং উৎসর্গও করিয়াছেন 'দৈত্যরাজবালাকে'। বোধ হয় ঐ সহস্র বৎসরের দাসীত্ব আর দৈত্যকুলে জন্ম-হেতু স্বভাবনীচতা—এই দুটি প্রাচীন অমানবীয় (non-humanistic) প্রথাই মধুসূদনের বিপ্লবী চেতনাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য

মানবীয় অধিকারে বঞ্চিতা শর্মিষ্ঠার প্রতি যেমন মধুসূদন আকৃষ্ট হইয়াছিলেন তেমনি আকৃষ্ট হইলেন দানবদ্বয় সুন্দোপসুন্দের প্রতি। রাজনারায়ণ বসু এই কাব্যে ইন্দ্রের চরিত্র সম্বন্ধে ঠিক কি মন্তব্য করিয়াছিলেন জানি না কিন্তু তাঁহার সমালোচনার উত্তরে মধুসূদন ইন্দ্রের পক্ষে ঝোল টানিবার চেষ্টা করিয়াও বলিতেছেন, "You are unjust to Indra. He is a very heroic fellow, but he cannot resist 'Fate'. Perhaps your partiality for the two brothers has slightly, embittered your feelings against the poor king of the gods. **I myself like those two fellows,** and it was once my intention to have added another book to place them more conspicuously before the reader"[১৪৬] ইন্দ্র এবং নিয়তির প্রশ্ন আলাচনা না করিয়াও বলা চলে যে **মধুসূদনের সহানুভূতি সুন্দ এবং উপসুন্দের উপরেই। আগেও দেখিয়াছি দৈত্যরাজবালার উপর তাঁহার টান। পরেও দেখিব মেঘনাদ ও রাবণের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি।** এই গতানুগতিকতা-বিরোধী, দৈত্য এবং রাক্ষস-প্রীতি মধুসূদনের জীবনদর্শনের একটি মূলীভূত তত্ত্বের বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র।

পৌরাণিক ঐতিহ্য বলে সুন্দোপসুন্দ দৈত্য অতএব যেন কেন প্রকারেণ বধ্য ; এক দৈত্যকুলে জন্মই তাহাদের সকল কৃতিকে বিনাশ করিতেছে : জন্মের দোষে তাহাদের পৌরুষ ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। এই সামাজিক কৌলিন্য-প্রথাই মহাভারতের কর্ণকে তাঁহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছে—তিনি মমায়ত্তং হি পৌরুষং বলিয়া ছটপট করিয়াও সে সামাজিক নিয়তির হাত হইতে রেহাই পান নাই। প্রাচীন যুগের এই জাতি-কৌলিন্য ও বর্ণ-কৌলিন্য যাহা ব্যক্তির সামর্থ্যকে ডুবাইয়া দেয় পিতৃপরিচয়ের তলায় তাহার বিরুদ্ধেই ব্যক্তিস্বাধীনতার পুরোহিত মধুসূদনের জেহাদ। ব্যক্তি যাহা করে নাই তাহার জন্য তাহাকে দায়ী করা একান্ত অন্যায় বলিয়া তিনি মনে করেন ; আবার তেমনিই চাহেন ব্যক্তি যাহা করিতে সামর্থ হইয়াছে শুধু সেইটুকুর জন্যই তাহাকে বিচার করিতে। **তাই পৌরুষই মধুসূদনের কাছে ব্যক্তির মূল্যবিচারের মাপকাঠি, ধার্মিকতা নহে।** সে যুগের যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদের প্রথম উচ্ছ্বাসের পট-

ভূমিকায় আচার-সর্বস্ব অদৃষ্টমানা, দুঃখবিলাসী ধার্মিকতাকে 'ভণ্ডামি ও ভীরুতা' বলিয়া যদি মনে হয় তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে ? যে রসিককৃষ্ণ আদালতে সাক্ষী দিতে গিয়া তামা-তুলসী-গঙ্গাজলের পবিত্রতায় বিশ্বাস করিবার কারণ খুঁজিয়া পান নাই তিনিই পারে পরম বৈষ্ণব হইয়া উঠিয়াছিলেন ; আর প্যারীচাঁদ হইয়া গেলেন Theosophist ; কিন্তু তাঁহাদের জীবনের সেই যে প্রথম উন্মাদনা— এ্যাকেডেমিক এ্যাসোসিয়শনের সেই ক্ষুরধার যুক্তিশীলতা ও অক্ষয়কুমারের বেদের অপৌরুষেয়তায় প্রমাণাভাবে অবিশ্বাস ; Quill পত্রিকায় একদিকে পাদরি কৃষ্ণমোহনকে আর অন্যদিকে ব্রাহ্ম দেবেন্দ্রনাথকে, যুক্তিহীনতার অভাবের জন্য, আক্রমণ ; সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-সংস্কারের মাধ্যমে, স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের দ্বারা ব্যক্তির জীবনকে সুখী করিবার যে আন্তরিক প্রচেষ্টা—সেযুগের মানবতাবাদের ও ব্যক্তিস্বাধীনতাবাদের সেই তীক্ষ্ণ চেতনাই মধুসূদনকে পৌরুষের পূজারী করিয়াছে। জীবনে করণীয় যাহা কিছু সবই পৌরুষসাধ্য বলিয়া তখন মনে হইতেছে এবং যাহারা স্ব-পৌরুষের বদলে দেব বা অদৃষ্ট বা ধর্মকেই আশ্রয় করিয়া, সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে বা মহৎ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে তাহাদের প্রতি অবজ্ঞাই তখন পৌরুষাভিমানী মধুসূদনের কাছে সমীচীন বলিয়া মনে হইতেছে। তাই ধর্মাশ্রয়ী, ধাতার কৃপাপ্রার্থী ইন্দ্রের বদলে পৌরুষাশ্রয়ী সুন্দোপসুন্দ মধুসূদনের কাছে প্রেয়ান ও শ্রেয়ান। তাহারা দৈত্য বলিয়া, এতদিন অপাংক্তেয়ে থাকিয়া আজ আত্মশক্তির বলে উপরে উঠিতে চাহিতেছে বলিয়া, মধুসূদনের কাছে যেন আরও বেশী করিয়া সহানুভূতি দাবী করিতেছে। আমরা পরে দেখিব রাবণ ও ইন্দ্রজিৎকে লইয়া ঠিক এই কারণেই মধুসূদন কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছেন। **বাহুবলে স্বর্গ জয় করিয়াছে যে দৈত্য সেই মহনীয় ; যে ইন্দ্র যুগযুগান্ত ধরিয়া শুধু ধাতার দয়ায় স্বর্গভোগ করিয়া আসিতেছে সে নহে।**

কিন্তু মধুসূদন নিজে বলিয়াছেন যে ইন্দ্র নিয়তিকে এড়াইতে পারেন নাই বলিয়াই সুন্দোপসুন্দ কর্তৃক স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন ; তাঁহার নিজের দোষে নয়। কিন্তু ইন্দ্র দৈত্যদ্বয়কে যে নির্জিত এবং নিহত করিলেন সেও কি নিজের পৌরুষে ? সেও দেব অনুগ্রহে ! বিজয় এবং পরাজয়, পতন এবং উত্থান, সুখ এবং দুঃখ—সবই যদি হয় নিয়তির নির্দেশে তাহা হইলে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বের ভিত্তি সেই দৈব ও দুনিরীক্ষ্য নিয়তি, পৌরুষ নহে। ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব স্বোপার্জিত নহে, স্বোপার্জিত হওয়া সম্ভবও নহে। কিন্তু দৈত্যেরা দৈবের প্রতিকূলতা, দেবতাদের অবজ্ঞা, ধাতার পক্ষপাতিত্ব সব কিছু এক নিজেদের সাধনা ও পৌরুষের বলে মথিত করিয়া স্বর্গে গিয়া অধিকার কায়েম করিল। সেই দৈত্যই ত মূর্ত পৌরুষ।

যে গয়াসুর মৃত্যুকে জয় করিতে চাহিয়াছিলেন, যে রাবণ চাহিয়াছিলেন স্বর্গের সিঁড়ি বসাইতে, যে প্রমিথিয়ুস জীবন সংশয় করিয়া স্বর্গের অতি-সতর্ক প্রহরাকে ফাঁকি দিয়া মানুষের জন্য আগুন আনিয়া দিয়াছিলেন, মানুষ যদি, শাস্ত্রের প্ররোচনা ভুলিয়া, তাঁহাদেরই, পৌরুষের প্রতীক, জাগ্রত ব্যক্তিসত্তার এবং মানবতার স্বার্থে দুশ্চর সাধনার প্রতীক বলিয়া মনে করে, এবং রেনেসাঁ যুগে নবোত্থিত বাঙালীর চেতনার এই কেন্দ্রগ সত্যকে যদি মধুসূদন প্রকাশের চেষ্টা করিয়া থাকেন তবে তিনিই ত যুগন্ধর।

ব্যক্তির জয়গান, তাহার আত্মপ্রসাদের ও বিচিত্র সার্থকতার পথে অবিরাম যাত্রার এই যে উদ্বোধন, ইহা যেমন একদিকের সত্য, **অন্যদিকের সত্য হইল এই 'ব্যক্তির' নিশ্চিত পরাজয়।** সে পরাজয়ের মর্মভেদী বিলাপ আমরা শুনিব রাবণের মুখে। কিন্তু এই তিলোত্তমাসম্ভবেও ত সেই পৌরুষের পরাজয়ই উদ্ঘাটিত হইয়াছে। নিজেদের পাপে নয়, ভীরু ধর্মধ্বজীদের চক্রান্তে পক্ষপাত-প্রবণ ধাতার বিশ্বাসঘাতকতায় সুন্দোপসুন্দের পতন; তাহাও সেই ভ্রাতৃবিরোধের সুযোগে যাহা ঐ চক্রীদেরই কৃত্রিম সৃষ্টি। সুন্দোপসুন্দের ভ্রাতৃপ্রেম স্বর্গীয় বস্তু। দৈত্যের যে ভ্রাতৃপ্রেম শক্তির উৎস তাহাকেই নষ্ট করিয়া তাহাদের ধ্বংস-সাধনের পথ তৈয়ারী করা কি দেবোচিত? সুন্দোপসুন্দ ভ্রাতৃপ্রেম এবং পৌরুষে বলীয়ান; তাহাদের দেব-শত্রুরা পৌরুষে হীন ত বটেই, খোষামোদেও পটু; তাহারা ধাতার অনুগ্রহ অর্জন করে সাধনার জোরে নয়, চাটুকারিতার জোরে।

তাহা হইলে কি পৌরুষ অপেক্ষা নিস্তেজ দৈবানুগত্যই জীবনে সার্থকতার উৎস? পৌরুষ আর নিয়তির এই শাশ্বত বিরোধের হেতু কি? নিয়তি বলিতে মধুসূদন কি বুঝিতেছিলেন? যে নিয়তির বলে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বের লোপ সেই নিয়তির বলেই যদি সুন্দোপসুন্দেরও পতন ঘটে তাহা হইলে আপাতদৃষ্টিতে সেই নিয়তিকে নিরপেক্ষ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু একটু গভীরে প্রবেশ করিলেই আর তাহা মনে হয় না। এ নিয়তি দৈত্যদের পৌরুষের কাছে নতশির হইতে বাধ্য হইলেও যেই তাহারা অর্জনোত্তর প্রতিষ্ঠায় স্থিতি লাভ করে অমনি তাহাদের সর্বনাশ করিতে উদ্যত হয়। ইহার একমাত্র কাম্যই হইল নির্জিত-বীর্য, পরমুখাপেক্ষী কোনও কালের এক শতক্রতুকে চিরদিন স্বর্গের আসনে বসাইয়া রাখা—কোনো পরিবর্তন, পরবর্তীকালের পুরুষকারকে কোনো সুযোগ দিতে এই নিয়তি রাজি নহে। এ নিয়তি আবার হিন্দু-দর্শনের প্রাক্তন নয় কেন না কর্মানুযায়ী ফল দান করা ঈপ্সিত নহে। ইহা কি তবে গ্রীকদের Fate বা নিয়তি? ডাঃ সুকুমার সেন মধুসূদনের পরবর্তী নাটক কৃষ্ণকুমারীতে Greek Fateএর ভাবকল্পনার সন্ধান পাইয়াছেন এবং শশাঙ্কমোহন সেন তাঁহার

মধুসূদনের উপর অনেক বক্তৃতা-মালাতেই অনেক সূত্রে নিয়তি কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। অতএব এ ধারণার মূলানুসন্ধান করা দরকার।

গ্রীকদের Fate বা নিয়তির ধারণার সঙ্গে Golden Mean বা হিরণ্ময় মধ্যপথের ধারণা অঙ্গাঙ্গিবদ্ধ। Golden Meanকে অতিক্রম করিলেই, কোনো দিকে কোনো বাড়াবড়ি করিলেই প্রবৃত্তির হাতে বলগা ছাড়িয়া দিলেই, এই নিয়তি বা Eate (Moirai-Gk) নাকি সেই ছিদ্রপথে প্রবেশ করিয়া নায়কের সর্বনাশ করে। এইরূপ অনেকে মনে করেন। Aristotle তাঁহার Poetics গ্রন্থে নায়কের অবস্থা বিপর্যয়ের কারণ হিসাবে যখন Hamartiaর উল্লেখ করিয়াছেন তখন কিন্তু Fate বা Moirai এর আলোচনা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন: The change in the hero's fortunes must be not from misery to happiness, but on the contrary from happiness to misery; and the cause of it must lie not in any depravity, but in some great error on his part; [১৪৭] অর্থাৎ এই প্রচণ্ড ভুলের কারণ নীতিহীনতা নহে, অন্য কিছু। দেখা যাইতেছে Aristotle Fate বা Necessity বা Moirai সম্পর্কে কিছু বলিতেছেন না; হয়ত ট্যাজিডির গঠনের অলোচনায় এই দার্শনিক তত্ত্বের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই বলিয়া। তবু নাটক আলোচনার ক্ষেত্রে 'বিপর্যয়ের' কারণের আলোচনায় নিয়তির প্রকৃতি বিবেচনা অপরিহার্য। Haigh তাঁহার The Tragic Drama of the Greeks নামক সুবৃহৎ গ্রন্থে, এই প্রশ্ন লইয়া মোটে পাতা কয়েক বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাহার ফলে কোনো স্থির ধারণাই করিতে পারা যায় না ভাগ্য বা নিয়তি বা দৈব সম্পর্কে। তিনি বলিতেছেন, 'There is a universal law of justice, a moral ordinance governing the whole world, to which even he (Zeus) must submit. This law is called by different names—Fate, Destiny, Justice Necessity, but under these various terms some all-embracing rule is denoted as many passages will prove".[১৪৮] কিন্তু বহু নাটকেই এই নীতি প্রয়োগ করিতে না পারিয়া, অনেক ক্ষেত্রে Haigh তাঁহার সিদ্ধান্তের অব্যাপ্তি নির্দেশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি আবার Fateএর সঙ্গে Fury (Erinyes) দেরও যুক্ত করিয়াছেন Zeusএর সর্বময় কর্তৃত্বের মাধ্যমে। শেষ পর্যন্ত তিনি দেবতাদের দুইভাগে ভাগ করিয়া [gods of the upper world এবং gods of the under world, উচ্চস্তরের ও নিম্নস্তরের দেবকুল—Zeus উচ্চস্তরের কিন্তু

Furyরা নিম্নস্তরের] এবং ব্যক্তির পাপ বা অন্যায় পরিবারে এমনকি বংশ-পরম্পরাক্রমেও সঞ্চিত হইতে পারে—ইহাও স্বীকার করিয়া লইয়া Fate বা নিয়তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা কি প্রকারের Justice? পরে Haigh নিজেই বলিতেছেন, "Vengeance of heaven extends still further and falls upon innocent victims, visiting the sins of the father upon the children even to distant generations, When guilt has been once incurred, a curse descends upon the family of the offender, and infects it with an hereditary taint.......The notion of an ancestral curse, which expresses in mythological form the belief in the remote and incalculable effects of sin was one of great antiquity among the Greeks.…A doctrine of this kind, like the somewhat similar modern theory of the transmission of hereditary qualities, if pushed to extremes, could only end in fatalism and despair ; and it has often been snpposed that such in reality was the creed of Aeschylus, and that mankind are represented in his tragedies as the sport of a blind and capricious Destiny, which sweeps innocent and guilty into the same net."[১৪৯] ইহার পরেও অবশ্য Haigh Free will এর অস্তিত্বে আস্থা রাখিবার জন্য অনেক but, though এবং of course এর অবতারণা করিয়াছেন।

আসল কথা হইল এই যে Haigh Greek tragedyকে তৎকালীন সামাজিক বাস্তবের (social reality) প্রতিফলন হিসাবে না দেখিয়া এক চিরন্তন সত্যের বাহন হিসাবে দেখিতে গিয়া ন্যায় ও অন্যায়ের বর্তমান ধারণা Æschylusএ আরোপ করিয়াছেন ; এবং অসুবিধা বুঝিয়া আবার খ্রীষ্টপূর্বীয়, অতএব Pagan চেতনায় Blood for Blood এর তত্ত্বও আবিষ্কার করিয়াছেন ; এবং সেখানেও অসুবিধা বুঝিয়া Æschylus dogmatic (গোঁড়া) হইতে পারেন না এই বিশ্বাস সকলকে করিতে বলিয়াছন। এ কথা Haigh ভাবেন নাই যে তৎকালীয় সামাজিক পরিবেশে জীবন যাপন করিতে গিয়া মানুষ নিয়তি সম্পর্কে যে ধারণা করিয়াছিল, সে যুগেরও আগের যুগের যে ধারণা সে উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইয়াছিল তাহার উপর ভিত্তি করিয়া—তাহার সঙ্গে বর্তমান কালের ধারণা মিলিবে কি করিয়া? Plato তাঁহার Republicএ যে আদর্শ-

রাষ্ট্রের কল্পনা করিয়াছেন আজিকার আদর্শ-রাষ্ট্রের কল্পনা কি তাহার সঙ্গে মেলে? অতএব Æschylus প্রভৃতি গ্রীক নাট্যকরেরা কি সামাজিক পরিবেশে বাস করিতেছিলেন এবং সেই বিশিষ্ট দেশে ও কালে তাঁহাদের জীবনদর্শন কি ছিল তাহা সমাজতত্ত্ব ও তৎকালীন দর্শন এবং বিজ্ঞানের তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা ভিন্ন শুধু সাহিত্য পড়িয়া বুঝিবার উপায় নাই। এই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী না থাকিবার ফলে Haigh একবার নিয়তি ও ন্যায় (Justice)-কে সমার্থক মনে করিয়াছেন, কখনও বা নিয়তিকে চক্ষুর বদলে চক্ষু লইবার তত্ত্ব বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আধুনিক কালে, সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত George Thomson তাঁহার সুবৃহৎ ত্রয়ী Ancient Greek Society, Æshylus and Athens এবং Our First Philisophers-এর স্থানে স্থানে এই নিয়তির তত্ত্ব লইয়া গবেষণার সূত্রপাত করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন: The three Fates—**Moirai** in Greek, **Parcae** in Latin, **Nornen** in German—are still part of the common stock of the European literary tradition. They are the goddesses who sit and spin the thread of human distiny, ordaining for each man at birth the principal events of his life, and especially the last of all—his death·········

The basic meaning of the word **Moira** is a share or portion···With Moira is associated another word, **lachos,** a portion given or received by the process of casting lots. One of the **Moirai** bore the name of **Lachesis,** the goddess of allotment. In this sense **lachos** is synonymous with **Kleros,** which, commonly used of a lot or holding of land, originally denoted a piece of wood used for casting lots···The land was to be distributed by lot among the tribes, and the territory of each tribe was to be subdivided by lot among the families or clans.

In the seventh Olympian, Pindar relates how the island of Rhodes was divided into three Moirai by the sons of Helios····· The same myth, though without mention of Helios and Rhodes, is related in the Iliad. The sons of Kronos divided the world into three **Moirai,** for which

they cast lots, and Zeus was warned by Poseidon that he must keep within his **Moira**······The evidence of mythology is supported by historical tradition. After their conquest of the Peloponnese, the Dorian chieftains divided the country into three portions, for which they cast lots···

Even after its basis in kinship had crumbled away, the tribal system still seemed the necessary foundation for any form of orderd society······The Homeric evidence clearly shows that, while power or privilege was in the gift of the king, land was **in the gift of the people** who bestowed it on their leaders in reward for military services······Booty was distributed in the same way. Just as the island of Rhodes, alloted to Helios, is described by Pindar as his **lachos** or **geras**, his lot or his privilege, so the same terms—**Moira** or **Lachos, Geras** or **time** are applied to the share of the spoils alloted to each warrior...

As it was with land and booty, so it was with food. In ancient times, so Plutarch writes, when meals were administered by **Moira** or **Lachesis** on the principle of equality, every thing was decently and liberally arranged.··· Plutarch goes on to remark that the equality of the common meal was destroyed in course of time by the growth of luxury (he should, rather, have said, by the growth of property) but persisted in the public distribution of meat at state sacrifices······

After the democratic revolution, the use of the lot became an integral element in the administration of the Athenian state, and Greek writers are unanimous in regarding it as a distinctive characteristic of a democratic constitution.····The truth is that ancient democracy was essentially the re-assertion by the common people of their lost equality.....It may therefore be concluded that

in its application to food, booty and land the idea of *Moira* reflects the collective distribution of wealth through three successive stages in the evolution of tribal society. Oldest of all was the distribution of food, which goes back to the hunting period. Next came the disribution of chattels and inanimate movables acquired by warfare, which was a development of hunting ; and last, the division of land for the purposes of agriculture.

The use of the lot was, of course, a guarantee of equality. The goods were divided as equally as possible and then the portions were distributed by a process, which, since it lay outside human control, was impartial. And for the same reason it was regarded as magical, as an appeal to the *Moirai* or spirits of the Lot, who determined each man's portion. With the growth of private property, the use of the lot became increasingly restricted, and the popular conception of the *Moirai* was modified accordingly. They became the goddesses who determine for each man his lot in life.····

The functions of the *Moirai* were not confined to birth. They were also associated with rebirth, with marriage and with death.....

Were the *Moirai* and the *Frinyes* (Furies) originally identical ?····If, as we have suggested, the *Erinyes* were of Aegean origin, their sex is explained by the matrillineal institutions of Pre-Hellenic Greece. The name of the *Moirai,* on the other hand is Indo-European....yet the Indo-European immigrants into Greece were patrillineal. This apparent contradiction can be resolved on the hypothesis that the origin of the *Moirai* lies in the primitive culture of the Indo-European peoples before their dispersal····As ancestral spirits of a matrillineal

society, the *Erinyes* maintained their connection with the female ancestors; but when, before its dispersal the Indo-European speaking people adopted patrillineal descent, the *Moirai* ceased to represent the ancestors, who were now men.........

The nature of their relationship appears to be that, whereas *Moira* or *Dike* is offended by **Violation of the established portions or limits set to human conduct,** the actual punishment of the offender is effected by the agency of the *Erinyes.* The *Moirai* decree what shall be, and the *Erinyes* see to it that their decrees are carried out. ....On the other hand, such stereotyped phrases as *Moira, theon* and *epeklosanto theoi* imply that the authority of the *Moirai* is already fading before the growing power of the gods, and their eventual subordination is revealed at a later period in the cult title Moiragetes, 'Leader of the Moirai', borne by Zeus at Olympia and by Apollo at Delphi. The new gods have conquered. The tribe has been superseded by the state." [১৫০]

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির যুক্তি ও তথ্য অনুধাবন করিলে অনায়াসেই বুঝা যায় যে Haigh যত সহজে নিয়তি বা Moirai কে spirit of justice বা ন্যায়ের শক্তি বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন, তত সহজ তত্ত্ব এটি নয়। ইহা আদিম গোষ্ঠী সমাজের (tribal society) সাম্যের চেতনা হইতে শুরু করিয়া গ্রীক নাগর রাষ্ট্রে (Gk. City state) Law and Order [নিয়ম-শৃঙ্খলা] এর প্রতি আনুগত্যে পর্যবসিত হইল। রাষ্ট্র সবার উপরে এবং তাহার বিধিনিষেধ ব্যক্তি লঙ্ঘন করিলেই অমোঘ নিয়তির শাস্তি। রাষ্ট্র যাহার স্থান যেখানে নির্দেশ করিয়াছে সেইখানে থাকাই তাহার কর্তব্য বা ভাগ্য-নির্ধারিত বিধান। উহার সঙ্গে ব্যক্তির বিরোধের ক্ষেত্রে নিয়তির হাতে ব্যক্তির নিগ্রহ অনিবার্য, —যেমন Sophocles এর Antigone নাটকে। কিন্তু Sophocles Aeschylus এর পরে। Aeschylus এর নাটকে, গোষ্ঠী-সমাজ হইতে গণ-তন্ত্রের উদ্বর্তনে (from tribal society to democracy) এই নিয়তি Orestes বা Prometheus নামীয় ব্যক্তিদের গৌরবময় কৃতির স্বপক্ষে এবং

ইহাদের ক্ষেত্রে পুরাকালীয় নীতিবোধের সঙ্গে নূতন নীতিবোধের দ্বন্দ্বই Aeschylusএর প্রামাণ্য—যেমন Oresteiaতে Erinyes দের পরাজয়ে। এই দ্বন্দ্বের যেটি মূল প্রশ্ন সেটি নির্বিশেষ ন্যায়বিচার (abstract justice) নয়, সেটি নবোদ্ভূত ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর নির্ভরশীল গ্রীক গণতন্ত্রে যে পুরুষ প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা হইল, তাহার সঙ্গে, ঐ গণতন্ত্রের আদিম উদ্ভবের ঊষাকালের নারীতন্ত্রের দ্বন্দ্ব এবং সেই দ্বন্দ্বে নারীতন্ত্রের যে পরাজয় তাহাই হইল আসল কথা। যে সমাজে পুরুষ-প্রাধান্য ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিই সমাজ জীবনের স্বীকৃত ভিত্তি সেই সমাজের নায়ক, Aeschylus এর নাটকে, এই নারীতন্ত্রের অর্থাৎ Erinyesদের পরাজয়কেই যে ন্যায়সঙ্গত বলিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি? Athenaর সভাপতিত্বে বিচার সভা বসিয়াছে Orestesএর মাতৃহত্যার শাস্তিবিধানের উদ্দেশ্যে। Apollo Orestesএর পক্ষে আর Erinyes স্বামীঘাতিনী clytemnaestraর পক্ষে। "By this time it is plain that no progress can be made until a solution has been found for the dilemma with which we have been confronted from the outset. To which parent does the son owe the prior duty? The Erinyes champion the mother; Apollo, who has already urged that the tie between mother and son is no more sacred than the tie between husband and wife, now goes further and declares that the child is more closely related to the father than to the mother. This argument is not an improvisation: It is the Pythagorean doctrine of paternity. And in this issue, now at last clearly stated, lies the crux of the whole matter.

Why then does Athena give her casting vote to Orestes? *Because she gives precedence to the male over the female, to the husband over the wife*:

> The final judgment is a task for me;
> So for Orestes shall this vote be added.
> No mother gave me birth, and in all things
> Save marriage, I, my father's child indeed,
> With all my heart commend the masculine.
> Wherefore I shall not hold of higher worth

A woman who was killed because she killed
Her wedded lord and master of her home.

The reason could not have been more clearly stated, and it touches the crucial point at issue. On the question of paternity Athena endorses the attitude of Apollo, thus laying down the cardinal principle of the Attic law of inheritance, in which not only was the liberty of the wife narrowly circumscribed in the interests of the husband but so far as the transmission of property was concerned, the mother was not reckoned. And if we ask why the dramatist has made the outcome of the trial turn on the social relations of the sexes, *the answer is that he regarded the subordination of woman, quite correctly, as an indispensable condition of democracy.* Just as Aristophanes and Plato perceived that the abolition of private property would involve the emancipation of woman, *so Aeschylus perceived that the subjection of woman was a necessary consequence of the development of private property........Those critics who have been puzzled by a decision so out of keeping with our idea of the administration of the law forget that, at the time when this crime was committed,* there were no laws, only divine sanctions diverse and incompatible, and Athena's decision constitutes a ruling on the very point at which they were in conflict. So much for the past, but the future will be different. Such a case as this can never arise again, because henceforward the criminal will be tried before a court of justice. The reign of law has begun." [১৫১] (Italics বর্তমান লেখকের)

Sophoclesএর সময়ে এই reign of law গণচেতনায় নিয়তির রূপ পরিগ্রহ করিল এবং ঘটাইল ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব। অবশ্য Oedipus Tyranusএ সমস্যাটি জটিল, কিন্তু বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে সেখানেও Fate বা নিয়তি, group-marriageএর পরবর্তী স্তরে এবং তৎপরবর্তী

সভ্যতার সমস্ত স্তরে মাতা-পুত্রের যে সম্পর্ক স্থিরীকৃত রহিয়াছে তাহারই প্রতিবিম্বন। সেই সম্পর্কের বিপরীত আচরণই Oedipusএর জীবনে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।

কিন্তু Athena যে বিচার Orestesএর ক্ষেত্রে করিলেন তাহাকে শুধুই Erinyesদের পরাজয় হিসাবে দেখিলে চলিবে না—অর্থাৎ বিচারে মাতৃতন্ত্রের বা নারীর উপর পিতৃতন্ত্রের বা পুরুষের বিজয় হইয়াছে এইভাবে দেখিলে Golden mean বা Pythagorean meanএর তাৎপর্য অনুপলব্ধই রহিয়া যাইবে। এই mean বা মধ্যপন্থার তাত্ত্বিক এবং সামাজিক তাৎপর্য কি? "What Pythagorus discovered was the relation between the four fixed notes of the octave, represented by the numerical signs 6, 8, 9, 12. The terms 6 and 12 are regarded as opposites ; (8 is the subcontrary or harmonic mean and 9 is the arithmetic mean)....The relation between these terms is constantly described in Pythagorean writings as one of dissension or hostility, which is resolved or reconciled by their fusion in the mean···· The doctrine of the fusion of opposites in the mean was generated by the rise of the middle class intermediate between the landowners and the serfs....The opposites, *esthloi* and *kakoi* (were) blended together by the wealth of the new middle class." [১৫২] Greeceএ Democratic Revolutionএর ফলাফলের এই ক্ষেত্রে তত্ত্বের প্রয়োগ সম্পর্কে Thomson আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন: "It was the Orphics who, following Hesiod, had first thought of human life as a struggle, because for the masses whose aspirations they voiced it, *was* a struggle ; but, since those masses were unconscious of their strength and therefore unable to exert it, they had placed the prize of victory on the other side of death. Since then, however, the new middle class had thrown itself into the struggle and won the prize of democracy ; ***and accordingly the world order appeared to them as a cessation of the age-long strife of opposites, which by blend-***

ing and merging into one another had ceased to be opposites; and these ideas were then applied to the historical process which had engendered them. Human civilisation appeared in retrospect as a dynamic and progressive conflict in which men had been compelled by their material needs to extend their mastery over their material environment.... The same ideas had been worked out in poetry by Aeschylus, who was himself a Pythagorean and a democrat." [১৫৩] (Italics বর্তমান লেখকের)

বিপরীতের মিলনের এই তত্ত্বকেই নিয়তির হাত এড়াইবার পন্থা হিসাবে নির্দেশ করা হইয়াছে এবং এই মিলনের তত্ত্ব হইতেই জন্মাইয়াছে মধ্যপন্থার তত্ত্ব—যে তত্ত্বে সর্বপ্রকার আতিশয্যকেই বিরোধ ও দ্বন্দ্বের মূল সূত্র হিসাবে ধরা হইয়া থাকে। কিন্তু রাষ্ট্র যখন পরিপূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিল তখন তাহার প্রতি নিষ্প্রশ্ন আনুগত্যই মধ্যপন্থা অনুসরণের চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইল। ইহার ফলে আসিল ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব। Sophoclesএ তাহারই রূপায়ণ।

মধুসূদন কি নিয়তির তত্ত্বকে এই অর্থে বুঝিয়াছেন? অবশ্যই তিলোত্তমা-সম্ভবে নিয়তির চেতনা তেমন প্রবল নয়; তবু মাঝে মাঝেই 'বিধির নির্বন্ধ', 'বিধির বিধি,' 'কর্মদোষ' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগে মনে হয় যে গভীরতর তত্ত্ব সম্পর্কে তেমন সচেতন না হইয়া কতকগুলি কথার কথা মধুসূদন ব্যবহার করিয়াছেন। তাহা না হইলে কখনও সুন্দের মুখ দিয়া বলাইতেন না

'... ....কামমদে রত যে দুর্মতি,
সতত এ গতি তার বিদিত জগতে।'[১৫৪]

উগ্র কামনার দুর্বল মুহূর্তে আত্মবিস্মৃতিই যদি দৈত্যের পতনের কারণ হয় তাহা হইলে আর বিধির বিধি-র উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কেন না ব্যক্তি যখনই দেশকালপাত্র ভুলিয়া প্রবৃত্তির স্রোতঃপথে চালিত হয় তখন তাহার আত্মনাশই যুক্তিসিদ্ধ পরিণাম। কিন্তু ব্যক্তি-স্বাধীনতার যুগে ব্যক্তির নির্বাধ অত্মপ্রকাশের যে অধিকার তাহারই বিকৃত রূপ হইল ঐ প্রবৃত্তির মুখে আত্মোৎসর্গ। তাহার জন্য অন্য 'বিধির' প্রয়োজন নাই। সুন্দাসুরের আত্মবিলাপের শেষ কথা হইল:

'রণক্ষেত্রে শত্রু জিনি, মরিনু অকালে,
মরে যথা মৃগরাজ পড়ি ব্যাধ-ফাঁদে।'[১৫৫]

সমস্ত কাব্যখানি জুড়িয়া কি এই ফাঁদই পাতা হয় নাই? নিজের পৌরুষে,

গতানুগতিকতার অচলায়তন ভাঙিয়া, সময়ের মহাসাগরে যে জীবনের তরঙ্গ তুলিল তাহাকে ভূপাতিত করিবার চক্রান্তই ত তিলোত্তমাসম্ভবের বিষয়বস্তু। দৈত্যেরা জানে না, বুঝিতে পারে না, কেন তাহারা মরিতেছে ঃ

'এত যে করিনু তপঃ ধাতায় তুষিতে ;
এত যে যুঝিনু দোঁহে বাসবের সহ ;
এই কি তাহার ফল ফলিল হে শেষে?'[১৫৬]

অথবা

'হে দৈত্যপতি, কিসের কারণে
লুটায় শরীর তব ধরণীর তলে?'[১৫৭]

স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা বুঝিতে পারিতেছে না তাহার আত্মবিকাশের পথে, হৃদয়ের বিস্তারের পথে, কেন এই বাধা। সুন্দোপসুন্দ মরে কারণ তাহারা ইন্দ্রের চিরন্তন অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল। ইন্দ্রের অধিকারই বা চিরন্তন কেন? সেইখানেই প্রশ্ন। এই পরিবর্তনশীল বিশ্বে অপরিবর্তনীয় বিধি সৃষ্টির অর্থই হইল ব্যক্তির স্ফুরণের পথ বন্ধ করা। ইন্দ্র সেই অপরিবর্তনীয় বিধির পোষ্যপুত্র। শক্তি এবং অধিকার থাকিলেও সেই ইন্দ্রত্ব আর কেহ লাভ করিতে পারিবে না। দৈত্যকে দৈত্যই থাকিতে হইবে। **কর্মদোষে** তাহার পতন হইতে পারে কিন্তু **কর্মগুণে** তাহার উন্নয়ন কিছুতেই সম্ভব নয়। সুন্দ বলিতেছে,

কে না জানে দেববংশ পরহিংসাকারী?
কে না জানে দুষ্টমতি ইন্দ্র সুরপতি
অসুরারি?

আর সুন্দোপন্দকে মধুসূদন কি চোখে দেখিতেছেন তাহা তাঁহার উপমাতেই স্পষ্ট ঃ

...কিম্বা যথা পঞ্চবটীবনে
রাম রামানুজ, যবে মোহিনী রাক্ষসী
সূর্পণখা, হেরি দোঁহে, মাতিল মদনে,

তাই মনে হয় নিয়তির বিধান উল্লঙ্ঘনকারীর পতন দেখানো মধুসূদনের উদ্দেশ্য নয়; তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যক্তির অপমৃত্যু দেখানো। সেই অপমৃত্যুর কারণ দুর্নিরীক্ষ্য বলিয়া 'নিয়তি' প্রভৃতি সহজলভ্য এবং অস্পষ্টার্থ কথা মাঝে মাঝে ব্যবহার করা হইয়াছে। আসলে মধুসূদন প্রাক্তনবাদীও নহেন, গ্রীক নিয়তি-বাদীও নহেন। কিন্তু তিলোত্তমা-সম্ভবে তিনি সমস্যার সূত্রপাত করিলেন মাত্র। ইহার চূড়ান্ত প্রকাশ ও ব্যক্তিজীবনের অহেতুক এই ব্যর্থতায় ক্ষোভ ও বেদনার

গভীর আলোড়ন আমরা দেখিতে পাইব মেঘনাদবধ কাব্যে। আরও লক্ষণীয় এই যে মেঘনাদবধে রাবণের পতনের প্রত্যক্ষ কারণ যেমন সীতা, এ কাব্যেও সুন্দের পতনের প্রত্যক্ষ কারণ তিলোত্তমা।

গ

এই তিলোত্তমা কে? যাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া সুন্দ আত্মবলি দিল। কিন্তু তিলোত্তমার সঙ্গে সুন্দোপসুন্দের ভ্রাতৃবিরোধের এমন কোন যুক্তিসিদ্ধ কার্যকারণ-সম্পর্ক নাই। যে ক্ষণিক হিংসার ফলে ইহাদের পতন ঘটিল তাহা শুধু পূর্ব-পরিকল্পিতই নয়, তাহা শুধু ঘটাইতে হইবেই বলিয়া যেন ঘটানো। তবু অন্য কৌশলের মাধ্যমেও তাহা যে না ঘটানো যাইত এমন নয়। সৌন্দর্য-তৃষা এবং তাহা পরিতৃপ্তির প্রচেষ্টায় ধ্বংস—এই বিশিষ্ট ভাব-কল্পনাই মধুসূদনকে আকৃষ্ট করিল। **এবং এই ভাব-কল্পনা আছে সমস্ত রোমাণ্টিক চেতনার মূলে**। রেনেসাঁর অনুকূল বায়ু-প্রবাহে ব্যক্তিসত্তা যখন আপনার বিকাশের আকাশে হৃদয়খানি মেলিয়া দিল, মানিল না কোনো বাধা; প্রথম আবিষ্কারের উল্লাসে বলিয়া উঠিল 'আহা, মানুষ কি সুন্দর!'; যাহা কিছু নীরস, অশুভঙ্কর সবই দূর করিয়া দিয়া চাহিল জীবনকে মধুময় করিয়া তুলিতে; জীবনরসই যখন মুখ্যরস হইয়া উঠিল;—তখন সৌন্দর্য-পিপাসাই হইয়া উঠিল ব্যক্তির জীবনের প্রধানতম চালনী শক্তি। এই Beauty cult বা, রেনেসাঁ যুগে এই সৌন্দর্য-পূজা সম্পর্কে Legouis তাঁহার সাহিত্যের ইতিহাসে বলিতেছেন, "The object of their transports was beauty, to which Spenser addressed a magnificent hymn, and which Marlowe, in a famous passage and with poignant melancholy, declared to be beyond complete expression :

> If all the pens that ever poets held
> Had fed the feeling of their masters' thoughts,
> And every sweetness that inspired their hearts.
> Their minds, and muses on admired themes;
> If all the heavenly quintessence they still
> From their immortal flowers of poesy,
> Wherein, as in a mirror, we perceive
> The highest reaches of a human wit :
> If these had made one poem's period,

And all combined in beauty's worthiness,
Yet should there hover in their restles heads
One thought, one grace, one wonder, at the least,
Which into words no Virtue can digest.

The generation lived in this fever."[১৫৮] এই অনির্বচনীয় সৌন্দর্যানুভূতি রেনেসাঁর অসীম জীবন-পিপাসারই একটি অঙ্গ। এ পিপাসার বর্ণনা করিয়াছেন Shakespeare মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত Claudioর মুখে Measure For Measure নাটকে: জীবন আর মৃত্যুকে সে পাশাপাশি স্থাপন করিয়া দেখিতেছে:

Ay, but to die, and go we know not where;
To lie in cold obstruction, and to rot;
This sensible warm motion to become
A kneaded clod; and the delighted spirit
To bathe in fiery floods, or to reside
In thrilling region of thick-ribbed ice;
To be imprisoned in the viewless winds
And blown with restless violence round about
The pencent world; or to be worse than worst
Of those that lawless and incertain thought
Imagine howling—'tis to horrible.
The weariest and most loathed worldly life
That age, ache, penury, and imprisonment
Can lay on nature, is a paradise
To what we fear of death.[১৫৯]

শেষের চারিটি ছত্রে দুর্মর জীবনপিপাসার তীক্ষ্ণতম প্রকাশ। এই মর্ত্য-প্রেম ধ্বনিত হইতেছে তিলোত্তমাসম্ভবের ২য় সর্গে অলকানাথের প্রতিবাদে। নিজেরা আর ভোগ করিতে পারিতেছেন না বলিয়া অন্য দেবতারা যখন পৃথিবীকে ধ্বংস করিতে উদ্যত তখন অলকাপতি যেন মধুসূদনের হৃদয়ের কথাকেই প্রকাশ করিয়া দিলেন:

নাশিতে ধাতার সৃষ্টি, যেমন কহিলা
প্রচেতা, কাহার সাধ্য? তবে যদি থাকে
এ হেন শকতি কারো, কেমন সে জন,

দেব কি মানব, পারে এ কর্ম করিতে
নিষ্ঠুর? কঠিন হিয়া হেন কার আছে?
কে পারে নাশিতে তোরে, জগৎজননি
বসুধে, রে ঋতুকুলরমণি, যাহার
প্রেমে সদা মত্ত ভানু, ইন্দু,—ইন্দীবর
গগনের! তারাদল যার সখীদল!
সাগর যাহারে বাধে রজভুজ পাশে!
সোহাগে বাসুকি নিজ শত শিরোপরি
বসায়! রে অনন্তে, রে মেদিনি-কামিনি,
শ্যামাঙ্গি, অলক যার ভূষিতে উল্লাসে
স্বজেন সতত ধাতা ফুলরত্নাবলী
বহুবিধ।...........

কিন্তু এই পিপাসা তৃপ্ত হইবার নয়। 'life piled on life were too little'.[১৬০] এবং এ সৌন্দর্যকেও জীবনে সম্পূর্ণ অঙ্গীকার করা যায় না, সবটুকু পাওয়া যায় না। তাই গ্রীক রূপকথায় সে মানসী Galatea আর আমাদের পৌরাণিক রূপকথায় তিলোত্তমা। **মধুসূদনই আধুনিক সাহিত্যে মানস-সুন্দরীকে অবতারিত করিলেন।** তিলোত্তমার মধ্যেই তাঁহার মর্ত্যপ্রেম সর্বৈশ্বর্যময় রূপ গ্রহণ করিল। পুরাণে বলে তিলোত্তমা স্বর্বেশ্যা। কিন্তু 'Every creature's best' [১৬১] দিয়া যাহাকে গড়া হইল, সারা বিশ্বের রূপের ভাণ্ডার মন্থন করিয়া যে আসিয়া দাঁড়াইল বিস্মিত ত্রিলোকের সামনে, তাহাকে পুরাণ স্বর্বেশ্যা আখ্যা দিয়া সমস্যা চুকাইয়া দিতে পারে কিন্তু মধুসূদন পারেন না। যদি আমাদের যুগসঞ্চিত সাহিত্যের ঐতিহ্যে একটি হেলেন থাকিত যাহার সৌন্দর্য-কল্পনা কবি-নাট্যকার মার্লোকে বলাইয়াছিল "Is that the face that launched a thousand ships'[১৬২] তাহা হইলে মধুসূদন হয়ত সেই মানবীকেই মানসী করিতেন, কিন্তু তাহা যে নাই। অবশ্যই দ্রৌপদীকে দেখিয়া জয়দ্রথের মনে হইয়াছিল যে অন্য সকল নারীই ইহার তুলনায় বানরী; কিন্তু দ্রৌপদী আমাদের সাহিত্য-ধারায় কখনও সেই মানসী হইয়া উঠেন নাই যাহা ইউরোপীয় সাহিত্যে হইয়া উঠিয়াছেন হেলেন। এই দৃষ্টিকোণ হইতে মধুসূদনের যুগের সমালোচকেরা তিলোত্তমাকে দেখেন নাই বলিয়াই অভিযোগ করিতে পারিয়াছিলেন: "স্বর্বেশ্যা তিলোত্তমাকে 'সতী' বলিয়া বর্ণনা দূষিত মানিতে হয়।"[১৬৩] সীতার প্রতি মধুসূদনের আকর্ষণ কিছু কম ছিল না। কিন্তু সীতা জীবনবিলাসের

সঙ্গিনী নহেন, জীবন-পরাজিতের সান্ত্বনার উৎস। তাঁহাকে অযোধ্যার চেয়ে লঙ্কার অশোকবনেই মানায় ভালো। কিন্তু নবজাগ্রত, আত্মশক্তিতে আস্থাবান, স্বাধিকার-সচেতন মানবত্মার লীলা-সঙ্গিনী কই? ভারতচন্দ্রের সুন্দর বিদ্যাকে লইয়া তুষ্ট থাকিতে পারে কারণ সেখানে স্থূল দেহোপভোগই নরনারী-সম্পর্কের চূড়ান্ত এবং একমাত্র কথা। কিন্তু রেনেসাঁ যুগে সে সম্পর্কের যে মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মধুসূদন বাপের কথায় বাঙালী মেয়ে-রূপী পুতুল বিবাহ করিতে রাজী হন নাই, খুঁজিয়া ফিরিয়াছেন সেই 'মানস-সুন্দরীকে', সেই Eternal Feminine কে, সেই Impossib le She কে, যাহাকে পূজা করিয়া নিজের রূপসন্ধানকে তিনি সম্পূর্ণ করিবেন; যাহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিবেন, সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ, অথবা:

> "I wonder, by my troth, what thou, and I
> Did till we loved?"
>
> [Good Morrow : John Donne]

বাংলা সাহিত্যের মালঞ্চে তাঁহার প্রথম আবির্ভাব তিলোত্তমাতে। মধুসূদন তাঁহাকে আমাদের জন্য উদ্ধার করিয়াছেন। তিলোত্তমাই তাঁহার বিশুদ্ধ রূপানুরাগের প্রথম আধার—সে আপনার রূপে আপনি মুগ্ধ, নিজের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে একান্ত অচেতন:

> ক্ষণকাল বসি বামা চাহি সরঃ পানে
> আপন প্রতিমা হেরি—ভ্রান্তিমদে মাতি
> একদৃষ্টে তার দিকে চাহিতে লাগিলা
> বিবশে।

কিন্তু এখনও তাহাতে Narcicism এর ছোঁয়া লাগে নাই—এখনও তাহাতে আত্মরতির (self-love) স্পর্শ লাগে নাই। পৃথিবীর মাটির প্রথম স্পর্শে সে সচকিত, শিহরিত:

> প্রবেশিলা কুঞ্জবনে কুঞ্জরগামিনী
> তিলোত্তমা, প্রবেশয়ে বাসরে যেমতি
> শরমে, ভয়ে কাতরা নবকুলবধূ
> লজ্জাশীলা। মৃদুগতি চলিলা সুন্দরী
> মুহুর্মুহু চাহি চারিদিকে, চাহে যথা
> অজানিত ফুলবনে কুরঙ্গিনী; কভু
> চমকে রমণী শুনি নূপুরের ধ্বনি;

পৃথিবীর বাসরে প্রবেশ করিতেছে তিলোত্তমা; তাহার নিজ কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি যেন সমস্ত পৃথিবীর বিস্মিত উচ্চৈঃস্বর:

আচম্বিতে 'কে তুমি, কে তুমি হে রমণি—
'হে রমণি?' এই ধ্বনি বাজিল কাননে!
মহা ভয়ে ভীতা দূতী চমকি চাহিলা
চারিদিকে।

সমস্ত বনভূমি তাহার বন্দনা শুরু করিল:

ধীরে ধীরে পুনঃ ধনী মরালগামিনী
চলিলা কাননপথে। কত স্বর্ণলতা
সাধিল ধরিয়া, আহা, রাঙা পা দুখানি,
থাকিতে তাদের সাথে;............
কত যে মিনতি স্তুতি করিলা কোকিল
কপোতীর সহ; কত গুন্ গুন্ করি
আরাধিল অলিদল,—কে পারে কহিতে?

সৌন্দর্য-পূজাই যে মধুসূদনের কাছে, এ কাব্যে, প্রধান কথা, তাহার আরও প্রমাণ পাই যখন দেখি, তিলোত্তমা ছাড়া, অন্যান্য ক্ষেত্রেও যখনি তিনি সুযোগ পাইয়াছেন তখনি সৌন্দর্য-মগ্ন হইয়াছেন—কোনো ব্যক্তিই যেন তাঁহার কাছে মুখ্য নয়, গল্পাংশও মুখ্য নয়, মুখ্য কেবল সুন্দরের আরতি: পৌলমীর আবির্ভাব, অকাল বসন্ত, পৌলমীর সৌন্দর্য, এমন কি মায়াকুঞ্জে গাছগুলির বর্ণনাতে পর্যন্ত মধুসূদন শুধু যেন নির্বিশেষ সৌন্দর্যের জয়গান করিয়াছেন। মধুসূদনের ক্রম অনুসরণ করিয়া গাছগুলির নাম আবৃত্তি করিলেই তাহাদের ধ্বনিসুষমা পরিস্ফুট হইবে। যথা:

দেবদারু—রসাল—মধুদ্রুম
শোভাঞ্জন—বদরী—কদম্ব
অশোক—শিমূল—(সু) ইঙ্গুদী
শল্মলী—শাল—তাল—নারীকেল
গুবাক—চালিতা—জাম—তেঁতুল—কাঁঠাল
বংশ—খর্জুর—তমাল—শমী—আমলকী
গাম্ভারী।

শুধু যে 'A thing of beauty is a joy for ever' তাহাই নয়,

"........On every morrow, are we wreathing,
A flowery band to bind us to the earth,

Spite of despondence, of the inhuman dearth
Of noble natures, of the gloomy days,
Of all the unhealthy and o'er-darkened ways
Made for our searching : yes, in spite of all,
Some shape of beauty moves away the pall
From our dark spirits.[১৬৪]

নিজের জীবনের পটভূমিকায় মধুসূদনের এই সৌন্দর্য-রচনার প্রয়াসই যেন Keats এর পংক্তি কয়টিতে বিশ্লেষিত হইয়াছে। সত্য বলিতে কি

জীবন মন্থনবিষ নিজে করি পান
অমৃত যা উঠেছিল করি গেলে দান।[১৬৫]

কিন্তু এই সৌন্দর্যরূপিণী তিলোত্তমা, যিনি আকস্মিক আবির্ভাবে পৃথিবীকে মধুময়, যৌবন-চঞ্চল করেন, যাঁহার কটাক্ষে দেবকুল স্থৈর্যহীন এবং ব্রহ্মা চতুর্মুখ, যাঁহার আবাস স্বর্গের বারাঙ্গনানিবাসের উপান্তে নহে, সূর্যমণ্ডলে, তিনি কল্যাণ-রূপিণী নহেন ; তিনি তাঁহার প্রথম প্রেমিকদের জীবনে আনেন সর্বনাশ। **সুন্দরের সঙ্গে কল্যাণের একান্ত বিরোধ**। তাঁহার প্রেম আনে ভ্রাতৃবিরোধ, আনে অশান্তি। অবশ্য দেবতার পক্ষে তিনি কল্যাণদায়িনী কিন্তু সেই কল্যাণের জন্য তিনি শুধু পরোক্ষভাবে দায়ী। তাহার সঙ্গে তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যের সম্পর্ক অল্প। যাহা আমাদের চোখের সামনে ঘটিল তাহা হইতেছে দুইজন অপরাজেয় বীরের অন্তর্ঘাতী দ্বন্দ্ব এবং বিনাশ। এবং সুন্দোপসুন্দ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার পূবে ক্ষোভে বলিয়া উঠিল, 'কি কর্ম করিনু ভাই, পূর্ব-কথা ভুলি ?' অথচ এই সৌন্দর্যের সামনে পূর্ব কথা ভুলিয়া, পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ না করিয়া উপায় নাই। **সৌন্দর্য-পিপাসা আর কল্যাণচিকীর্ষা এই দুই-এর দ্বন্দ্ব রোমাণ্টিক চেতনার মূলে আছে**। তাহার কারণ হইল আদর্শকে জীবনে রূপায়ণের অসম্ভাব্যতা এবং তজ্জনিত ব্যর্থতা-বোধ—যে চেতনার প্রত্যক্ষ ফল হইল রবীন্দ্রনাথের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা।' কিন্তু ইহার পিছনে যে সুগুপ্ত তত্ত্বটি রহিয়াছে তাহা হইল, রোমাণ্টিক যে আদর্শকে বা যে সৌন্দর্যকে জীবনে লাভ করিতে চায় তাহা তাহার নিজেরই আকাঙ্ক্ষার প্রতিভাস, তাহার নিজেরই মনগড়া—তাহার কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নাই :

'মর্ত্যের মৃত্তিকা মোর, তাই দিয়ে অমৃত মুরতি
যদি সৃষ্টি ক'রে থাকো তাহারই আরতি
হোক তব সন্ধ্যাবেলা

পূজার সে খেলা
ব্যাঘাত পাবে না মোর প্রত্যহের ম্লানস্পর্শ লেগে ;
....
আজো তুমি নিজে
হয়ত বা করিবে রচন
মোর স্মৃতিটুকু দিয়ে স্বপ্নাবিষ্ট তোমার বচন ;
ভার তার না রহিবে, না রহিবে দায়।

Irving Babbit বলিতেছেন ' To the mature Goethe 'Rousseau's account of the sculptor who bceame enamored of his own creation and breathed into it actual life by the sheer intensity of his desire seemed a delirious confusion of the planes of living........But a passion thus conceived exactly satisfies the romantic requirement. For though the romanticist wishes to abandon himself to the rapture of love, he does not wish to transcend his own ego. The object with which Pygmalion is in love is after all only a projection of his own 'genius'. But such an object is not in any proper sense an object at all. There is in fact no object in the romantic univese—only subject."[১৬৬] ফলে এই মায়া যখন মরীচিকায় পর্যবসিত হয় তখনই হয় রোমান্টিকের আত্মিক মৃত্যু। Babbit বা Goethe এর মতে মত দিয়া রোমান্টিকতার এই মূল্যবিচারে সায় না দিয়াও এ কথা সত্য বলিয়া মানিতে কোন অসুবিধা নাই যে রোমান্টিক মূলত আত্ম-চৈতন্যসর্বস্ব। আর সেই আত্মসর্বস্বতা কাটাইতে না পারিলে ভুলভাঙার ব্যথা অতি মর্মান্তিক। রোমান্টিক চেতনার এই দিকের নিরাবরণ রূপ মধুসূদনেই আমরা প্রথম প্রত্যক্ষ করিলাম। পরে এই ভাবধারার স্পষ্টতর, তীক্ষ্ণতর প্রকাশ দেখিলাম রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়িনী' ও 'উর্বশীতে' এবং পরে বলাকায় লক্ষ্মী-উর্বশী দ্বন্দ্বে। সে বিশ্বপ্রিয়া কিন্তু 'ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণশোণিমা।' বিশ্বপ্রেয়ত্ব আর বিশ্বার্তি—বিশ্বের কামনা আর বিশ্বের আধি—এই দুই কোটিতে উর্বশীর লীলা। কারণ সে বিশ্বের প্রিয়া—সে মাতা নয়, কন্যা নয়। মাতা, কন্যা এবং বধূ—এই তিন রূপেই সমাজে নারীর স্বীকৃতি। এই তিন সম্পর্কের অতিরিক্ত কোনো সম্পর্ক সমাজের চোখে কল্যাণকর নয়। তাই বধূ আর প্রিয়াতে দ্বন্দ্ব, শুধু রবীন্দ্রনাথের নয়, সমস্ত রোমান্টিক সাহিত্যের প্রাণের

কথা। ইহার কারণ খুঁজিতে গেলে ব্যক্তিমানসের উপর সমাজ-ব্যবস্থার জটিল প্রভাবের কথা আলোচনা করিতে হয়; দেখাইতে হয় সমাজে নারীর পূর্ণ মনুষ্যত্বে বিকশিত হইবার পথে পুরুষের সৃষ্ট বাধা, নারীরও স্বাধিকার অর্জনের প্রচেষ্টা; আবার পুরুষেরও অপূর্ণ জীবনের পূর্ণতার সন্ধান লীলাসঙ্গিনী নারীর মধ্যে; এই সমস্ত কিছুর আবর্তের মধ্য হইতে প্রথম অস্ফুট আবির্ভাব তিলোত্তমার এবং তাহার স্ফুটতর, রমণীয়তর প্রকাশ উর্বশী ভাব-কল্পনায়। এই সৌন্দর্যকে জীবনে স্বীকরণের চেষ্টার ফল হিসাবে সর্বনাশের, পরম অকল্যাণের ইঙ্গিত দিয়াছেন মধুসূদন। রবীন্দ্রনাথের উর্বশীর জন্য 'দিকে দিকে কাঁদিছে ক্রন্দসী' এবং কাঁদিয়া তবু হৃদিরক্ত ঢালিয়াই দিতেছে। ঠিক এই অবস্থাই হইয়াছে Keatsএর knight এর La Belle Dame Sans Merci কবিতায়। এই বিলাপই করিয়াছেন Schiller তাঁহার Gods of Greece কিংবা Pan is dead [Gotter Griechenlands] কবিতায়। বিলাপ করিতেছেন কারণ 'অস্তাচল-বাসিনী উর্বশী।'

সৌন্দর্য-অন্বেষার এই সর্বনাশী পরিণামের রূপায়ণকে যদি কেহ মধুসূদনের নিয়তিবাদ বলিতে চান ত বলিতে পারেন; কিন্তু তাহাতে শুধু অস্পষ্টতার কুজ্ঝটিকাই সৃষ্টি করা হইবে।

শশাঙ্কমোহন সেন তাঁহার মধুসূদন গ্রন্থে তিলোত্তমাসম্ভবের ব্যাখ্যায় এই তত্ত্বের সমর্থন করিলেও এই তত্ত্বের দ্বন্দ্বমূলক প্রকৃতির বিশ্লেষণ করেন নাই বলিয়া 'সুন্দরী যে সর্বনাশী'—রোমান্টিক চেতনার এই মূলীভূত সুরের সন্ধান পান নাই। তিনি বলিতেছেন, "তিলোত্তমা-সম্ভব নব্য বঙ্গসাহিত্যের প্রথম কাব্য (আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন) [১৬৭] কেবল কালের হিসাবে নহে, কেবল ভাষারীতি এবং ছন্দের হিসাবে নহে, উহা কাব্যের অন্তরাত্মা এবং পরিব্যক্তির ক্ষেত্রেও বঙ্গে আদ্যসৃষ্টি। নিখুঁত সৌন্দর্য-তত্ত্বের ঋক্-সঙ্গীতময় মহাকাব্য। সৃষ্টির আদিম যে সৌন্দর্যমূর্তি, যে সৌন্দর্য সবেমাত্র বিশ্বকর্মার হৃদয় এবং তাঁহার দৈবী সৃষ্টিশালা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া বিমোহিনীর মূর্তিতে বিশ্বের নয়নসম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, যে সৌন্দর্যমূর্তি তখনো কাহারও কন্যা অথবা বধূরূপে সম্বন্ধ লাভ করে নাই—সে সম্বন্ধ কখনও লাভ করে নাই—কবি তাহারই মহিমাগীতি গান করিয়াছেন।[১৬৮]

ঘ

স্বভাবতই তিলোত্তমাসম্ভবে কুমারসম্ভবের মত আখ্যানবস্তুর প্রাধান্য নাই। কালিদাসের মহাকাব্যে স্থানে স্থানে প্রয়োজনানুগ ভাবোচ্ছ্বাস আছে; কিন্তু

তিলোত্তমাসম্ভব আদ্যোপান্ত আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসমূলক—সারা কাব্য জুড়িয়া শুধু নানা উপলক্ষ্যে সুন্দরের স্তবগান আর সে স্তব হইল কবির মানসপূজা। সৌন্দর্যলোকে মুক্তি পাইয়া কবির ব্যক্তিমানস সেই মানসীকে লইয়াই মগ্ন হইয়া রহিল। এই মানসীর কোনো বাস্তব অস্তিত্ব সম্ভব কি না, না ইহা শুধুই কবির 'যৌবননিকুঞ্জে নিখিল কোকিলের' সম্মিলিত ডাক, ইহা ভাবিয়া দেখিবার মত মনের স্থৈর্য ভাবোচ্ছ্বাসের সে উষাকালে মধুসূদনের থাকা সম্ভব ছিল না। আর থাকিলেও যে বিশেষ কোনো পরিবর্তনের সূচনা হইত তাহা নয়। মধুসূদন কাব্যেও যেমনি জীবনেও তেমনি এই প্রেমজীবিনী সুন্দরীকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন কিন্তু সার হইয়াছে আত্মবিলাপ। সকল দেশের সব রোমান্টিক কবিই এই অন্বেষণে কবি-জীবন কাটাইয়াছেন—কখনও বা ভুল করিয়া মানুষের মধ্যে তাহার অস্তিত্ব খুঁজিতে গিয়া নিজের দুঃখ নিজেই ডাকিয়া আনিয়াছেন আবার কখনও বা বাস্তবজীবনকে এই সৌন্দর্যের স্তরে উন্নীত করিবার প্রচেষ্টায় বিপ্লবী হইয়া উঠিয়াছেন (Constructive Romanticism·······Gorky)। মধুসূদন পরিপূর্ণ রোমান্টিক চেতনার প্রথম বাঙালী কবি বলিয়া এই সৌন্দর্য যে জীবনে সত্যই অনাস্বাদ্য ইহা স্পষ্ট বুঝেন নাই বা ইহাকে অনুসরণ করিলে যে জীবন হইতে পলাইতে হয়, নিরুদ্দেশ যাত্রা (escapism and nostalgia) করিতে হয়, ইহাও তাঁহার কাছে খুব স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। প্রথম বিস্ময়ের উচ্ছ্বাসে তিনি শুধু পূজা করিয়াই চলিতেছেন; বুঝিতেছেন না তিলোত্তমা কেন সর্বনাশী।

তাই মধুসূদনের এই কাব্য লিরিক-ধর্মী, epic-ধর্মী নয়, ব্যক্তিমানসের উচ্ছ্বাসই ইহার প্রধান কথা, বাস্তবের নিরপেক্ষ রূপায়ণ (objectivism) নয়। রেনেসাঁর যুগে স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা নিজের ঐশ্বর্যময় সম্ভাবনা যেমন আবিষ্কার করিল, সঙ্গে সঙ্গে এ বোধও তাহার জন্মাইল যে সে নিজেই সুন্দর, তাহার প্রাণ যাহা চায় তাহা সুন্দর, সে আদিম পাপে নিমগ্ন জীব নয়, সে অপাপবিদ্ধ। রোমান্টিক যুগে ইংলণ্ডে এই চেতনার সম্যক স্ফুরণ ঘটিল Shelleyর মধ্যে আর ফরাসী দেশে বিপ্লবের আগে Rousseau এবং বিপ্লবের পরে Chateaubriand প্রমুখদের মধ্যে। এই চেতনাই প্রকাশ পাইয়াছে মিরান্দার উক্তিতে: 'There's nothing ill can dwell in such a temple.'।[১৬৯] দার্শনিকেরা এই মনোভাবের নাম দিয়াছেন আধুনিক কালের Naturalistic morality. 'Man, in short, is naturally good and Nature herself is beneficent and beautiful.'[১৭০] এ কথা Rousseauর নিজেরই কথা, State of

Nature এ স্বাভাবিক অকৃত্রিম মানুষের বর্ণনা—যে মানুষকে সমাজ শৃঙ্খল পরাইয়া কলঙ্কিত করে নাই। Rousseau, Tom Paine (এমন কি negatively Voltaire ও) ইত্যাদিরা যে Young Bengal এর মনকে প্রভাবিত করিয়াছেন তাহারই প্রথম সার্থক প্রতিভূ মধুসূদন যে এই ভাবেই ভাবিত হইবেন তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। শশাঙ্কমোহন বলিয়াছেন মধুসূদন ছিলেন, "বায়রণীয় ডাকিনীশক্তির জ্বলন্ত অগ্নিমূর্তি"[১৭১] এবং বলিয়াছেন যে "সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই আগুনের প্রধান লক্ষণ ছিল ভাবোন্মত্ততা, অহমিকা, অহংমুখিতা, দম্ভ, আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং আসুরিক (Daemoniacal) প্রচণ্ডতা।"[১৭২] শশাঙ্কমোহনের কথার অতিরঞ্জন বাদ দিলে এইটুকুই বুঝা যায় যে, প্রথম আত্মসচেতন ব্যক্তির আত্মবিলাসই হইল মধুসূদনের কাব্য-কৃতি। এই জন্য তিলোত্তমাসম্ভবে যেখানে যেখানে lyricism আপন গতিতে চলিয়াছে সেইখানেই মধুসূদন রসোত্তীর্ণ আর যেখানেই তিনি ঘটনার বর্ণনা বা তত্ত্বের উদ্ঘাটন করিতে গিয়াছেন (যেমন ২য় সর্গে) সেইখানেই তিনি অসার্থক। মধুসূদনের প্রতিভাই হইল lyric-ধর্মী।

আসলে এখনও পর্যন্ত বাংলা-কাব্য lyric-সর্বস্ব এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও epic লিখিতে পরেন নাই, লিখিয়াছেন lyric।

৬

বাংলা কাব্যের বস্তুনির্মাণে মধুসূদন যেমন মৌলিক ও বিপ্লবী, ভাষা ও ছন্দের ক্ষেত্রেও তাহাই। অনেকের ধারণা, এবং সে ধারণা ছড়াইতে বনফুল তাঁহার মধুসূদন নাটকে সাহায্যই করিয়াছেন যে, মধুসূদন না কি কাব্যরচনাকালে পানোন্মত্ত থাকিতেন। মধুসূদন মিথ্যাবাদী ছিলেন এ কথা তাঁহার শত্রুরাও বলেন নাই। অতএব এ বিষয়ে মধুসূদনের নিজের কথাই প্রামাণ্য। তিনি রাজনারায়ণ বসুকে ১৪ই জুলাই ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে লিখিতেছেন, 'Talking about wine and all vicious indulgences, though by no means a saint and teetotal prude, I never drink when engaged in writing poetry; for, if I do, I can never manage to put two ideas together! There is not a line in the Tilottama written under the inspiration of even such a thing as a glass of rosy sherry or beer"।[১৭৩] বনফুল আরও একটি ভুল ধারণা ছড়াইয়াছেন। সেটি হইল মধুসূদনের কবিতা রচনাকালে অভিধান দেখিয়া আভিধানিক শব্দের প্রয়োগ। এ সম্পর্কেও মধুসূদনের নিজের

কথাই শোনা যাক : "I had no idea, my dear fellow, that our mother tongue would place at my disposal such exhaustless materials, and you know I am not a good scholar. The thoughts and images *bring out words with themselves*,—words that I never thought I knew. *Here is a mystery for you.*[১৭৪] অভিধান দেখার অভিযোগ যাঁহারা করেন তাঁহারা, রেনেসাঁ যুগে, ভাষা যে নবদেহ লাভ করিতেছিল তাহার খোঁজ রাখেন না, বা রাখার প্রয়োজন বোধ করেন না। ভারতচন্দ্র যখন তাঁহার কাব্যে প্রচুর ফার্সী শব্দ প্রয়োগ করিতেছিলেন তখন তিনি কি বারে বারে অভিধান দেখিতেছিলেন? আসলে তাঁহার কৃষ্টির একটি প্রধান অঙ্গই ছিল ফার্সীর অনুশীলন। তেমনি ছিল মধুসূদনের ঐ ভাষা-প্রয়োগের পিছনে প্রভূত এবং ত্বরিত সংস্কৃতানুশীলন। সংস্কৃতের প্রতি, প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ রেনেসাঁর একটি অবিচ্ছেদ্য লক্ষণ। দ্বিতীয়ত ঐ যুগটি ছিল মুসলিম সংস্কৃতির পতনের যুগ এবং অনেকখানি হিন্দুপ্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার যুগ। সেই কারণেও সংস্কৃতের প্রাধান্য ছিল অপরিহার্য। দেশজ বা প্রাকৃত কথার স্থলে সংস্কৃতের এই স্বীকরণের সম্পর্কে রমেশচন্দ্র দত্ত বলিতেছেন, "With the growth of literature, however, these words have a tendency to disappear, and the Bengali language is gradually approximating to the Sanskrit in various ways. This process is specially observable in the present century; whoever has taken pains to compare the best works of the present age with the works of the last century, must have observed that the Sanskrit element has greatly increased in the Bengali of the present day; [১৭৫] অবশ্য অন্যদিকে গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশের ফলে আলালের ঘরের দুলালও রচিত হইতেছিল। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে বাংলা গদ্যেরও প্রথম সার্থক সৃষ্টি বেতালপঞ্চবিংশতি। মধুসূদন নিজে অমিত্রাক্ষর সৃষ্টির ক্ষেত্রে সংস্কৃতের ধ্বনি-গাম্ভীর্য, ধ্বনি-বৈচিত্র্য, যুক্ত-ব্যঞ্জনের দৃঢ়বদ্ধতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের জন্যই উহাকে ঐ প্রাধান্য দিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে যতীন্দ্রমোহনকে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহার আর পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। কিন্তু আলালের ঘরের দুলাল সম্পর্কে তিনি প্যারীচাঁদকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা স্মরণীয় "It is the language of fishermen unless you import largely from

sanskrit. উহা কি আবার একটা ভাষা! দেখিবেন, আমি যে ভাষার সৃষ্টি করিব, তাহাই চিরস্থায়ী হইবে।”[১৭৬] তখনও মধুসূদন শর্মিষ্ঠা লেখেন নাই, তিলোত্তমাও লেখেন নাই, কিন্তু মাদ্রাজে প্রবাসকালেই যে বাসনা তাঁহার মনে উদ্ভিন্ন হইতেছিল—সচেতন প্রচেষ্টার বিষয় হইয়া উঠে নাই—তাহাই তাঁহার মুখে ঐ কথা জোগাইয়াছিল। এ কথা তাঁহার কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল যে কাশীদাসী কি কৃত্তিবাসী পয়ারে এলাইয়া-যাওয়া ভাষাকে দৃঢ়বদ্ধ করিতে হইলে, তাহাতে ঋজু কাঠিন্য আনিতে হইলে চাই সংস্কৃতের বল ও ধারণ-ক্ষমতা। পয়ারে যেন ধ্বনিকে ধরিয়াই রাখা যায় না—হাতের ফাঁক দিয়া গলিয়া যায়। তাহার উপরে মিলের প্রলেপ ধ্বনি-বৈচিত্র্যকে দেয় নষ্ট করিয়া। [পয়ারের ধারণক্ষমতা কতদূর তাহা ‘ছন্দ’ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বিশদ আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন।] প্যারীচাঁদকে ঐ কথা বলার পর তিনি নিশ্চয়ই চিন্তা করা বন্ধ করেন নাই এবং যখন ১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে [মধু-স্মৃতি নবতম সংস্করণ—মধুসূদনের চিঠি-পৃ ৯২] তিনি রত্নাবলী অনুবাদের পর দ্রুতবেগে শর্মিষ্ঠা রচনা করিতেছিলেন তখন নাটকে অমিত্রাক্ষর প্রয়োগের কথা যে ভাবেন নাই এ কথা কে জোর করিয়া বলিতে পারে? শর্মিষ্ঠার প্রথম অভিনয় হয় ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর, রত্নাবলীর প্রথম অভিনয়ের এক বৎসরেরও পরে। শর্মিষ্ঠা অভিনীত হইবার আগেই ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই-আগষ্টে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের প্রথম সর্গ বিবিধার্থসংগ্রহে প্রকাশিত হয়। যদি তিলোত্তমা-সম্ভবেই অমিত্রাক্ষরের প্রথম আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে, এবং যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে বিখ্যাত কথোপকথনে রচনাকালের যে হিসাব দেওয়া আছে তাহা যদি যথাযথ হয়, তাহা হইলে তিলোত্তমাসম্ভব যে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দেই রচিত হইয়াছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ যতীন্দ্রমোহন লিখিতেছেন, “It was a fine evening when we were sitting in the lower hall of the Belgachia villa where the stage had been set up for the Performance of the Ratnavali”[১৭৭] রত্নাবলীর প্রথম অভিনয় হয় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই। যতীন্দ্রমোহনের ভাষায় মনে হয় রত্নাবলীর প্রথম অভিনয়-রজনীর কথাই তিনি বলিতেছেন; কারণ চিঠিটিতে যে রকম পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ রহিয়াছে তাহাতে পুনরভিনয়ের জন্য মঞ্চ পাতা হইলে সে কথার তিনি উল্লেখ করিতেন। আর যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে ইহা রত্নাবলীর কোনো পুনরভিনয়-রজনীর অব্যবহিত পূর্বের কথা, তাহা হইলেও সে তারিখ শর্মিষ্ঠা রচনার ওদিকে হইতে পারে না—অর্থাৎ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ওদিকে হইতে পারে না। কেন না ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের

জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত হইবার আগেই শর্মিষ্ঠার অভিনয়াভ্যাস শুরু হইয়াছিল না; মনে করিলে ২৪শে মার্চ ১৮৫৯—এ রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ শর্মিষ্ঠার চূড়ান্ত অভিনেতা নির্বাচনের সংবাদ গৌরদাস বসাককে দিতে পারিতেন না। এবং যতীন্দ্রমোহন ঐ চিঠিতেই বলিতেছেন যে কথা হইবার কয়েক দিনের মধ্যেই [within three or four days][১৭৯] মধুসূদন তিলোত্তমাসম্ভবের প্রথম সর্গ রচনা করেন। এবং ঐ চিঠি অনুসারেই, এক পক্ষ কালের মধ্যেই ["certainly" said Michael, "and I hope to do so in about a fortnight."] তিলোত্তমাসম্ভব রচনা শেষ হয়। অতএব তথ্য ও তারিখের হিসাবে তিলোত্তমাসম্ভব ১৮৫৮তেই লিখিত হওয়া সম্ভব। এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে আরও একটু যুক্তি আছে।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মে তারিখে গৌরদাস বসাককে লিখিত চিঠিতে মধুসূদন বলিতেছেন যে তিনি পদ্মাবতী নাটকের চতুর্থ অঙ্ক পাইকপাড়া রাজ-ভ্রাতৃদ্বয়কে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু পদ্মাবতীর এই চতুর্থ অঙ্কেই মধুসূদন কলির স্বগতোক্তিতে একবার এবং তাঁহার সহিত শচী ও মুরজার কথোপথনে আর একবার অমিত্রাক্ষর ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু এই চিঠিতে এ সম্পর্কে কোনো বিশেষ উল্লেখ মধু করেন নাই এবং রাজারাও এই নাটকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিলেও অমিত্রাক্ষর সম্পর্কে বিশেষ কোনো বিস্ময় প্রকাশ করেন নাই। ইহাতে কি ইহাই প্রমাণিত হয় না যে মধুসূদন আগেই তিলোত্তমাসম্ভব রচনা করিয়া সকলের বিস্ময়ের ঘোর কাটাইয়া দিয়াছেন; তাই এ সম্পর্কে আর বিশেষ কেহ মন্তব্য করিতেছেন না। তিলোত্তমাসম্ভবের পরে মধুসূদন এখন নাটকে অমিত্রাক্ষরের প্রয়োগ সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করিয়াছেন পদ্মাবতীতে। এই সিদ্ধান্ত যথার্থ হইলে সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণে পদ্মাবতীর ভূমিকায় যে সম্পাদকদ্বয় মন্তব্য করিয়াছেন, 'পদ্মাবতী নাটকে তিনি সর্বপ্রথম এই ছন্দের প্রবর্তন করেন' তাহা যুক্তিসহ বলিয়া বোধ হয় না; এবং সাহিত্য সাধকচরিত-মালায় 'মধুসূদন' গ্রন্থে ব্রজেন বাবু যে মন্তব্য করিয়াছেন, '১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দে তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যের প্রথম দুই সর্গ রচনা করেন", তাহাও হিসাবের ধোপে টেঁকে না। হয় ধরিয়া লইতে হইবে শর্মিষ্ঠা রচনার পরেই মধুসূদন অমিত্রাক্ষরে হাত দিয়াছিলেন; না হয় ত পদ্মাবতীতেই তিনি অমিত্রাক্ষরের প্রথম পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এবং তাহাও অমিত সাহসের সঙ্গে নাটকীয় সংলাপে। তুলনা করিলে দেখা যায় ইংরাজ কবি মার্লো তাঁহার প্রথম অমিত্রাক্ষর নাটক Tamburlaineএ কথোপকথনের ক্ষেত্রে যে স্বাচ্ছন্দ্য ও গম্ভ-ঝঙ্কার আয়ত্ত করিতে পারেন নাই,

মধুসূদন অনেক খানি তাহা পারিয়াছেন। তিনি যে কেন ঐ পথে আর অগ্রসর হইলেন না তাহা দুর্বোধ্য বিস্ময়।

তিলোত্তমাসম্ভব বা পদ্মাবতী যেটিই অমিত্রাক্ষরের প্রথম নিদর্শন হউক না কেন উহা যে শর্মিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই লিখিত হইয়াছিল এবং ঐ রচনা যে যতীন্দ্রমোহন বা পরবর্তীকালের তাঁহার মতানুবর্তীদের বিশ্বাস অনুযায়ী ৩ বা ৪ দিনের ভূমিস্ফোটক নয়; মধুসূদন শর্মিষ্ঠা নাটক রচনাকালেই যে নাটকের যথার্থ বাহন হিসাবে, ইংরাজী রেনেসাঁর নাট্যকারদের মত, অমিত্রাক্ষরের কথাই গভীরভাবে চিন্তা করিতেছিলেন, এবং যতীন্দ্রমোহনের আহ্বান শুধু নির্মীয়মান অগ্নিতে স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করিল মাত্র—ইহাই আমাদের প্রামাণ্য। অবশ্য ইহাতে হয়ত আকস্মিকতার চমক কিছু কমিয়া যাইবে; হয়ত কেহ কেহ—যাঁহারা মধুসূদনের কৃতি অপেক্ষা চমক লইয়া বেশী বাড়াবড়ি করিতে ইচ্ছুক—ক্ষুণ্ণ হইবেন; কিন্তু ইহাই সত্য কথা। শুধু সাহিত্যে কেন, জীবনের যে কোন কর্মক্ষেত্রে দীর্ঘ সাধনা ভিন্ন গভীর সিদ্ধি-লাভ সম্ভব নয়। হয়ত সে সাধনা সব সময় প্রকট নয়; হয়ত তাহার পরিমাণ ও গভীরতা সাধকের নিজের কাছেও স্পষ্ট নয়; তবু উহা আছে।

হিন্দু কলেজের যুগ হইতে, শিবপুর কলেজে ও মাদ্রাজে তাঁহার বিপুল ও অশ্রুতপূর্ব প্রস্তুতির কথা কাহারও অজানা নাই; এমন কি রবীন্দ্রনাথও এমন প্রস্তুতি লইয়া কবিজীবন শুরু করেন নাই। কিন্তু সেই প্রস্তুতিপর্ব সমাপ্ত করিয়া, বাংলাছন্দের আদিতম রূপ পয়ারের প্রকৃতি সম্পূর্ণ অনুধাবন করিয়া, তাহাকে ঢালিয়া সাজিলেন যে কবি, তিনি নিজে কিন্তু তাঁহার সৃষ্টির সম্যক্ বিশ্লেষণ করিতে পারেন নাই। নূতন যতি-পাত সম্পর্কে সামান্য কিছু আলোচনা রাজনারায়ণের কাছে লিখিত এক চিঠিতে এবং সংস্কৃত ভাষার ঐশ্বর্য সম্পর্কে সামান্য আলোচনা যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে ছাড়া, আর কোথাও বিশেষ কিছু তিনি বলেন নাই। ইহাই মধুসূদনের সংশ্লেষণী (synthetic) প্রতিভার পক্ষে স্বাভাবিক। সৃষ্টির পুলকমগ্ন কবির পক্ষে এই ছন্দ-সৃষ্টির ইতিহাস রচনা করা বা ইহার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা অসম্ভব। কবি শুধু আপন রচিত সৌধের অভ্যন্তরে দাঁড়াইয়া পুষ্পের অভ্যন্তরে মধুমক্ষিকার মত সৃজনমাধুর্যে মগ্ন—তিনি শুধু বাইবেলের ঈশ্বরের মত বলিয়া উঠিতে পারিতেন—It is good!

যে ভাবাবেগে মধুসূদন বিশ্বকর্মার তিলোত্তমাকে বাংলার মনোভূমিতে নামাইয়া আনিয়া বাঙালীর চিত্তকে রোমান্টিক আদর্শে বাঙ্ময় করিয়া তুলিলেন সেই ভাবাবেগেই তিনি সৃষ্টি করিলেন অমিত্রাক্ষর। একই বাঁধ ভাঙার প্রবর্তনা হইতে আসিল নূতন ভাব ও ছন্দ। নিজের সৃষ্টিতে নিজের বিস্ময় বাল্মীকির

হয়ত হইয়াছিল কিন্তু সেই বিস্ময়-বিমূঢ়তার যে চিত্র রবীন্দ্রনাথ ভাষা ও ছন্দে আঁকিয়াছেন তাহা কি অমিত্রাক্ষরের জনক মধুসূদনের প্রতি বেশী প্রযোজ্য নয়? বেশী এই জন্য বলিতেছি যে, মধুসূদন আমাদেরই মত এই যুগের অতি কাছের রক্ত মাংসের মানুষ এবং সংস্কৃত মহাকাব্যের প্রগাঢ় ধ্বনি-সুষমা ও ধ্বনিগৌরব তিনিই প্রথম আমাদের শুনাইলেন। তাঁহার আনন্দ সহৃদয়ের হৃদয়ে সংবেদিত হইবার ব্যাকুলতায় মুদির দোকানে পর্যন্ত নিজেকে বিলাইয়া দিতে গিয়াছিল। মিলটন এলিজাবেথীয় যুগের ঐ কীর্তির পরেও বলার প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন যে ছন্দের চরণে মিলের বেড়ী দেওয়া অমার্জিত রুচির পরিচায়ক (vulgar); তবু তাঁহাকে ত মিলের বেড়ী ভাঙার দায়িত্ব লইতে হয় নাই। বাংলাভাষার ক্ষেত্রে যাঁহাকে লইতে হইয়াছিল তাঁহার চেতনায় অমিত্রাক্ষর বাঙালীর চিত্তমুক্তির বহিঃপ্রকাশ হিসাবেই প্রতিভাত হইয়াছিল। মিত্রাক্ষর হইতে অমিত্রাক্ষরে উত্তরণের মুখে ব্যঙ্গ করিয়া মার্লো বলিতেছেন:

> From jigging veins of riming mother wits,
> And such conceits as clownage keeps in pay,
> We'll lead you to the stately tent of war,
> Where you shall hear the scythian Tamburlaine
> ....with high astounding terms.[১৮১]

আর মধুসূদন বলিতেছেন, আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবেক, যখন এদেশে সর্ব্ব-সাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর-স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন।'[১৮২] মধুসূদনের ভাষায় মার্লোর অপেক্ষা বিনয় অনেক বেশী। তিনি এ বিষয়েও সচেতন যে 'এরূপ পরীক্ষাবৃক্ষের ফল সদ্যঃ পরিণত হয় না'। [১৮৩] এই বিনয় মধুসূদনের পক্ষে অরও বিস্ময়কর এই জন্য যে বাংলাভাষায় মধুসূদন অমিত্রাক্ষরের জনক, ইংরাজী ভাষায় মার্লো তাহা নহেন। তাঁহার আগে শুধু Blank verseএর সৃষ্টিই হইয়াছে তাহা নহে, ট্র্যাজিডিতে তাহার প্রয়োগও হইয়া গিয়াছে। তবে মার্লোর সৃষ্টিতেই অমিত্রাক্ষরের প্রকৃত রূপের প্রথম বিকাশ। মার্লোর মধ্যেই ইংরাজী রেনেসাঁর যেমন উত্তুঙ্গ স্ফুরণ, মধুসূদনেও তেমনি বাংলার নবযুগের; এবং মার্লোও যেমন তাঁহার প্রথম (?) অমিত্রাক্ষর নাটকে, নায়ক করিয়াছিলেন, তৎকালীয় ইউরোপের চোখে বর্বর, নৃশংস তৈমুরলংকে—শুধু তাহার মধ্যে নবযুগের ব্যক্তির দুর্নিবার পৌরুষ এবং স্বাধীনতার স্পৃহা ছিল বলিয়া [Poetry (of Tamburlaine) seems inherent

in anything surcharged with energy and exultation......
We cannot but believe that Marlowe saw in the spirit of Tamburlaine secret springs of desire........The sense of stir and expectation in the great speeches promise the discovery and disclosure of some profound truth of man's spirit, of some hitherto hidden source of his aspiration ; the capturing of an ideal, shadowy vision, part sense and part intellect, part thought and part emotion.

Our souls, whose faculties can comprehend
The wondrous architecture of the world
And measure every wandering planet's course
Still climbing after knowledge infinite····

these are the true theme of the play that Marlowe conceived and only partially carried forward from conception to execution.—U. M. Ellis-Fermor—Introduction to her edition of the Tamburlaine, pp 58-60], মধুসূদনও তেমনি প্রথমে সুন্দোপসুন্দকে এবং পরে মেঘনাদকে নির্বাচন করিয়াছিলেন অনুরূপ কারণে। এক কথায় বলিতে গেলে, একই অনুপ্রেরণার বশে মধুসূদন ভাব ও ছন্দের বেড়ী ভাঙিয়াছিলেন। শুধু মাত্র অমিত্রাক্ষরের নমুনা রচনা তিলোত্তমা সম্ভবে মধুসূদনের উদ্দেশ্য ছিল না এ কথা এই আলোচনা হইতে নিশ্চয়ই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণের ভূমিকায় সম্পাদকদ্বয় বলিতেছেন, "একটি কথা আমাদিগকে সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে, এই কাব্যে মধুসূদনের প্রধান লক্ষ্য ছিল ছন্দ, কাব্যের বিষয়বস্তু নির্দ্ধারণ অথবা কবিত্বশক্তির প্রয়োগ গৌণভাবে করা হইয়াছে।" এই মন্তব্য অত্যন্ত অগভীর মননের পরিচায়ক। এবং ঐ সংস্করণের ভূমিকার প্রথমে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের যে মন্তব্য উদ্ধার করা হইয়াছে তাহাই তিলোত্তমাসম্ভবের প্রথম এবং আজ পর্যন্ত গভীরতায় অনতিক্রান্ত মূল্যায়ন : 'আমরা মাইকেলের তিলোত্তমাসম্ভব প্রকাশ হইতে নূতন সাহিত্যের উৎপত্তি ধরিয়া লইব। যদি ইহার পূর্বে এরূপ নূতন সাহিত্যের কিছু থাকে, কেহ আমাদিগের সেই ভ্রমান্ধকার দূর করিয়া দিলে একান্ত বাধিত হইব।'

মোহিতলাল মজুমদার মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের আলোচনায় অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়-কৃত ইহার নূতন নামকরণের (অমিতাক্ষর) যথাযথ সমালোচনাই

করিয়াছেন কিন্তু এই ছন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে আর একটি যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা আবার মধুসূদনের প্রতিভার প্রকৃতি-বিরোধী। "মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর লিরিক ত নহেই, এমন কি উহা নাটক গোত্রীয়ও নয়—খাঁটি এপিকের অমিত্রাক্ষর" (শ্রীমধুসূদন পৃ ১৯৮)। পূর্বে মধুসূদনের প্রতিভার যে লিরিক-ধর্মিতার কথা আলোচিত ও প্রমাণিত হইয়াছে তাহাই মোহিতলালের মন্তব্যের বিরোধী। বাস্তবিক মধুসূদনের প্রতিভা যদি মূলত মহাকাব্য-ধর্মী হইত তাহা হইলে অত সহজে ঐ বিষয়ে কবির ক্লান্তি আসিত না। তিনি রাজনারায়ণকে মেঘনাদবধ রচনা করিবার পরেই লিখিতেছেন, "I shall never again attempt anything in the heroic line. Meghnad and Tilottama ought to satisfy the most poetical appetite in the age."[১৮৪] ইহার আগে লিখিয়াছেন, "But I suppose I must bid adieu to heroic poetry after Meghnad. A fresh attempt will be something like a repetition. But there is the wide field of Romantic and Lyric poetry for me, and *I think I have a tendency in the lyrical way*।[১৮৫] ইহা মধুসূদনেরই স্বীকৃতি। এ কথা ঠিক যে মহাকাব্য রচনার প্রকৃত মাধ্যম মধুসূদন আবিস্কার করিয়াছিলেন কিন্তু **তাঁহার বিদ্রোহী ব্যক্তি-মানস প্রথম মুক্তির উল্লাসে এবং যুগপৎ সেই মুক্তিপুষ্ট সার্থক জীবনের অসম্ভাব্যতায় এমন অস্থির হইয়া উঠিল যে সার্থক ও সম্পূর্ণাঙ্গ মহাকাব্য রচনা করিবার মত মানসিক স্থিতি সে অর্জন করিয়া উঠিতে পারিল না;** হৃদয়ের অগ্নিগভ বাষ্প বাহিরে উৎক্ষেপ করিয়া দিয়া নিজের অন্তর্জ্বালায় নিজেই দগ্ধ হইল। তিলোত্তমায় সুন্দরের আরতি করিয়াই কবি মেঘনাদবধের করুণ বিলাপে মগ্ন হইলেন। আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসই (lyricism) এই কবির প্রধান বৈশিষ্ট্য। মেঘনাদবধে কোন কোন জায়গায় মহাকাব্যের বস্তুপ্রধান (objective) নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) সুর লাগিয়াছে বটে কিন্তু সে কথা গৌণ। তিলোত্তমাসম্ভবে মহাকাব্যের সুর লাগে নাই বলিলেই চলে।

মেঘনাদবধ কাব্য

ক

সেকালের অনেক সমালোচক এবং এ কালেও কেহ কেহ মেঘনাদবধকে বীররসাত্মক মনে করিলেও চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিয়াছেন যে কাব্যখানি করুণরসাত্মক এবং মধুসূদন নিজেও যে এ কথা ভালো করিয়াই উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা রাজনারায়ণকে লেখা তাঁহার বহু চিঠিতেই স্পষ্ট। দুইখানি উদ্ধার করিলেই যথেষ্ট হইবে: "Do not be frightened, my dear fellow, I won't trouble my readers with Vira ras (বীররস)" এবং "I can tell you that you have to shed many a tear for the glorious Rakshasas, for poor Lakshana, for Promila. I never thought, I was such a fellow for the pathetic." (২ খানিই জীবনচরিত হইতে উদ্ধৃত; পৃঃ ৩১৩, ৪৮৫)। কিন্তু কাব্য লিখিতে বসিবার অব্যবহিত আগে পর্যন্ত মধুসূদনের এ পরিকল্পনা ছিল না। এমন কি রচনা আরম্ভ করিয়াও তিনি বলিতেছেন,........'গাইব, মা, বীররসে ভাসি, মহাগীত।" মহাকাব্যের উপযুক্ত বিষয়বস্তু তিনি সন্ধান করিতেছিলেন। রাজানারায়ণ বসু তৎকাল-প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী বাঙালীর ছেলে বিজয়সিংহের সিংহল-বিজয় কাহিনীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়া মধুসূদনকে উক্ত বিষয় অবলম্বনে মহাকাব্য রচনা করিতে অনুরোধ করিলেন। মধুসূদন প্রত্যুত্তরে লিখিলেন যে বিষয়টি মহাকাব্যের উপযুক্ত বটে: "The subject you propose for a national epic is good—very good indeed." [১৮৬] কিন্তু 'But I don't think I have as yet acquired a sufficient mastery over the "Art of Poetry" to do it justice. So you must wait a few years more. In the meantime, I am going to celebrate the death of my favouirte Indrajit."[১৮৭] কয়েক বছর পরে আর তাঁহার সময় হয় নাই; এমন কি তিনি আর মহাকাব্য রচনা করিবেন না বা করিতে পারিবেন না বলিয়াই যেন বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে ইন্দ্রজিতের অকাল-মৃত্যু তাঁহার মনোহরণ করিল। সিংহলবিজয় কাহিনী সম্পর্কে উচ্ছ্বাস প্রকাশে কিন্তু তিনি পরেও কার্পণ্য করেন নাই; বরং ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে তিনি আবার রাজনারায়ণকে লিখিতেছেন, "Give me the সিংহল, old

boy. I like a subject with oceanic and mountain seenery, sea-voyages, battles, and love-adventures. It gives a fellow's invention such a wide scope."[১৮৮] কিন্তু আরম্ভ করিয়াও সিংহলবিজয় লেখা হইল না। **সেই সিংহলের কথাই লিখিলেন কিন্তু তাহার নবপ্রতিষ্ঠার কাহিনী নহে, তাহার ধ্বংসের কাহিনী।**

সিংহলবিজয়ী কাহিনী কেন মহাকাব্যের যোগ্য বিষয় তাহার আলোচনা করিয়া রাজনারায়ণ লিখিয়াছিলেন, "The conquest of ceylon by the Bengali prince Vijaya and his companions, is, I think, a nice subject for an Epic poem to be called the Sinhala-vijaya kavya....The poet may institute in it *a comparison between the present and former state of Bengal* and while doing so he may allude to the Bengali king Bhagodatta, pompously styled in the Mahabharata as 'the sovereign of the south and east', who, as the ally of the Rajah of Magadha, accompanied him to the war of the Kurus and the Pandus,—to the merchants Chand, Dhanapati, and Srimanta, the best two of whom performed voyages to Ceylon—to the kings of the Pal dynasty, who, according to Ayeen Akbari and certain inscriptions, conquered the whole of India,—to Dheesena the son of Adisoor who according to the said work took possession of Delhi which from his time for centuries continued to form a portion ot the Bengali dominions, and to Protapaditya of recent times who with his 52000 shieldsmen, coped with the generals of Jehangir. If there be no strong proof of one or two of the above facts, still there is no harm in availing one's self of them in poetry. The aforesaid comparison and *the contrast between* the beauty and fertility of Bengal called by an emperor of Delhi 'The Paradise of Regions' and the timidity and servility of its present inhabitants, unworthy of such a beautiful country, would give much *scope for pathetic lamentation,* as that of

Derozio at the commencement of the Fakeer of Jangheera' with ref. to India,....and *for passionate exhortation about our supine and unenergetic countrymen*....Vijaya was not a virtuous though a heroic prince, but the poet, like another Valmiki, should pass over his faults or depict them in the softest manner possible. Poetry is different from history ; I have ressons to suspect *that Rama was not the personification of virtue nor Ravana the incarnation of wickedness* [মধুসূদনের মনোভাবের সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষণীয়] as Valmiki has represented them to be........

An epic poem like the one suggested above is much required *to infuse patriotic zeal and a warlike spirit into the breasts of our degenerate countrymen.* It is sure that a hundred far more powerful agencies are required to bring about that mighty change, but the poet also must lend his aid to the good work."[১৮৯]

'Scope for pathetic lamentation' এবং সমুদ্র-পর্বতের ও প্রেমাভিসারের দৃশ্যাবলী থাকা সত্ত্বেও ঐ বিষয়বস্তুটি মধুসূদনের মনে মধুচক্র রচনা করিতে পারে নাই। বিজয়সিংহের সিংহলবিজয়ের কাহিনী অপেক্ষা মহররমের কাহিনী তাঁহার মনে গভীরতর রেখাপাত করিয়াছিল ; "We have just got over the noise of the Mohorrum. I tell you what ;—if a great poet were to rise among the Mussalmans of India, he could write a maginificent Epic on the death of Hossen and his brother. He could enlist the feelings of the whole race on his behalf. We have no such subject."[১৯০]

আমাদের রামায়ণ আর মহাভারত, বিশেষ করিয়া কাশীদাসী এবং কৃত্তিবাসী সংস্করণ, অতিমানুষদের আর অপমানুষদের কাহিনী—মানুষের কাহিনী নয়। অবশ্য এ কথা ঠিক যে এই অতিমানবীয় কাহিনীর পাত্র-পাত্রীদের মধ্য দিয়াই বাল্মীকি এবং ব্যাস মানবীয় গুণাবলীর স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন ; তবু রাম এবং কৃষ্ণ কেহই শুধু মানুষ বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। কৃষ্ণকে লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র চেষ্টা করিয়াছেন ; রামকে লইয়াও,

কৃত্তিবাসের ভক্তির আতিশয্যকে দোষ দিয়া, অনেক কথা লেখা হইয়াছে। কিন্তু উত্তরভারতে তুলসীদাস আর এদিকে কৃত্তিবাস—এই দুই জনেই রামকে জনপ্রিয় করিয়াছেন, অতিমানব করিয়া, মানবীয় স্তরে নামাইয়া আনিয়া নহে। আবার এ কথা কি সত্য যে, বাল্মীকির রাম অবতার নহেন, মহৎ মানুষ মাত্র? মূল রামায়ণে আদর্শ চরিত্রের যে বর্ণনার পরে নারদ, রামের নাম সেই আদর্শ চরিত্র হিসাবে, প্রস্তাব করিলেন, সেই আদর্শ চরিত্র কি কোনো মানুষের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব? আর যদি বা সম্ভব হয়ও তাহা হইলে সে চরিত্র, আর মানবীয় চরিত্র থাকে না। 'সর্বগুণান্বিতা লক্ষ্মী' যাঁহাকে আশ্রয় করিবেন তিনি আমাদের পক্ষে ভগবানেরই তুল্য এবং সাহিত্যে ভগবানের চরিত্রের কোনো মূল্য নাই, কেন না, সাহিত্যিক যে মানুষকে লইয়া কারবার করেন সে মানুষ দোষে-গুণে তৈয়ারী। ভগবান নির্দোষ এবং সর্বপ্রকারের দুর্বলতাবিহীন হওয়ায় সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে চরিত্রহীন—তাঁহার কোনো চরিত্রই নাই।

রেনেসাঁ যুগে ঐহিকতা (secularism) যখন নব্যবঙ্গের চেতনার মূল কথা, মানবতাবাদ (humanism) যখন তাহার জীবন-দর্শন, সর্বৈশ্বর্যে ভরা জীবনের চিন্তায় যখন সে মশগুল [যাহার আস্বাদন ইউরোপে যাইয়া পাইবার পর মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে লিখিতেছেন, "I wish I could live here all the days of my life...This is unquestionably the best quarter of the globe. I have better dinners for a few francs than the Raja of Burdwan ever dreams of! I can for a few francs enjoy pleasures that it would cost him half his enormous wealth to command, no, even that would be too little. Such music, such dancing, such beauty! This is the অমরাবতী of our ancestral creed. Come here and you will soon forget *that you spring from a degraded and subject race.*" সা. সা. চ ·পৃ ৭৩] তখন সেই রেনেসাঁর যিনি মুখপাত্র সেই মধুসূদন যে রামকে ভক্তিভরে প্রণাম করিবেন না ইহাই ত স্বাভাবিক। এই বিদ্রোহীর ঐহিকতার প্রকাশ আমরা তিলোত্তমাসম্ভবেই দেখিয়াছি; এমন কি শর্মিষ্ঠাতেও। তিলোত্তমায় ইন্দ্রের তেজোহীনতার জন্য তিনি Fate এর দোহাই পড়িয়াছিলেন। কিন্তু মেঘনাদবধে আসিয়া তিনি আর কিছু গোপন করিতে বা বলিতে দ্বিধা করিতে, রাজী নহেন: (People here grumble and say that the heart of the poet in Meghnad is with

the Rakshasas. And that is the real truth. I despise Ram and his rabble; but the idea of Ravana, elevates and kindles my imagination; he was a grand fellow"[১৯১] তিনি মানুষকে না পাইয়া, তথাকথিত রাক্ষসত্বকে orginal sin না ভাবিয়া, তাহাকেই করিলেন নূতন যুগের ব্যক্তির পৌরুষের আধার—সে অন্তত ধর্মের দোহাই দিয়া সব বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারিবে না; সব কিছুই তাহাকে করিতে হইবে আত্মশক্তির বলে; পদে পদে দেবতারা আসিয়া প্রচেষ্টার আগেই তাহাকে সার্থকতা দান করিয়া যাইবেন না! এই যে স্বপ্রতিষ্ঠ মানুষকে তিনি চাহিতেছিলেন, মহর্‌রমের কাহিনী ত সেই রকম মানুষেরই। নিজের বিশ্বাসের জন্য ঐ কাহিনীতে প্রাণ দিতেছে যাহারা তাহাদের কোনো অতি-মানবীয় গুণ নাই। তাহাদের মহত্ত্ব শুধু আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তায় আদর্শের জন্য প্রাণ দিবার সাহসে। সেই মানুষেরা সমগ্র আরববাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল নবজীবনের মন্ত্রে। তাই ইসলাম আবির্ভূত হইয়াছিল ঐ শক্তি লইয়া; কেহ তাহাকে রুখিতে পারে নাই। হোসেন নবজাগ্রত আরবজাতির এবং এক অর্থে সমগ্র ইস্‌লামীয় জগতের পৌরুষের প্রতীক।

কিন্তু তবু মহর্‌-রমের কাহিনী 'বিষাদসিন্ধু'। নূতন জীবনের স্পর্শ ইসলাম দিতে চাহিয়াছিল সমগ্র জাতিকে কিন্তু মানুষেরই বিশ্বাসঘাতকতায়, হোসেনের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল, কোনো দেবীর হস্তক্ষেপে অথবা নিয়তির প্রকোপে নয়। কারবালা ক্ষেত্রের অসম যুদ্ধের যে পরিণতি ঘটিল, কার্য-কারণের বিধি অনুসারে তাহাই ঘটা উচিত; সে পরিণতি অতিপ্রাকৃতের ক্ষণ-ক্ষণান্তরের অনধিকার প্রবেশে রামায়ণের অথবা মহাভারতের 'ধর্মযুদ্ধে' রূপান্তরিত হয় নাই। সামান্য জলের অভাবে হোসেনের সঙ্গীরা প্রাণত্যাগ করিল আর গুপ্ত ঘাতক হত্যা করিল হোসেনকে। এমনি করিয়া মহম্মদের শেষ ইচ্ছা দুরাকাঙ্ক্ষ এজিদ পদদলিত করিয়া ক্ষমতায় আসীন হইল—শিয়াদের পরাজয় ঘটিল সুন্নিদের হাতে। এ পরাজয় কিন্তু শুধু শিয়াদেরই পরাজয় নয়, এ পরাজয় ইসলামের আদর্শেরই পরাজয় স্থূল-ক্ষমতা-মত্ত এজিদের হাতে; আর এ পরাজয়ের গৌরবের দিক হইল হোসেনের আত্মবলিদান। সেই আত্মবলিদানের গৌরব, সাহস, ও মর্যাদাবোধ জাতির মধ্যে সঞ্চারিত করাই মহর্‌রমের উদ্দেশ্য।

এই বিষাদ-কাহিনী মধুসূদনের মনে এমন অনুরণন জাগাইল কেন? মেঘনাদবধ কাব্যের আরম্ভে বিলাপ শেষেও বিলাপ, মধ্যে শুধু আশার ছলনা। ইহার মঙ্গলাচরণ বীরবাহুর মৃত্যুতে আর কথাশেষ মেঘনাদের চিতারোহণে:

এ হেন সভায় বসে রক্ষঃ কুলপতি,
বাক্যহীন পুত্রশোকে! ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসনে,
যথা তরু, তীক্ষ্ণ শর সরস শরীরে
বাজিলে, কাঁদে নীরবে। ....[১ম সর্গ]

[রাবণের নীরবে অশ্রুপাত দিয়া মহাকাব্যের আরম্ভ; আর বাল্মীকির যে শোক শ্লোকত্ব প্রাপ্ত হইল সে শোক কিন্তু রাম আর সীতার জন্যই। বাল্মীকির শোকে আর মধুসূদনের শোকে মূলগত পার্থক্য: **বাস্তব জীবনে ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া রামের লাঞ্ছনায় বাল্মীকির বেদনা; আর বাস্তব জীবনে পৌরুষের পরাজয় এবং তথাকথিত-আচার-সর্বস্ব ধর্মের জয়ে মধুসূদনের বেদনা**। রাবণের শেষ বিলাপ যেন মধুসূদনেরই 'আত্মবিলাপ।' রাবণকে যেমন আশা ছলনা করিয়াছে তেমনি করিয়াছে মধুসূদনকে:

ছিল **আশা**, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে;........
ছিল **আশা**, রক্ষঃকুল-রাজ-সিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে,........
........বৃথা **আশা**! পূর্ব জন্মফলে
হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল-আসনে!....[৯ম সর্গ]

আর মধুসূদন বিলাপ করিতেছেন, মেঘনাদবধ রচনা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই (১৮৬১ খ্রীঃ শেষ ভাগে—সা স চ পৃ ৫৬)

নিশার স্বপনসুখে* সুখী যে, কি সুখ তার?
জাগে সে কাঁদিতে।
ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার
পথিকে ধাঁদিতে।
মরীচিকা মরুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষাক্লেশে
এ তিনের ছল সম ছলরে এ **কু-আশার**

শুধু যে রাবণই এই মহাকাব্যে বিলাপ করিতেছেন তাহা নহে, সীতাও বিলাপিনী। তিনি বুঝিয়াছেন তিনি যেখানেই যাইবেন সেইখানেই দুঃখ ডাকিয়া আনিবেন। তাঁহার দুঃখের কাহিনী মেঘনাদবধের বিলাপ-ধ্বনিকে

[* তুলনীয় রাবণের উক্তি: নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা, রে দূত! পংক্তি ৮১, প্রথম সর্গ, মেঘনাদবধ।

বহুবিস্তৃত করিবে বলিয়াই সীতা ও সরমাকে মধুসূদন কাব্যে গ্রহণ করিয়াছেন।

রাবণের জীবনে এই সর্বনাশ আসিল কেন? সীতাকে হরণ করিয়া আনিয়াছেন বলিয়া? সে কথা চিত্রাঙ্গদা ত রাবণকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন:

কে, কহ, এ কাল অগ্নি জ্বলিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে? হায়, নাথ, নিজকর্মফলে,
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলে আপনি।....[১ম সর্গ]

রাবণ যে এ অভিযোগ অস্বীকার করেন তাহা নহে। কিন্তু সীতাহরণ তিনি করিয়াছিলেন সূর্পণখার দুঃখে দুঃখী হইয়া, নিজের উপভোগের জন্য নয়:

........হায়, সূর্পণখা
কি কুক্ষণে দেখেছিলি তুই রে অভাগী,
কাল পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে? কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখারূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে?

"ভগ্নীর অপমানে নিজের প্রতাপশ্রী এবং রাজ্যশ্রীকে অবমানিত মনে করিয়া আততায়ী রামের সঙ্গে সমুচিত শত্রুতা এবং স্বকীয় অপমানের প্রতিশোধ সাধনের উদ্দেশ্যেই মধুসূদনের রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ। সে জন্যই মধুসূদনের রাবণ সীতার সতীত্বধর্মের উপর কিছুমাত্র বল প্রকাশ করিতে পারে নাই।"[১৯১]
[মূল রামায়ণে কিন্তু রাবণ সীতাকে ক্রোধে প্রাতরাশ করিতে গিয়াছিলেন]

কিন্তু এ স্বীকৃতিও বাহ্য। সমস্ত কাব্য জুড়িয়া রাবণের শুধু একটি প্রশ্ন উত্তরের আশায় ঘুরিয়া মরিতেছে। সেটি হইল:

হে মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মি! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে?" (নবম সর্গ)

অন্তত পক্ষে ত্রিশ বার রাবণ এই প্রশ্ন করিয়াছেন সমস্ত কাব্যখানিতে। যেমন এই কাব্যের বিলাপেই শুরু আর বিলাপেই শেষ, তেমনি এই প্রশ্নেই ইহার স্থিতি। প্রথম সর্গেই রাবণ বলিয়া উঠিতেছেন:

কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই?

আবার এই প্রশ্নেরই পুনরুক্তি শেষ সর্গে। ইহাই মেঘনাদবধ কাব্যের মূল প্রশ্ন বলিয়া, সীতাকে কাব্যে স্থান না দিলেই যে ভালো হইত ইহা

মধুসূদন ভালো করিয়াই বুঝিয়াছিলেন। তিনি রাজনারায়ণকে লিখিতেছেন: "Perhaps the episode of Sita's abduction (Fourth Book) should not have been admitted, since it is scarcely connected with the progress of the Fable. But would you willingly part with it ?"[১৯৪] অর্থাৎ মধুসূদনের মতে সীতাহরণের বৃত্তান্তের আর রাবণের সর্বনাশের বৃত্তান্তের মধ্যে কোন যোগাযোগই নাই। বাল্মীকির রামায়ণের বিরুদ্ধাচরণ ইহার অপেক্ষা বেশী আর কি হইতে পারে? কিন্তু ইহাই মেঘনাদবধ কাব্যের অন্তর্নিহিত সত্য। মেঘনাদবধের কবির কাছে সীতাহরণের ঘটনাটি প্রক্ষিপ্ত মাত্র। উহা কোন কথাই নহে। রাবণের দীপ্ত পৌরুষের মূর্ত প্রকাশ ইন্দ্রজিতের পতনের কোনো কারণই কবি খুঁজিয়া পাইতেছেন না। এই অকারণ সর্বনাশের জন্যই রাবণের বিলাপ এবং সেইজন্যই এ বিলাপ এত করুণ। কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া বারে বারে রাবণ বিধির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন না যে ইহা তাঁহার পূর্বজন্মকৃত পাপের ফল—প্রাক্তন। এবং কবিও তাহা বিশ্বাস করেন না। তাহা করিলে, নিয়তির বিধান নিষ্ঠুর হইলেও তাহাই যে যথাযথ ইহা কবি কাব্যে প্রতিপাদন করিতেন—যেমন করিয়াছেন গ্রীক নাট্যকারেরা। কিন্তু 'বিধি বিধি' বলিয়াও রাবণ কেবল ব্যর্থ আক্রোশে এবং শেষ পর্যন্ত মর্মন্তুদ ক্রন্দনে বেলাভূমি ভরিয়া দিলেন—একান্ত নিষ্কারণে এই সর্বনাশের কোনো কূল-কিনারাই তিনি করিতে পারিলেন না।

পৌরুষের এই অহেতুক পরাজয়ে মধুসূদনের চিত্ত আলোড়িত হইল, কেন না এই পরাজয়, এই ব্যর্থতা শুধু মধুসূদনের ব্যক্তি-জীবনের নয়, তৎকালীন সমাজ জীবনের অন্তর্গূঢ় সত্য। এবং এই ব্যর্থতার বেদনাকে রূপ দিয়াছেন বলিয়াই মধুসূদন যুগন্ধর—যুগ-সত্যটিকে তিনি কাব্যে যথাযথ ধারণ করিয়াছেন। কবি-চিত্তে, হয়ত তাঁহার অজ্ঞাতেই এই যুগসত্য প্রতিভাত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি মেঘনাদের কাহিনী নির্বাচন করিয়াছিলেন এবং রাবণের মাধ্যমে, প্রচণ্ড পৌরুষের অহেতুক বিনাশে, মর্মভেদী বিলাপ করিয়াছেন। প্রথম, দ্বিতীয় (পৃ ৪৬-৭৭, ও পৃ ১০৫—১১২) এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে নবজাগ্রত, নব আদর্শে উদ্বুদ্ধ, নব সার্থকতার জন্য উন্মুখ স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ স্ফুরণের পথে রাজনৈতিক পরাধীনতা যে বাধা দিতেছিল এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পরে যে বাধা একেবারে অলঙ্ঘ্য হইয়া উঠিল তাহা আলোচনা করিয়া দেখানো হইয়াছে ব্যক্তির জীবনে কি গভীর ব্যর্থতাবোধ নামিয়া আসিতেছিল। তৎকালীন সমাজ-সংস্কারের আন্দোলনে মধুসূদন প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ না করিলেও

প্রতিটি সংস্কার-আন্দোলন ও তাহার সাফল্য তাঁহাকে অনুপ্রাণনা জোগাইত। বিধবা-বিবাহের আইন পাশ হইয়া যাইবার পর তিনি বিদ্যাসাগরের মর্মরমূর্তি স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন; উমেশ মিত্রের বিধবা-বিবাহ নাটক তিনি বিনা পারিশ্রমিকে ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; নীলদর্পণের অনুবাদ ত করিয়াই ছিলেন—এমন কি রেঃ লঙের শাস্তি নিজে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এই সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যখন দেখি তিনি ফ্রান্স হইতে গৌরদাসকে লিখিতেছেন: "Come here and you will soon forget that you spring from a degraded and subject race. Here you are the master of your masters"[১৯৫] এবং তাহার পরেই যেন অন্তরের কথাটি বলিয়া ফেলিতেছেন, "Every one, whether high or low, will treat you as a man and not a "d-d nigger. But this is Europe, my Boy, and not India,"[১৯৫] তখন কি বুঝিতে বাকী থাকে মধুসূদনের মনের জ্বালা কোথায়? নবযুগের ব্যক্তি-স্বাধীনতার উদ্গাতা মধুসূদন চাহিয়াছিলেন যে মুক্ত ব্যক্তিসত্তার প্রচণ্ড পৌরুষ সকল বাধা অতিক্রম করিয়া জীবনে প্রাতিস্বিক সার্থকতা অর্জন করিবে, কিন্তু

> কুসুমদামসজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
> উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
> এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে
> শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী;
> নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী;

মেঘনাদ অকালে নিহত হইলেন বিশ্বাসঘাতকের সহায়তায়। তাহা না হইলে এই পৌরুষের অকাল-পতন ত কিছুতেই সম্ভব নয়। **ব্যক্তিসত্তার এই নির্বাধ স্ফুরণের জয়গানই হইতে পারিত মধুসূদনের মহাকাব্য কিন্তু সেই সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে তাহার অপমৃত্যুতে বিলাপই হইয়া উঠিল প্রধানতম কাব্য-সত্য।** মধুসূদনের tremendous rebellion[১৯৬] ব্যর্থতার চোরাবালিতে মুখ থুবড়াইয়া পড়িল। তবু এই প্রচণ্ড শক্তি, যাহার লীলা জীবনে ব্যাহত হইল, তাহার স্বীকৃতিই এই কাব্যের প্রাণ: "মেঘনাদবধ কাব্যে কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনাপ্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। এ পরিবর্তন আত্মবিস্মৃত নহে। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন এবং রামায়ণের সম্বন্ধে অনেকদিন হইতে আমাদের

মনে যে একটা বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে, স্পর্ধাপূর্বক তাহারও শাসন ভাঙিয়াছেন। এই কাব্যে রামলক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। যে ধর্মভীরুতা সর্বদাই কোন্‌টা কতটুকু ভালো ও কতটুকু মন্দ, তাহা কেবলি অতিসূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে, তাহার ত্যাগ, দৈন্য, আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন। এই শক্তির চারিদিকে প্রভূত ঐশ্বর্য; ইহার হর্ম্যচূড়া মেঘের পথ রোধ করিয়াছে; ইহার রথ-রথি-অশ্বে-গজে পৃথিবী কম্পমান; ইহা স্পর্ধাদ্বারা দেবতাদিগকে অভিভূত করিয়া বায়ু-অগ্নি-ইন্দ্রকে আপনার দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে; যাহা চায়, তাহার জন্য এই শক্তি শাস্ত্রের বা অস্ত্রের বা কোনো কিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে। এতদিনের সঞ্চিত অভ্রভেদী ঐশ্বর্য চারিদিকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে, সামান্য ভিখারী রাঘবের সহিত যুদ্ধে তাহার প্রাণের চেয়ে প্রিয় পুত্রপৌত্র-আত্মীয়স্বজনেরা একটি একটি করিয়া সকলেই মরিতেছে; তাহাদের জননীরা ধিক্কার দিয়া কাঁদিয়া যাইতেছে, তবু যে অটলশক্তি ভয়ঙ্কর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনোমতেই হার মানিতে চাহিতেছে না,—কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী **মহাদম্ভের** পরাভবে সমুদ্রতীরে শ্মশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে-শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে, তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া যে-শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।”[১৯৭]

রবীন্দ্রনাথ রাবণকে দেখিয়াছেন ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের প্রতীক হিসাবে। শশাঙ্কমোহন সেনও মধুসূদনের কাব্যপ্রকৃতি সম্পর্কে বলিতেছেন, “কিন্তু উহা যে একটা Titanic element, ভারতীয় আদর্শে একটা আসুরিক ভাব, তাহাও আমাদিগকে বুঝিয়া লইতে হইবে।”[১৯৮] এবং পরে আবার বলিতেছেন “মধুসূদনের এই জীবনগতি এবং নিয়তির আদ্যন্তমধ্যে একটা daemon আছে —একটা ডাকিনীশক্তি আছে...বায়রণীয় ডাকিনীশক্তির জ্বলন্ত অগ্নিমূর্তি.... সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই আগুনের প্রধান লক্ষণ ছিল ভাবোন্মত্ততা, অহমিকা, অহংমুখিতা, দম্ভ, আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং আসুরিক প্রচণ্ডতা।”[১৯৯] এবং এই সব কিছুর মূলীভূত কারণ হিসাবে ধরিয়াছেন পশ্চিমদেশ হইতে আগত ব্যক্তি-স্বাধীনতাবাদের উদ্দীপনাকে। রবীন্দ্রনাথের মনেও এই কথাই ছিল কিন্তু তিনি যে দুটি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে রসগ্রাহিতার উপর দিয়া তাঁহার মনের প্রতিকূলতাই পরিস্ফুট।

রবীন্দ্রনাথের ঐ দুটি শব্দপ্রয়োগ [ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভ] আমাদের মনে ইয়া দেয় তাঁহার পনের বছর বয়সের ভারতীতে লেখা সমালোচনা : "আর একটা বক্তব্য আছে,—মহৎ চরিত্রই যদি বা নূতন সৃষ্টি না করিতে পারিলেন—তবে কবি কোন মহৎ কল্পনার বশবর্তী হইয়া অন্যের সৃষ্ট মহৎ চরিত্র বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন? কবি বলেন I despise Rama and his rabble. সেটা বড় যশের কথা নহে—তাহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে, তিনি মহাকাব্য রচনার যোগ্য কবি নহেন। মহত্ত্ব দেখিয়া তাঁহার কল্পনা উত্তেজিত হয় না।.... দেবতাদিগকে কাপুরুষের অধম ও রাক্ষসদিগকে দেবতা হইতে উচ্চ করিলেন। এমনতর প্রকৃতি-বহির্ভূত আচরণ অবলম্বন করিয়া কোন কাব্য কি অধিকদিন বাঁচিতে পারে?........**এখনকার যুগের মনুষ্য-চরিত্রের উচ্চ আদর্শ তাঁহার কল্পনায় উদিত হইলে তাহা আর এক ছাঁদে লিখিতেন।** তিনি হোমারের পশুবলগত আদর্শকেই চোখের সম্মুখে খাড়া করিয়াছেন।"[২০০]

সাহিত্যসৃষ্টি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে পাশ্চাত্যের প্রচণ্ড সংঘাত নবজাগ্রত বাঙালীর মনে বিদ্রোহ জাগাইয়াছিল এবং সেই বিদ্রোহের প্রকৃতি-বিশ্লেষণে তিনি যখন তাহাকে ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভ বলিয়া চিহ্নিত করিলেন তখন রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নে আমাদেব দিশাহারা বোধ না করিয়া উপায় রহিল না। কারণ 'ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভ' কখনও মহাকাব্যের বিষয়বস্তু হইয়া এই এক শত বৎসর ধরিয়া বাঙালী পাঠকের সহানুভূতি এবং বিস্ময় উদ্রেক করিতে পারিত না। দম্ভ এমন বস্তু যে উহা পাঠককে সহৃদয় করিয়া তুলিবার বদলে দূরে ঠেলিয়া দেয়। দম্ভ কখনও সপ্রশংস স্বীকৃতি লাভ করিতে পারে না। দম্ভীকে কখনও সমগ্র জাতি, সমগ্র শিক্ষিত-সমাজ মহাকাব্যের নায়ক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। ইহা অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা যে রবীন্দ্রনাথ যাহাকে দম্ভ আখ্যা দিতেছেন তাহা যে আত্মসর্বস্বতা নয়, তাহা যে অন্ধ স্বার্থপরতা ও আত্মাদর নহে—বরং তাহা সৃষ্টির জন্য সার্থকতার জন্য উন্মুখ, আত্মসচেতন, স্বাধীনতাপ্রয়াসী ব্যক্তিসত্তার আকুলতা, ইহা রবীন্দ্রনাথ বুঝিলেন না কেন? অথচ রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন—

জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি' উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।

অথবা

মাতিয়া যখন উঠেছে পরাণ,
কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ,

উথলি যখন উঠেছে বাসনা,
জগতে তখন কিসের ডর!

তখন সেটা কি দম্ভ হয় না? আমার বাসনা উথলিয়া উঠিতেছে বলিয়া আমি জগতের কোনো কিছুকেই মানিব না, নিজের বাসনা চরিতার্থ করিব, ইহা কতখানি আত্মাদর এবং আত্মম্ভরিতার পরিচায়ক? সামান্য একটি ব্যক্তির এমন কি ক্ষমতা আছে যে সে বলিতে পারে

আমি ঢালিব করুণাধারা
আমি ভাঙিব পাষাণকারা
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগলপারা।

কিন্তু আমরা জানি এই চেতনাকে দম্ভ বলিলে ভুল করা হইবে—এমন কি সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাখ্যা করা হইবে। ইহা দম্ভের ঠিক উল্টা চেতনা—ইহা নবোদ্বুদ্ধ ব্যক্তি-মানসের আপনার ক্ষুদ্র গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া নব নব ক্ষেত্রে নিজেকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য ব্যাকুলতা। ইহা egoism বটে কিন্তু benevolent egoism, ইহা স্বার্থগন্ধহীন। এই বিস্তারের বাসনা, আত্মপ্রসারের বাসনাই ত রেনেসাঁ-চেতনার মূল কথা এবং ইহাকেই কাব্যে রূপ দিয়া মধুসূদন যে নূতন রোমান্টিক ভাবগঙ্গা বাংলার ভূমিতে বহাইলেন রবীন্দ্রনাথ ত তাহারই উত্তরাধিকারী।

'ধর্মবিদ্রোহী' কথাটি ব্যবহার করিবার আগে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বলিয়া লইয়াছেন যে মধুসূদনের বিদ্রোহ রামরাবণ সম্পর্কে 'বাঁধাবাঁধি ভাবের' বিরুদ্ধে, সেই ধর্মভীরুতার বিরুদ্ধে, যাহা 'সর্বদাই কোনটা কতটুকু ভালো ও কতটুকু মন্দ, তাহা কেবলি অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে।' কিন্তু তাহার পরেই কবি বলিতেছেন যে সেই ধর্মভীরুতার 'ত্যাগ, দৈন্য, আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে স্পর্শ করে নাই।' তাহার পরেই বলিতেছেন স্পর্ধা, দম্ভ ও দৈহিক শক্তি, সবই এই ধর্মবিদ্রোহ-প্রসূত। অতএব মূলত এই সমালোচনা তাঁহার পনের বছর বয়সের সমালোচনা হইতে ভিন্ন নহে। মধুসূদনের প্রতি বীতরাগ রবীন্দ্রনাথের কোনদিন যায় নাই। না যাইবার কারণও আছে। সেটি হইল রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন। ইংলণ্ডে যেমন নিকষকুলীন রোমান্টিক বলিতে একমাত্র শেলীকেই বুঝায় তেমনি এদেশেও অবিমিশ্র রোমান্টিক (uncompromising romantic) বলিতে মধুসূদন দত্তকেই বুঝায়। রোমান্টিক চেতনায় আদর্শের প্রতি যে আত্মোৎসর্গ (abandon, total

surrender) আছে, যে সামগ্রিক আত্মনিবেদন আছে তাহার অব্যাহত প্রকাশ ওয়ার্ডস্বার্থ বা কীটস্-এ হয় নাই। ইহারা সকলেই বাস্তবের সঙ্গে আপোষ (Compromise) করিয়াছিলেন (Wordswithএর আপোষ Tintern Abbey, Ruth, Ode to Duty, Resolution and Independenceএ স্পষ্ট; আর Keatsএর Hyperion Recast-এ), কেহই আদর্শকে পরিপূর্ণ স্বীকৃতি দিতে পারেন নাই। পথে অনেক বাধা তাঁহাদের প্রথম জীবনের আদর্শবাদের মোড় ঘুরাইয়া দিয়াছে। মধুসূদনের ছিল শেলীর মত আত্মোৎসর্জন। তিনি যে উজ্জ্বল ঐহিক জীবনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, যে স্বপ্নসৌধ রচনা করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার কাব্যের লঙ্কা:

........"চারিদিকে শোভিল কাঞ্চন—
সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা—
মনোহরা পুরি!—
হেম-হর্ম্ম্য সারি সারি পুষ্পবন মাঝে;
কমল আলয় সরঃ; উৎসরজঃ ছটা;
তরুরাজী; ফুলকুল—চক্ষু-বিনোদন,
যুবতী যৌবন যথা; হীরাচূড়া শিরঃ
দেবগৃহ; নানারাগে রঞ্জিত বিপণি,
বিবিধ রতন পূর্ণ; এ জগৎ যেন
আনিয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে,
রেখেছে, রে চারু লঙ্কে, তোর পদতলে,
জগৎ-বাসনা তুই, সুখের সদন।"......১ম সর্গ

জগৎ-বাসনা এই লঙ্কার সন্ধানে মধুসূদন সর্বস্ব সমর্পণ করিয়াছেন: তিনি নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়া ফিরিয়া আসেন নাই, তিনি বলেন নাই, "এবার ফিরাও মোরে।" মধুসূদনের পক্ষে ঐহিক জীবনের মহত্তম রূপের প্রতি এই প্রীতি পলাতক মনোবৃত্তি (Escapism)-প্রসূত নহে। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, জীবনে এই সৌন্দর্য পশ্চিম দেশে সত্যই স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এবং তাহাকেই তিনি সার্থক প্রতিষ্ঠা দিতে চাহিয়াছিলেন ঊনিশ-শতকী বাঙালীর জীবনে। ইহাকে যে অর্জন করা যায় না, ইহা যে La Belle Dame sans Mercir মায়া, ইহা যে "অপরিচিতার" "সন্ধ্যার কূলের" আবাস, তাহা মধুসূদন ভাবেন নাই, ভাবিতে চাহেনও নাই। রোমান্টিক আদর্শের পতনের যুগ (The Fall of the Romantic Ideal) তখনও মধুসূদনের পক্ষে শুরু হয়

নাই। সেইজন্যই এই আদর্শের অপরিপূর্তিতে এত বেদনা মেঘনাদবধ কাব্য ছাপাইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই আদর্শ-প্রীতিকে পলাতকী মনোবৃত্তি বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছেন। তিনি জানেন যে ঐ অপরিচিতাকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তিনি জানেন যে উহা "রঙ্গময়ী কল্পনা"; তিনি উহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছেন "দূরে বহুদূরে স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে"। তাই তাঁহার সাহিত্যে প্রেম আর বিবাহের দ্বন্দ্ব চিরন্তন—চোখের বালিতে, যোগাযোগে, শেষের কবিতায়, চার অধ্যায়ে। লাবণ্য ভালোবাসে অমিতকে আর বিবাহ করে শোভনলালকে ; এলা প্রেমের আতিশয্যে বিবাহই করিতে পারে না ; কুমু বিবাহ করিয়াও সে বন্ধন ছেদন করে আর বিনোদিনীর কথা ত অকথ্য। আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের দ্বন্দ্বকে চিরন্তন ও অসমাধাতব্য মনে করিতেছেন বলিয়াই, মধুসূদনে সেই দ্বন্দ্বের একান্ত অস্বীকৃতিকে রবীন্দ্রনাথ সহ্য করিতে পারেন নাই। তাই মধুসূদনের কাব্যে জ্বলন্ত পৌরুষের প্রতীক রাবণ ও মেঘনাদ তাঁহার কাছে মহাদম্ভী মাত্র।

ধর্মবিদ্রোহী রাবণ আর ধর্মভীরু রামের দ্বন্দ্ব মেঘনাদবধের বিষয়বস্তু নহে ; সে বিষয়বস্তু হইল সুপ্তোত্থিত স্বশক্তি-সচেতন, নূতন যুগের ব্যক্তিসত্তার 'তরুণ গড়ুড়ের' মত জগতের সমস্ত সুখৈশ্বর্য আত্মসাৎ করার বাসনার সঙ্গে একদিকে **রক্ষণশীলতার** ও অন্যদিকে **পরাধীনতা-জনিত শক্তিহীনতার** দ্বন্দ্ব। পরাধীনতা ব্যক্তি-জীবনের স্ফুরণের পথে যে কি বাধার সৃষ্টি করিতেছিল তাহা আমরা আগেই (১ম ও ২য় পরিচ্ছেদে) আলোচনা করিয়াছি ; দেখাইয়াছি যে বাস্তব জীবনের সার্থকতার ক্ষেত্রে, উচ্চাশা সফল হইবার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা কেমন করিয়া ঘিরিয়া ধরিতেছিল সেকালের নব্য বাঙালীকে। মধুসূদন রাজনৈতিক চিন্তানায়ক ছিলেন না। তিনি এই ব্যর্থতাবোধের কার্য-কারণ বিশ্লেষণ করিতে চাহেন নাই ; শুধু সারা কাব্য ব্যাপিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন কেন এই ব্যর্থতা ? 'কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে ?' এবং চিত্রাঙ্গদার অভিযোগের উত্তরে একবার যখন রাবণ বলিয়া উঠিতেছেন,

> দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব
> গেছে চলি স্বর্গপুরে ; বীরমাতা তুমি ;
> বীরকর্মে হত পুত্র-হেতু কি উচিত
> ক্রন্দন ? ....১ম সর্গ

তখন আমাদের এ কথা ভাবিতে বাধা কোথায় যে স্বদেশের পরাধীনতার

জ্বালাই মধুসূদনকে এই কথা বলাইতেছে এবং **সমুদ্রপারের দেশ হইতে আসা রাম আর সাতসমুদ্র পারের পররাজ্যগ্রাসী ইংরাজ তাঁহার মনে এক হইয়া যায় নাই।**? বিজ্ঞান ও যন্ত্রের বলে বলীয়ান ইংরাজ সত্যই ত অলঙ্ঘ্য সমুদ্রকে শৃঙ্খল পরাইয়া, পূর্বদেশের তথাকথিত বর্বরকে ছলে ও কৌশলে পদানত করিয়া, সোনার দেশকে (লঙ্কাকে) ছারখার করিতেছে। সমুদ্রের প্রতি রাবণের ব্যঙ্গোক্তির মধ্যে কি বাঙালী কবির মনের কথা নাই ?

কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে ?
................কহ, এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন্ পাপে ? ....১ম সর্গ

ইহার পরেই অভিমান করিয়া বলিতেছেন,

....এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামি,
কৌস্তুভ-রতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দয় এবে তুমি এর প্রতি ? ....১ম সর্গ

ইহা কি সোনার বাংলার অপমানের কথা নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিলে, যাহার মূল বল হইল দৈববল সেই ভিখারী রাঘব কি দৈববলে বলী [এই ভাবেই ভারতীয়ের ও বাঙালীর দৃষ্টিতে প্রতিভাত] ইংরাজের স্থান গ্রহণ করিয়া ফেলেন না ?

মধুসূদন সচেতনভাবে এই ধারায় চিন্তা করিয়াছিলেন কিনা সে কথা এখানে একেবারেই অবান্তর। কারণ কবির সচেতন চিন্তাই তাঁহার কবিতার সবটুকু নয়। তাহাই যদি হইত তাহা হইলে Paradise Lost-এ Satanকে এত প্রাধান্য কি মিলটন দিতেন ? তাহা হয় নাই এবং মিলটন আবেগের বশেই লিখিয়াছিলেন বলিয়া Paradise Lost মহৎ কাব্য হইতে পারিয়াছে। তিনি কি সচেতন ছিলেন যে তাঁহার প্রথম জীবনের যে আঘাত (তাঁহার কামনা আর Mary Powellএর সে কামনা চরিতার্থ করিতে অস্বীকৃতি এবং তজ্জনিত তাঁহার ক্ষোভ ও Passionকেই জীবনে সকল অনিষ্টের মূল বলিয়া ধারণা) তাঁহাকে বিবাহবিচ্ছেদের উপর সন্দর্ভ রচনা করিতে উত্তেজিত করিয়াছিল সেই আঘাতই Paradise Lostএ Satanকে এত প্রাধান্য দিয়া মানুষের আদিম পতনের কাহিনী রচনা করিতে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল ? "The study of the Fall teaches us that for Milton man is a double being, in whom co-exist desire

and intelligence or Passion and reason. The two powers ought to be in harmonious equilibrium, desire being normally expressed, but remaining under the leadership of reason. Evil appears, the fall takes place, when passion triumphs over reason....Passion triumphant over reason—such is the source of all evil :....It is a principle which had slowly crystallized through his private and public experience into *the very essence of his thought.* From it endless consequences extend into all the regions of his philosophy.....In the story of the Fall, the theory applies to Adam. Adam has been carried away, against his reason, by his passion for Eve :

> Against his better knowledge, not deceived,
> But fondly overcome with female charm.

But with this 'female charm', we come to a group of ideas which played a capital part in Milton's thought, because *they came to him from the most painful experience of his own life.*[২০১] এমনি করিয়াই যে চেতনা হইতে মধুসূদন বিধবা-বিবাহ নাটকের অনুবাদ করিতে চাহিয়াছিলেন এবং নীলদর্পণের অনুবাদ করিয়াছিলেন, যে চেতনা তাঁহাকে লঙ এর শাস্তি নিজ স্কন্ধে লইতে প্রবর্তনা দিয়াছিল, যে চেতনা তাঁহাকে বুঝাইয়াছিল যে বিদ্যাসাগর সে যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; এবং যে চেতনা শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে বাংলাদেশের বউ কথা কও-কেও স্মরণ করাইয়াছে সেই চেতনাই যে তলায় তলায় কাজ করিয়া বাঙালী কবির মুখে এই প্রথম সার্থক রাজনৈতিক প্রতিবাদ (রঙ্গলালকে অবশ্য বাদ দিয়া) যোগায় নাই তাহার নিশ্চয়তাই বা কি? ইহার পরেই যদি আমরা বলি যে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণের হাতে ইন্দ্রজিতের পতন বাঙালীর স্বাধীনতা-হরণের রূপক কাহিনী তাহা হইলে কি খুব অন্যায় হইবে? গিরিশ ঘোষ প্রমুখেরা সিরাজউদ্দৌলা নাটকে সিরাজকে দিয়া যে আচরণ মীরজাফর ও তদনুচরদের প্রতি করাইয়াছেন তাহার প্রেরণা কি তাঁহারা বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিতের ভর্ৎসনা হইতে গ্রহণ করেন নাই।

এই রাজনৈতিক প্রতিবাদের ফল্গুধারা মেঘনাদবধ কাব্যের তলায় প্রবাহিত হইতেছিল কি না তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা শক্ত এবং ইহা আমাদের মূল প্রামাণ্য নহে। পৌরুষের যে অহেতুক পরাজয় মেঘনাদবধের মূল উপজীব্য সেই মূল ভাবের একটি উপধারা এই রাজনৈতিক খাতে প্রবাহিত হইলেও হইতে পারে। ঐ পরাজয়ই যে তৎকালীন বাঙালী জীবনের অন্তর্নিহিত সত্য এবং ঐ পরাজয়ের কারণ যে, মূলত পরাধীনতা, তাহা সিপাহীবিদ্রোহের সময় বাঙালীর রাজানুগত্য প্রমাণ করিতে গিয়াও, হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার লেখকেরা (মূলত হরিশ মুখোপাধ্যায়) ভুলিতে পারেন নাই—এমন কি এ কথাও বলিয়া ফেলিয়াছেন যে বাঙালীর রাজানুগত্য আসলে বুদ্ধিগত (অর্থাৎ স্বার্থপ্রণোদিত), হৃদয়ের জিনিষ নহে : Apropos to the affair of Babu Sibchandra Deb with the alarmists (শঙ্কাবাদী—অর্থাৎ যাহারা গেল গেল রব তুলিতেছিল) is a cleverly written letter published in the last no of the *Friend of India,* signed "A loyal Bengalee." The writer gives an exposition of what he concieves to be the sentiments of the class called by Europeans 'The Educated Natives.' He premises that young Bengal is not hostile to the British Government as they may induce Govt, to adopt a policy of conciliation towards our countrymen, and regards them [the effects of the mutiny] as a retribution of Providence for the many evil deeds committed by the British Govt. in India. He points out that young Bengal has too large a stake involved in the continuced existene of the British Govt. to wish its downfall, and prays for its stability up to the time when we are able to govern ourselves without any fear of foreign invasion.'

There is little exaggeration in the tone and style of the writer.

The most enlightened self-interest, accordingly, prompts the "educated natives" to be loyal. This loyalty, it may be true, springs **nearer from the head than from the heart.** There may be more of reason and calculation

than of feeling and sentiment in it.........much of warmth and ardour cannot be expected to enter into the composition of our loyalty."[২০২] ইংরাজের প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর মনের কথার তীক্ষ্ণতর প্রকাশ ঘটিয়াছে নিম্নলিখিত চিঠিখানিতে : I would take the liberty to ask you one question,—whether the Sepoys only and no other portion of the native community are disaffected towards their rulers of the present time? For my part, though I would be the last man to prefer the rule of any other people to that of England, yet I am extremely sorry to confess that it would be very difficult to find out one single individual among our countrymen who does not hate Englishmen, at least inwardly. What is the cause of this? Those who have learnt to read and write, can clearly see how haughtily and contemptuously they are treated; ....while those who cannot read and write, learn their own fate from the acts of Englishmen here, as they never fail to observe almost ever day that men like themselves, only diffeing from them in colour are burning and plundering villages, imprisoning and murdering their inhabitants, forcibly dispossessing them of their lands and heritages, banishing them from their own 'loved dear homes' and families and at the same time escaping the hands of justice without the least punishment and even the least plausible excuse......... (These teach them to hate the very name of Englishmen) [২০৩]

ইহার পরেও কি বুঝিতে বাকী থাকে ব্যক্তিজীবনে কি সর্বব্যাপী ব্যর্থতা আসিতেছিল পরাধীনতার ফল হিসাবে এবং আমাদের পরাধীনতা যাহাদের সম্পদ বাড়াইতেছিল তাহাদের প্রতি দেশপ্রেমিক, স্পর্শকাতর মধুসূদনের অন্তরের ভাব কি হইবে? রাবণ তাই ব্যর্থকাম বাঙালীর প্রতিনিধি আর তাঁহার পরাজয় ও ক্রন্দন বাঙালী-জীবনের পরাজয় ও ক্রন্দনের প্রতিধ্বনি। পাপ, পুণ্য, ধর্মাধর্মের চিরাচরিত মানদণ্ড দিয়া মধুসূদনের এই মহাকাব্যের বিচার চলিবে না।

মেঘনাদবধ কাব্যের এই মূল তত্ত্ব অনুধাবন না করিলে যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মত অর্থহীন, অসংলগ্ন কথা বলিতে হয়ঃ 'কিন্তু আমাদিগকে বিবেচনা করিতে হইবে যে, মধুসূদন পাপীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিলেও, পাপের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন নাই। যে অসদাচণের জন্য রাক্ষসরাজ সাধু-সমাজের ঘৃণার্হ, কবি কুত্রাপি তাহার সমর্থন করেন নাই; বরং তিনি যে আত্মবঞ্চক এবং তাঁহারই পাপাচারের ফলে যে রাক্ষসবংশের সর্বনাশ ঘটিতেছিল, প্রতিপদেই তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। মেঘনাদবধ পাঠ করিয়া কাহারও মনে রাক্ষসরাজের অনুচিত কার্যের অনুকরণ ও সমর্থন করিবার প্রবৃত্তি জন্মে না। একদিকে আমরা যেমন রক্ষোবংশের ঐশ্বর্য, বাহুববল, সৌভাগ্য এবং রূপ, গুণ দেখিয়া বিস্মিত হই, অন্যদিকে আবার তেমনিই তাঁহাদিগের অবিমৃষ্যকারিতার শোচনীয় পরিণাম দর্শন করিয়া সন্ত্রস্ত ও উপদিষ্ট হই। সুতরাং অসৎ দৃষ্টান্তের সমর্থন করিলে যে অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা, মেঘনাদবধ হইতে তাহার কোনও আশঙ্কা নাই। ধন, মান, গৌরব, বাহুবল, এমন কি ইষ্টদেবে প্রগাঢ় ভক্তি সত্ত্বেও পাপাচরণের ফলে মনুষ্যের পরিণাম কিরূপ হইতে পারে, ইহাতে তাহা অতি সুন্দর রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। সত্য বটে, ইহাতে পাপাচারী রাক্ষসরাজের নিজের কোন দণ্ড বর্ণিত হয় নাই; কিন্তু দণ্ড আর কাহাকে বলে? মেঘনাদের ন্যায় পুত্র এবং প্রমীলার ন্যায় পুত্রবধূকে চিতানলে সমর্পণ করিয়া রাক্ষসরাজ যে ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন, রামচন্দ্রের শরে হৃৎপিণ্ড বিদারিত হইলে, কি তিনি তদপেক্ষা অধিক ক্লেশ ভোগ করিতেন? "ধর্মের জয় অধর্মের পরাজয়" যখন মেঘনাদবধ কাব্যের উপদেশ ও পরিণাম, তখন, রাক্ষসরাজের প্রতি কবির সহানুভূতি সত্ত্বেও, নীতির দিক হইতে বিচার করিলে, ইহার দ্বারা কোন অনিষ্ট-পাতের সম্ভাবনা নাই।" [২০৪]

ইহাই বোধহয় মেঘনাদবধ কাব্যের চূড়ান্ত অপব্যাখ্যা কিন্তু যোগীনবাবুর পক্ষে ইহা বলা ছাড়া উপায় নাই কারণ তাঁহার এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বাদ দিয়া তাবৎ পণ্ডিত মহাশয়দের কাব্যবিচারের দুটি নিরিখঃ এক— অলঙ্কারশুদ্ধি, দুই—বিধিসঙ্গত নব রসের যথাযথ পরিবেশন—সে টানিয়া হেঁচড়াইয়া যেমন করিয়াই হউক না কেন। ইহার বাহিরে কিছু বলিতে গেলেই ধর্মাধর্মের কথা পাড়িতে হয় এবং মধুসূদন অত বড় কবি হইয়া কি আর অধর্মের জয়গান করিতে পারেন—ergo মধুসূদনের কাব্যে ধর্মেরই জয়। তাহা হইলে কি রবীন্দ্রনাথ 'ধর্মবিদ্রোহী' কথাটি ব্যবহার করিয়া যোগীন বসু মহাশয়ের অপেক্ষাও মেঘনাদবধকাব্যের রসগ্রহণে বেশী অপটুত্ব দেখাইয়াছেন?

আসলে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াও মধুসূদনের সঙ্গে সহৃদয়তার অভাবে বিকৃত বিশ্লেষণ করিয়াছেন আর যোগীন বসু মহাশয়ের মেঘনাদবধকাব্যের মর্মে প্রবেশই ঘটে নাই। তিনি শুধু পাপ আর পাপের ফল নির্ণয় করিতেই ব্যস্ত রহিলেন। **মধুসূদন যে এদিকে পাপ-পুণ্যের প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করিয়া আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া তুলিয়াছেন** সে দিকে যোগীন বাবুর খেয়াল নাই। যোগীন্দ্রনাথ বসুর কথা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ না করিয়াও বোধ হয় সংস্কারবশেই মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ও এই ভুল করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "ধর্মের চক্ষে রাবণ পাপী, এ কাব্যে আমরা সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তই দেখি, পাপ দেখি না। কবি যেন পাপ হইতে মানুষকে পৃথক করিয়া লইয়াছেন—দুঃখের অনলমধ্যে, মানুষের প্রাণের আয়স-ধাতুকে প্রদীপ্ত লোহিত মূর্তিতে প্রকটিত করিয়াছেন; তাহাতে পাপের সে কৃষ্ণ-বর্ণ আর নাই, কেবল হৃৎপিণ্ডের কোমল উজ্জ্বল রূপই উদ্ভাসিত হইয়াছে।" [২০৫] অথচ পাপ এবং তাহার প্রায়শ্চিত্তের প্রশ্নই মধুসূদন এবং রাবণের কাছে অবান্তর। পাছে সে কথা এতটুকুও আসিয়া পড়ে বলিয়া তিনি সীতাপহরণের কাহিনী প্রায় চাপিয়া গিয়াছেন বলিলেই চলে—এমন কি অপহরণের কথা উল্লেখ করিয়া রাবণ বলিতেছেন যে তিনি রাজ-সম্মান রক্ষা করিবার জন্যই ইহা করিয়াছেন; অন্য উদ্দেশ্যের কথা যেন এখানে উঠিতেই পারে না। পৌরুষে উদ্দাম রাবণ বিশ্বজয় করিয়াছেন; আর যে ধর্মভীরু মানুষ দেবতাদের চাটুবাক্যে তুষ্ট করিয়া কাজ আদায় করিতে চাহে ইন্দ্রজিৎ তাহাদের বাহুবলে পরাস্ত করিয়া মানুষের পক্ষে দুরর্জনীয় গৌরব অর্জন করিয়াছেন। দেবদানবে যুদ্ধ পুরাণে ত গতানুগতিক। মধুসূদনের কাহিনী সেই গতানুগতিকতার বিরোধী **কারণ তিনি দেব আর দানব এই পার্থক্য স্বীকার করেন না।** স্বীকার করেন শুধু মানুষের দুই শ্রেণী—এক শ্রেণী আচার, ঐতিহ্য, সংশয়, দ্বিধা, কূপ-মণ্ডূকতার ধারক আর এক শ্রেণী সব কিছু বাধাকে অস্বীকার করিয়া স্ব-পৌরুষে জগৎকে নন্দন বানাইতে ব্যগ্র। এই শেষোক্ত মানুষ বীরপদবাচ্য। মেঘনাদ তাঁহাদেরই প্রতিনিধি। মধুসূদনও এমনি করিয়া সব কিছু আচার কুসংস্কার বর্জন করিয়া চাহিয়াছিলেন পুরাতন জগৎকে—

'To shatter it to bits and then
Remould it nearer to our heart's desire'! [২০৬]

কিন্তু পারিলেন না। বাঙালীও চাহিয়াছিল জ্ঞানে-বিজ্ঞানে শক্তিমান হইয়া ইংরাজের সমকক্ষ হইতে, জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ভোগ করিতে, কিন্তু পারিল না। কেন? তিলোত্তমাসম্ভবের ক্ষেত্রে ইন্দ্রের পতনের কারণ হিসাবে

যেমন মধুসূদন নিজেই নিয়তির উল্লেখ করিয়াছিলেন মেঘনাদবধের ক্ষেত্রেও প্রায় সকল সমালোচকই এক উত্তর দিয়াছেন—নিয়তি—এবং যথারীতি গ্রীক নিয়তি-বাদকেও টানিয়া আনিয়াছেন।

খ

'রাবণ কেবল নিজেকেই জানে, আর কাহাকেও জানে না; সে নিজেই নিজের ধর্ম, আর কোন ধর্ম মানে না। সে যেন বলে—আমি আমিই। আমার শক্তিতে আমি যাহা করি, তাহার বিরুদ্ধেও শক্তিকেই মানি, আর কিছুকে নয়। পরের মধ্যেও আমি শক্তিকেই বিশ্বাস করি; দেব, দৈত্য, নর যেই হউক, এই শক্তি ভিন্ন আর কিছু দ্বারা আমাকে কেহ দণ্ডিত করিতে পারিবে না। কিন্তু এক্ষণে রাবণের এ ভুল ভাঙিতে আরম্ভ হইয়াছে—মানুষ যত বড় শক্তিমান হউক, **নিয়তির** হাত হইতে তাহার নিষ্কৃতি নাই; সে নিয়তি তাহার নিজের মধ্যেই লুক্কায়িত হইয়া অবস্থান করিতেছে, তাই সে পরাজয় এত মর্মভেদী।"[২০৭] কিন্তু ভারতীয় নিয়তিবাদ প্রাক্তনবাদের সঙ্গে জড়িত। মধুসূদন রাবণ সম্পর্কে সে রকম কোন প্রাক্তনে বিশ্বাসী নহেন। তাই মোহিতলাল উপরোক্ত মন্তব্য করিবার আগেই বলিয়া লইয়াছেন, 'এই বিধির আর এক নাম—প্রাক্তন। ইহা কোন ব্যক্তি-বিশেষের পূর্বকর্ম-সমষ্টি নয়; এ প্রাক্তন সৃষ্টিগত—নিখিলের কর্মধারায় ইহা অনুস্যূত।'[২০৮] ইহা কোন জাতীয় নিয়তি বা প্রাক্তন? হিন্দু-ধর্মে ত এ রকম প্রাক্তনের কথা নাই। খ্রীষ্টিয়ানদের আছে বটে original sin কিন্তু মধুসূদনের ন্যায় ব্যক্তিস্বাধীনতার পুরোহিত ও পুরুষকারের দীপ্ত শহীদ কবিমানসে এ বিশ্বাসকে স্থান দিবেন না। মোহিতলাল এ কোন প্রাক্তনকে আবিষ্কার করিলেন? পরে তিনি সবিস্তারে যাহা বলিতেছেন তাহার সঙ্গে নিখিলের কর্মধারায় অন্তর্লীন কোনো বিধির সম্পর্কে নাই। তিনি বলিতেছেন, "মধুসূদনের কাব্যে যে অদৃষ্টবাদের একটি প্রবল ভাবধারা প্রায় আদ্যোপান্ত রহিয়াছে দেখা যায়, তাহার নজীর সম্ভবত গ্রীক কাব্য হইতেই কবি লইয়াছিলেন; এবং ট্র্যাজেডি-কল্পনায় ইহার উপযোগিতা বিষয়ে তিনি পাশ্চাত্য কবিদের নিকটেই ঋণী।"[২০৯] কিন্তু ইহার পরে বলিতেছেন, "কিন্তু ইহাও দেখা যায় যে, তাঁহার অদৃষ্টবাদ প্রাচ্য সংস্কার ও বিশেষ করিয়া হিন্দু মনোভাবের ফল; এ অদৃষ্টবাদে খ্রীষ্টিয়ান পাপ-তত্ত্ব অথবা আদি গ্রীক চিন্তার অহেতুক দৈব স্বেচ্ছাচার—এ দুইয়ের কোনটিই নাই।"[২০৯] অবশ্য গ্রীক নিয়তিবাদকে অহেতুক দৈব স্বেচ্ছাচার আখ্যা দেওয়া নিতান্তই ভ্রমাত্মক। তবু নিজের মত করিয়া বুঝিয়াও মোহিতলাল অনুভব করিতেছেন

যে মধুসূদনের উল্লিখিত বিধিকে গ্রীক নিয়তি বলা যায় না। তিলোত্তমা-সম্ভবের আলোচনায় গ্রীক নিয়তিবাদের দীর্ঘ বিবরণ দিয়া আমরা দেখাইয়াছি যে সেখানেও মধুসূদন নিজে বলা সত্ত্বেও গ্রীক নিয়তিবাদের কোনো চিহ্ন নাই।

যদি মধুসূদনের এই বিধি না হিন্দু না খ্রীষ্টিয়ান, না গ্রীক তাহা হইলে ইহা কি? শশাঙ্কমোহন সেনও এই নিয়তিবাদ লইয়া অতি দীর্ঘ আলোচনা করিয়া বলিতেছেন, "অদৃষ্টবাদই মধুসূদনের কারুণ্যনিষ্পত্তির মূল"[২১১] এবং ইহার পরে চূড়ান্ত বক্তব্য হিসাবে পেশ করিয়াছেন সেই বুড়ী-ছোঁওয়া কথা: মানবজীবনের চিরকালীন দুঃখ-দুর্দশার চেতনাই মধুর কাব্যে করুণরসের উৎস।[২১১] এই বক্তব্যও পরস্পর-বিরোধী। ইদানীং কালে ডাঃ সুকুমার সেনও সেই নিয়তিবাদ এবং বিশেষত গ্রীক নিয়তিবাদের মধুসূদনের উপর প্রভাবের কথা বলিয়াছেন: "গ্রীক ট্র্যাজেডিতে দৈবের যে অলঙ্ঘনীয়তা ওতপ্রোত রহিয়াছে তাহা মধুসূদন নিজের জীবনের মধ্যে অনুভব করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার প্রধান প্রধান কাব্যে এবং নাটকে প্রাক্তনের অনিবার্যতার উপর প্লটের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে।....মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণ পরম-মাহেশ্বর হইয়াও অদৃষ্টের ফল খণ্ডাইতে পারিল না।"[২১২] তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য বিচার করিবার সময় আমরা দেখিয়াছি যে গ্রীক নিয়তিবাদ দৈবের অলঙ্ঘনীয়তায় বিশ্বাস নহে। সে আলোচনার পুনরাবৃত্তি না করিয়া George Thomsonএর আধুনিক গ্রন্থ Our First Philosophers গ্রন্থে গ্রীক নিয়তিবাদ সম্পর্কে তিনি যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিলেই স্পষ্ট হইবে যে, আমাদের দেশের সমালোচকেরা যে অর্থে গ্রীক নিয়তিবাদ কথাটি ব্যবহার করেন তাহা গবেষণা-সহ নহে এবং তাঁহাদের পরস্পরবিরোধী ধারণার কোনটিই মধুসূদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে; আবার গ্রীক নিয়তিবাদ মূলত যাহা তাহাও মধুসূদনে নাই, থাকিতে পারে না: "In the first volume of these studies (i. e. Æschylus & Athens) the idea of *Moira* (আমরা যাহাকে Fate বা Destiny বলি) was traced back to primitive communism in which each member of the community received his fair share of the product of its collective labour. As mythical figures, the *Moirai* represented the ancestresses of the matriarchal clan, who were believed to stand for maintenance of these equal rights; and similarly *Erinyes* were in origin nothing more than

these same ancestresses in their negative aspect, their function being to punish those who transgressed the ances tral dispensation embodied in the *Moirai*. It was also shown that, in the period of transition from tribal society to the state these figures became related and subordinated to Zeus, representing the kingship, and later to Dike.... Dike intervenes in human affairs to punish wrong-doers, and her intervention affects the whole community and results in loss of life. In all this she does the same as Erinyes, but with one difference. The sickness she inflicts is not physical but social; it is not pestilence and famine but oppression and civil war........It is just in this period, when the last vestiges of tribal society are being swept away, that there arises, by the side of *Moira*, the Orphic figure of Ananke. This word is commonly translated 'necessity', which serves well enough in many contexts, but its real meaning is more concrete —'compulsion' or 'coercion'. In literature, Ananke makes her first appearance in the writings of Herakleitos and Parmenides, who were both influenced by Orphism. Herakleitos couples Ananke and Moira together as being virtually identical; Parmenides assigns the same attibutes to Moira, Dike, and Ananke. A century later, in Plato's Republic, Ananke usurps the place of Moira and is even equipped with her spindle.[২১৩] দেখা যাইতেছে যে গ্রীক নিয়তিবাদ এবং সেই নিয়তিবাদের চূড়ান্ত পরিণতি গ্রীক সমাজের ক্রমাভিব্যক্তির সঙ্গে ওতপ্রোত এবং যেহেতু ভারতীয় সমাজে পরিবর্তনের ধারা স্বতন্ত্র এবং যেহেতু উনিশ-শতকী বাংলাদেশে খ্রীষ্টপূর্ব যুগের গ্রীসের সামাজিক ব্যবস্থার উদ্ভব হয় নাই এবং হওয়া সম্ভব ছিল না সেই হেতু মধুসূদনে সেই জাতীয় নিয়তিবাদের একান্ত অসদ্ভাব। হোমারের মহাকাব্যের সাহিত্যিক প্রভাব মধুসূদনের উপর নিশ্চিত পড়িয়াছিল; হয়ত তাঁহার কিংবা অন্যান্য মহাকবিদের দেখাদেখি তিনি এক-আধবার উপর উপর 'বিধির' উল্লেখ করিয়াছেন;

আবার সে উল্লেখ ভারতীয় প্রাক্তনবাদের ঐতিহ্য-প্রসূতও যে না হইতে পারে এমন নয়। কিন্তু এ সবই উপরের কথা। মেঘনাদবধ কাব্যের কবি প্রাক্তনবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না কারণ তিনি স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার পৌরুষে ও মানবীয় অধিকারে শুধু একান্ত আস্থাবানই নহেন, উহাই তাঁহার এবং যুগজীবনের মূলমন্ত্র। দৈব-বাদেই বা তিনি কেন বিশ্বাস করিতে যাইবেন? ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার সঙ্গে দৈব-বাদের একান্ত বিরোধ—সে দৈব অদৃষ্টই হউক আর সর্বশক্তিমান ভগবানই হউন। আর পুরাণের রাবণও ত এই দৈবের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহী। মধুসূদনের রাবণ যে সেই দৈবের কাছে পরাজিত হইবেন ইহা মধুসূদনের পক্ষে স্বীকার করাই অসম্ভব। আবার মানুষের জীবনের চিরন্তন দুঃখ-দুর্দশার দোহাই পাড়া এইজন্য অর্থহীন যে মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী সব সাহিত্যেরই প্রাণবস্তু। তাই ঐ কথা বলিলে আসলে কিছুই বলা হইল না। কালিদাসের যুগেও দুঃখ-দুর্দশা ছিল আবার গিরিশ ঘোষের যুগেও ছিল তবু কালিদাস আর গিরিশ ঘোষ কি এক প্রকৃতির সাহিত্য রচনা করিয়াছেন?

যে ব্যর্থতা রাবণের জীবনে আসিল এবং যে ব্যর্থতার কারণ রাবণ কিছুতেই না বুঝিতে পারিয়া বারে বারে 'কি পাপে রে দারুণ বিধি' বলিয়া বিলাপ করিতেছেন এবং যে কাতর আর্তনাদকে যোগীন বসু রাবণের আত্ম-প্রবঞ্চনা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ব্যর্থতা-বোধ-জাত সেই আর্তনাদ নিয়তির চেতনা হইতে উদ্ভূত হয় নাই, উদ্ভূত হইয়াছে বাঙালীর জীবনের ব্যর্থতা হইতে; উদ্ভূত হইয়াছে মধুসূদনের নিজের জীবন হইতে, যাহা এই বৃহত্তর বাঙালী জীবনেরই অঙ্গবিশেষ। জাতির জীবনসত্য ব্যক্তিজীবনের রসে জারিত হইয়া এই কাব্যখানির মর্মে নিহিত হইয়াছে। পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল বুর্জোয়া-জীবনবেদ পরাধীন, অর্থনীতিতে অনগ্রসর, তখনও যন্ত্রশিল্পে প্রবেশাধিকার-বিহীন বাঙালীর জীবনে সত্য হইয়া উঠিতে পারে না। আদর্শে আর বাস্তবে, কল্পনায় আর কৃতিতে এই বিরোধই শুধু নয়, শেষ পর্যন্ত আদর্শের সম্পূর্ণ পরাজয় এবং বাঙালীর কেরাণীত্ব-বরণ, তাহার সকল আশার ভস্মীভবনই, রাবণের জীবনে রূপায়িত। রাবণই সেইজন্য এই কাব্যের নায়ক। কিন্তু মধুসূদনের কাজ নয় এই পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ। কবি হিসাবে তিনি শুধু এই ব্যর্থতার গ্লানিভোগ করিয়াছেন, নিজের স্বপ্নসৌধের পতনে একেবারে মর্মভেদী হাহাকার করিয়া উঠিয়াছেন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করিবার মত হিসাবী মনোবৃত্তি থাকিলে হয়ত এই কারুণ্যের ঐকতান তিনি বাজাইতেই পারিতেন না। তাঁহার অনুভূতি ও আবেগ হয়ত বিশ্লেষণের মুখে হারাইয়া ফেলিত তাহাদের তীব্রতা। হয়ত কেন

নিশ্চয়ই—কেন না মধুসূদন আত্মসচেতন কবি ছিলেন না। তিনি নিজের আবেগকে নিজে বিশ্লেষণ করিবার কোনো তাগিদই বোধ করেন নাই। তাহা করিলে তিনি কখনও ফরাসী সম্রাটকে দেখিয়া 'সম্রাট দীর্ঘজীবী হউন' বলিয়া উল্লাস প্রকাশ করিতেন না। সমাজ-জীবনে যিনি কখনও স্বৈরাচারীকে সহ্য করেন নাই তিনি কেমন করিয়া স্বেচ্ছাচারী ফরাসী নৃপতিকে অভিনন্দন জানাইতে পারেন? মধুসূদন মূলত আবেগসর্বস্ব কবি, মনন-সর্বস্ব নহেন; Goetheর মত তাঁহার মধ্যে আবেগ আর মননের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য ত ঘটেই নাই। এই আবেগ-সর্বস্বতার জন্যই তিনি, কাব্যের মূল তত্ত্বের হানিকর যে সীতাহরণ উপাখ্যান, তাহাও কাব্যস্থ করিয়াছেন। সীতার জীবনের বেদনা তাঁহাকে বারে বারে আকর্ষণ করিয়াছে। সীতার জীবনই যেন করুণ-রস-সিদ্ধ। তাই করুণ-রস-বিলাসী মধুসূদন গড়িমিসি করিয়াও তাঁহার কাহিনী বলিয়া আমাদের অশ্রুপাত করাইতে চাহিয়াছেন।

বাঙালী-জীবনের এই সমসাময়িক ব্যর্থতাকে কি মধুসূদন নিয়তির বিধান বলিয়া মনে করিতেছিলেন? একেবারেই না। তিনি সাংবাদিক ছিলেন। সংবাদপত্রের স্তম্ভে (Hindoo Patriot, সোমপ্রকাশ, সমাচার-দর্পণ, Friend of India, Indian Field), বিশেষ করিয়া সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে, বাঙালীর আসল মনোভাব যে ভাবে প্রকট হইতেছিল তাহা কি তাঁহারও মনোভাব নহে? বাঙালী বিদ্রোহ সমর্থন না করিয়াও ইংরাজকে সমর্থন করে নাই। মধুসূদনের নিজের পত্রাবলীতেও, বিশেষ করিয়া প্রবাস-পত্রাবলীতে, পরাধীনতার গ্লানিবোধ স্পষ্ট। অন্যদিকে দেশকে ভালবাসিয়াও দেশের যত কুশ্রীতাকে সমর্থন করা তাঁহার পক্ষে আদর্শ-বলিদানের সমতুল্য। যে কূপমণ্ডুকতা আর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁহার বিদ্রোহ তাহাকেই বা তিনি ভালো বলিয়া কেমন করিয়া বাহুপাশে লইবেন? তাই তিনি সামাজিক জীবন হইতে দূরে থাকিয়া নিজের মর্মজ্বালায় নিজেই দগ্ধ হইতেছিলেন। তাঁহার শেষ জীবনের আত্মঘাতী মদ্যপান কি শুধুই দারিদ্র্যের বেদনা ভুলিবার জন্য? বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেশে তাঁহার শ্বাস যেন আরও রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। তাঁহার সমসাময়িক এবং তাঁহার পূর্ববর্তী হিন্দু কলেজের দিক্‌পালেরা সকলেই যখন প্রায় ধর্মের ও সমাজের সঙ্গে আপোষ করিলেন তখন একা মধুসূদন যুগমন্থনজাত গরল পান করিয়া, একান্ত অভিমানভরে সেই বিশ্বাস-ঘাতক সামাজিক শক্তিকেই উদ্দেশ করিয়া ভৈরব কণ্ঠে চূড়ান্ত ভর্ৎসনা করিলেন,

……হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী,

সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ ? শূলীশম্ভুনিভ
কুম্ভকর্ণ ? ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী ?
নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে ?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলিয়ে ?
হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে !
রাঘবের দাস তুমি ? কেমনে ও মুখে
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে !
······হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে
কে তুমি ? জনম তব কোন মহাকুলে ?
কে বা সে অধম রাম ?······
······শাস্ত্রে বলে, গুণবান যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ পরঃ পরঃ সদা।
এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে ?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা ! হেন সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্ব্বরতা কেন না শিখিবে ?
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্মতি।··· ··৬ সর্গ

কে বলিবে যে এই তিরস্কারের পিছনে, মধুসূদনের, মনের গুহায়, পলাশীর বিশ্বাসঘাতকতা, ইংরাজের প্রবঞ্চনা, ইংরাজ পাদরীদের ধর্মধ্বজিতার সঙ্গে মিশিয়া নাই তাঁহার স্বদেশপ্রেম, নব মানবতাবাদ ও ধর্মের নামে মানুষকে বলি দিবার বিরুদ্ধে অনম্য প্রতিবাদ ? ইংরাজই এদেশে আনিয়াছে নব মানবতাবাদের, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের,আদর্শকে আবার সেই ইংরাজই সেই আদর্শকে পদে পদে দলিত করিতেছে। এই দেশের মানুষের অন্ধ আচার-পরায়ণতা আর সৃষ্টি-প্রেরণাহীন কূপ-মণ্ডুকতার বিরুদ্ধেই মধুসূদনের প্রতিবাদ আবার এই দেশেরই মানুষ আর প্রকৃতির প্রতি তাঁহার এত ভালোবাসা; জীবনে এত আশা আবার সেই আশারই ছলনা ; পুরুষকারের আকাশস্পর্শী অভিযান আবার অকারণে তাহার একান্ত ব্যর্থতা; বিদ্যাসাগরের সারাজীবনের সাধনার নিষ্ঠুর পারসমাপ্তি সরল সাঁওতালদের আশ্রয়ে পলায়নে,—এই জটিল মানসলোকেরই পূর্ণ প্রতিফলন মেঘনাদবধ কাব্যে। চিরন্তন নিয়তির পরিহাস দেখাইবার জন্য মধুসূদন মেঘনাদবধ রচনা করেন নাই। মেঘনাদবধের অন্তরে এই মহাক্রন্দনের মর্মোদ্ঘাটন না করিতে পারিবার ফলে এই ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দেও কি প্রকারের কাণ্ডজ্ঞানশূন্য সমালোচনা সম্ভব তাহার নিদর্শন মিলিবে ত্রৈ-মাসিক 'ইতিহাস' পত্রিকার ষষ্ঠ খণ্ডের তৃতীয় সংখ্যায় (১৩৬৩) ডাঃ

অমলেশ ত্রিপাঠীর 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সংস্কৃতি' নামক প্রবন্ধে ঐ মহাকাব্য সম্পর্কীয় মন্তব্যে। ইনি বিদ্যার অতি তুঙ্গ শিখর হইতে হঠাৎ আবিস্কার করিয়া ফেলিলেন, "বাঙালী মধ্যবিত্ত যেমন বুর্জোয়া সংস্কৃতির খোলসটাই পেয়েছিল তার সারটুকু পায়নি, মাইকেল তেমনি মহাকাব্যের বহিরঙ্গটাই সৃষ্টি করতে পারলেন, **তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি।**"[২১৪] এ হেন আবিষ্কার দেখিয়া সত্যই মনে হয় কৃষ্টির ক্ষেত্রে অধিকারি-ভেদ আইন করিয়া বলবৎ করা উচিত। ত্রিপাঠী মহাশয় এই প্রবন্ধেই মেঘনাদবধ কাব্যের কবি-মানসের মূল দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া প্রায় যোগীন বসু মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই বলিয়া ফেলিয়াছেন যে দেশের মাটিকে পরিত্যাগ করিবার ফলই এই। তাঁহার ভাষাতেই বলা ভালো, "মাইকেলের মত উনবিংশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের শিল্প-নির্ভর বুর্জোয়া সংস্কৃতিকে অনেকেই চিরন্তন ইউরোপীয় ঐতিহ্য ব'লে ভুল করেছিলেন। ইউরোপে প্রবাস-কালে বাস্তব ও আদর্শের বিরোধ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন (এই মন্তব্যের কি প্রমাণ আছে আমরা জানি না) —এবং এইজন্য আশাভঙ্গ ও আত্মবিলাপ (আত্মবিলাপের অভিনব ব্যাখ্যা বটে !)। অথচ তখন আপন সংস্কৃতির দৃঢ় ভিত্তিতে ফিরে আসা অসম্ভব—ইউরোপীয় বিচার-বুদ্ধি দিয়ে তাক আর মেনে নেওয়া চলে না। এই এপিক সংস্কৃতি-সংঘর্ষের বেদনা মেঘনাদবধের ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট। রামায়ণ যেমন আর্য-অনার্য সংস্কৃতি দ্বন্দ্বের মহাকাব্য, মেঘনাদবধও তেমনি প্রাচী প্রতীচি সংঘর্ষের **মহাকাব্য**।"[২১৫] আগের উদ্ধৃতির সঙ্গে এই উদ্ধৃতির বক্তব্যের মৌলিক পার্থক্য। ডাক্তার ত্রিপাঠী কি বলিবেন ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তাঁহার মন্তব্যের এই পরস্পর-বিরোধিতা ছাড়াও, তাঁহার মৌলিক ভুল হইতেছে দ্বন্দ্বটিকে তৎকালীন বাঙালীর জাতীয়জীবনের দ্বন্দ্ব হিসাবে না দেখিয়া সেই পুরাকালীয় পূর্ব-পশ্চিম দ্বন্দ্ব হিসাবে দেখা—প্রমথ চৌধুরীর সেই পুরানো কথা, "আমরা ও তোমরা।" মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ও মধুসূদনের বাঙালীত্ব সপ্রমাণ করিবার প্রচেষ্টায় কবি-মানসে দ্বন্দ্বের তীব্রতাই অনুধাবন করিতে পারেন নাই।

মধুসূদনে আমরা দেখিলাম রেনেসাঁ-চেতনার স্ফুরণ আবার তাহার ব্যর্থতা—পূর্ণ স্ফূর্তির আগেই পরিসমাপ্তি—খণ্ডিত প্রকাশ মাত্র। এই অপূর্ণ প্রকাশের কারণও আমাদের উনিশশতকী রেনেসাঁর প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত। আমাদের রেনেসাঁই যে খণ্ডিত। আমরা মনে মনে শেক্সপীয়র মিল্টন হইতে আরম্ভ করিয়া শেলী, টম পাইন, গডউইন, হিউম পর্যন্ত লইয়া মানসভোজ করিলাম কিন্তু বাস্তব জীবনে সেই গণতন্ত্র, সেই ব্যক্তি-স্বাধীনতা, সেই সার্থক পুরুষকার, সেই যন্ত্রশিল্পের মাধ্যমে প্রকৃতিকে জয় করিয়া প্রকৃতির উপর মানুষের কর্তৃত্ব স্থাপন

কিছুই এখানে তেমন করিয়া ঘটিয়া উঠিল না। বাঙালা মানস-মুকুল আগুনে ভাজিল। ইহারই প্রতিফলন মেঘনাদবধে। ইহার সঙ্গে যদি তুলনা করি Shakespeare এর Antony & Cleopatra তাহা হইলে বুঝিতে পারিব রেনেসা চেতনার সার্থকতার রূপ কি। Shakespeare এর মানসকন্যা Cleopatra সর্বৈশ্বর্যময়ী ঐতিহাসিক মানবী।

Age cannot wither her, nor custom stale
Her infinite Variety : other women cloy
The appetites they feed, but she makes hungry
Where most she satisfies, for vilest things
Become themselves in her, that the holy priests
Bless her, when she is riggish...Act II.scii ll 240-245

তবু কিন্তু Shakespeare এর নাটকখানি ট্র্যাজিডি। মেঘনাদবধ কাব্যও করুণরস-সর্বস্ব। পার্থক্য এই যে Shakespeare এর নাটকে জীবনের অনির্বচনীয় পূর্তি মৃত্যুকে জয় করিতেছে আর মধুসূদনে জীবনের অপূর্ণতার প্রতীক হিসাবেই মৃত্যু আসিতেছে। Cleopatra হইল পরিপূর্ণতার রূপ আর রাবণ (ও মেঘনাদ) অপরিপূরণীয় সম্ভাবনার রূপ—একজন রেনেসাঁর সার্থকতার রূপায়ণ আর একজন রেনেসার ব্যর্থতার চিত্র। তাই Cleopatra সম্পর্কে এবং Antony Cleopatra নাটক সম্পর্কে Charles Jasper Sisson বলিতেছেন, "There is no more superb tragedy in the history of literature. The moralists have, of course, been troubled by the anarchic romanticism of the play, and Cleopatra fits ill into their categories. But if Hamlet is Shakespeare's greatest character among the men of his creation, **Cleopatra is by far the greatest in stature among his women and in her own right**.......As for the play, it is highly relevant in the present age of materialism to contemplate the subjection of death and its terrors **to the splendours of which human nature is capable. To turn death itself into a triumph** is an achievement of Chirstianity and of romantic tragedy." এবং এই মৃত্যুত্তরণ ঘটিতেছে বিশ্ব-ইতিহাসের পটভূমিকায় : "The setting for the story of Antony and Cleopatra is the vast panorama of world history, in

which are seen the marchings and counter-marchings of East and West, not in armies alone but in the hearts and minds of men and women too."[২১৬] এই হইল সার্থক রেনেসাঁর রূপ! কিন্তু বাংলার রেনেসাঁই যে খণ্ডিত।

গ

এই সূত্রেই প্রমীলা উল্লেখযোগ্য। নিজের জীবনে যে সঙ্গিনী তিনি খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন, মেঘনাদবধের প্রমীলা মেঘনাদের সেই উপযুক্ত সঙ্গিনী। এই প্রমীলার সঙ্গে মহাভারতে দ্রৌপদীর সাদৃশ্য রহিয়াছে। যোগীন্দ্রনাথ বসু ঝান্সীর রাণী লক্ষীবাঈ-এর রেশ খুঁজিয়া পাইয়াছেন তাঁহার মধ্যে। বিদেশী সাহিত্যের অনেক নারী চরিত্রের সঙ্গে তাঁহার সাদৃশ্য অনেক সমালোচকই দেখাইয়াছেন। কিন্তু এ সমস্তই বাহিরের কথা।

প্রমীলা চরিত্রের মূল তত্ত্ব হইতেছে নারীর স্বাধীনতা অর্জনের তত্ত্ব। প্রমীলা সেই নারী যে পুরুষের সর্বকর্মের সঙ্গিনী আবার আপন স্বতন্ত্র মহিমাতেও যে উজ্জ্বল। এই নূতন নারী আমাদের সাহিত্যে ইহার আগে দর্শন দেয় নাই—এমন কি শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতীতেও নয়। তিলোত্তমায় এই নারীর প্রথম আবির্ভাব ঘটে কিন্তু তিলোত্তমা তখনও আত্মনির্ভরশীল স্বাধীন নহেন। তিনি তখনও অপরের হাতে যন্ত্র মাত্র। প্রমীলাতেই প্রথম দেখিলাম নূতন যুগের বিচিত্র ঐশ্বর্যময়ী, স্বপ্রতিষ্ঠ নারী যাহার প্রেম শুধু পুরুষের ক্ষণ-ক্ষণান্তরের প্রয়োজন মিটাইবার মুখাপেক্ষী হইয়া দৈহিক স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকে না; যাহার প্রেম পুরুষকে উদ্দীপ্ত করে; যাহার জীবনের আদর্শ সচেতন সমপ্রাণতায় পুরুষের আদর্শের অনুপন্থী। প্রমীলার বাস্তব রূপে আর আদর্শ রূপে কোনো দ্বন্দ্ব নাই—সে রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা খণ্ডিত চেতনার 'লাবণ্য' নয়, যাহার 'অমৃত মূরতি' তাহার প্রেমিক পূজা করে আর যাহার বাস্তব মূর্তিকে শোভনলাল বিবাহ করে। প্রমীলাকে মেঘনাদ পরিপূর্ণ করিয়াই পাইয়াছেন:

……ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী উষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখী-কুল! মিল, প্রিয়ে, কমল-লোচন!
উঠ, চিরানন্দ মোর। সূর্য্যকান্ত মণি-
সম এ পরাণ কান্তা; তুমি রবিচ্ছবি;—
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন।
ভাগ্য-বৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে
আমার।" ……৫ম সর্গ

এই দুইজনের মিলন পরিপূর্ণ; তাই একের তিরোধানে অপরের অস্তিত্ব অসম্ভব। সেইজন্যই কাব্যের শেষ হইল প্রমীলার সহমরণে। যোগীন্দ্রনাথ বসু অবশ্য ইহার মধ্যে সহমরণ প্রথার গৌরব দেখিয়াছেন; ভারতললনা, পতির পদ-প্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া, অনেক সময়ে, কিরূপ সহাস্য মুখে চিতানলে জীবন উৎসর্গ করিতেন, সাধ্বী প্রমীলার চিতারোহণে কবি তাহা বর্ণনা করিয়াছেন।" ২১৭ যে মধুসূদন বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হইবার পরে বিদ্যাসাগরের মর্মর-মূর্তি নির্মাণ করাইবার উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন এবং নিজ পরিবারে পুরুষের চূড়ান্ত স্বেচ্ছাচারিতা দেখিয়া জাহ্নবী দেবীর মর্ম-যাতনায় নিজে অধীর হইয়াছিলেন তিনি শেষ পর্যন্ত সহমরণ সমর্থন করিবেন ইহাই কি বিশ্বাস করিতে হইবে? মোহিতলাল, মধু-কবির বাঙালীত্ব প্রতিপন্ন করিবার ব্যগ্রতায় এই কথাটি কি ভাবিয়া দেখিয়াছেন? মাতা ও বধূর ক্রন্দনরবে বিজয়ীর জয়োল্লাস ডুবিয়া গেল—বীরাঙ্গনার যুদ্ধযাত্রা বাঙালী বধূর সহমরণ-যাত্রার করুণ দৃশ্যে, অদৃষ্টের পরম পরিহাসের মত নিদারুণ হইয়া উঠিল। ২১৮ কিন্তু মোহিতলাল ভুলিয়া গিয়াছেন কিংবা ভাবিয়া দেখেন নাই যে ১৮৬০—৬১ সালে বাঙালী বধুর সহমরণ আর সামাজিক সত্য নয়—বিশেষ করিয়া শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজে ত নয়ই। বাঙালী বধূর কি কষ্টই না ছিল ইহা মনে করিয়া মধুসূদন কাঁদিয়া আকুল হইবেন ইহাই কি ভাবিতে হইবে? তাহা ছাড়া মোহিতলাল একটু গভীরে গেলেই বুঝিতে পারিতেন যে, বাঙালী বধূর সহমরণের চিত্র আঁকিলেও মধুসূদনের আবেগ তাহার প্রতিকূলেই যাইত। কিন্তু মেঘনাদ বধ কাব্যের শেষ দৃশ্যে মধুসূদন এই সহমরণ সমর্থন করিয়াছেন। **এই সহমরণের মাধ্যমে মধুসূদন প্রেমের মৃত্যুহীন গৌরবই ঘোষণা করিয়াছেন আর দেখাইয়াছেন সেই প্রেমের অপচয়। যে প্রেম জীবনকে উজ্জ্বল মহিমায় মণ্ডিত করিতে পারিত সেই প্রেম সমুদ্রতীরে শ্মশানে ভস্মীভূত হইল—বাঙালী মেয়ে, বাঙালী পুরুষের মতই সার্থকতার স্বপ্ন দেখিল, কিন্তু পাইল না।**

এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দেখিলে তৃতীয় সর্গে প্রমীলার লঙ্কা-প্রবেশ কি শুধুই বীররমণীর পতিগত-প্রাণতা ও বীর্য-বিলাস বলিয়া প্রতিভাত হয়? প্রমীলা বীর্যবতী সন্দেহ নাই কিন্তু ঐ রাত্রির আগে কোনোদিন তিনি কি কুঞ্জগৃহ ত্যাগ করিয়া স্বামীর সন্ধানে গিয়াছেন? অন্য কোনোদিন কি তিনি দুর্জয় সাহসে ধর্মের পক্ষের বাহিনী ভেদ করিয়া সমস্ত লোকাপবাদ ও লোকাচার তুচ্ছ করিয়া, ভয়াল নিশীথে, নিজ পতির অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছেন? হন নাই। আজিকার রাত্রি হইল তাঁহার চরম পরীক্ষার রাত্রি। যাঁহাকে ভালবাসিয়াছেন তাঁহার জীবনের এই সন্ধিক্ষণে পাশে আসিয়া দাড়াইবার সাহস ও যোগ্যতা তাঁহার আছে কি না তাহাই

আজ প্রমীলাকে দেখাইতে হইবে। পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইলেন। অন্তঃপুরের অন্ধ আচার-সর্বস্ব পৌনঃপুনিক, নিরানন্দ দাসীর জীবনকে দুই পায়ে ঠেলিয়া বাঙালী মেয়ে যেন বাহির হইয়া আসিল জীবনের সংঘাত-মুখর বিচিত্র কর্মক্ষেত্রে। অবশ্য প্রমীলার কুঞ্জগৃহ বাঙালী বধূর অন্তঃপুর নয়। কিন্তু সে কথা গৌণ। মুখ্য কথা হইল প্রমীলার এই আকস্মিক দুর্জয় অভিসার। কিন্তু সেই অভিসার-শেষে স্বামীর পাশে আসিয়া তিনি কি শেষ পর্যন্ত তাহার কর্মসঙ্গিনী হইতে পারিলেন না। মন্দোদরীর দাবী আসিয়া সে ইচ্ছায় বাদ সাধিল। প্রমীলার অভিসার ও অভিযান কোনো কাজেই আসিল না। বাঙালীর গৃহাভ্যন্তর তাঁহাকে ছাড়িয়াও ছাড়িল না। তাই নারীত্বের পরিপূর্ণ রূপ যাহা আমরা Cleopatraতে পাই তাহা প্রমীলাতে পাই না।

ঘ

'সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।' মধুসূদন সারা জীবন কাঁদিয়াছিলেন। সেই যুগ হইতে আজ পর্যন্ত বাঙালীরও আনন্দিত হইবার কোনো কারণ জীবনে ঘটে নাই। যে ব্যর্থতার শুরু সে যুগের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিবেশে আজও তাহা শেষ হইল না। রাবণের দীর্ঘশ্বাস আর বিলাপ এই একশত বৎসর ধরিয়াই বাঙালীর জীবন-সত্য। জীবনের যে পরাজয় সেই যুগে সূচিত হইয়াছিল মাত্র তাহাই আজ মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। **মধুসূদন সেই সত্যকে অঙ্কুরেই চিনিতে পারিয়াছিলেন;** এইখানেই তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টি। কবির প্রতিভা বর্তমানের মধ্যেই ভবিষ্যতের রূপ দেখিতে পায়, কিন্তু সব কবি পায় না। যাহাদের দৃষ্টি চপল, যাহাদের ধারণা-ক্ষমতা অল্প তাহারা সমাজ-বাস্তবের উপরিতলটিই দেখে এবং সেই উপরিতলকেই সবটুকু সত্য মনে করিয়া ইনাইয়া-বিনাইয়া নিজেদের অগভীর উপলব্ধিকে পল্লবিত করিতে থাকে। ইহারা সেই কালে ও দেশে অনেক সুখ্যাতি লাভ করিয়া থাকে কিন্তু কিছু পরেই আর তাহাদের কথা কেহ মনে করিয়া রাখে না। কিন্তু যে কবি-প্রতিভা বর্তমানের তীক্ষ্ণ উপলব্ধি হইতে সমাজ-বাস্তবের মূলে প্রবেশ করিয়া সেই যুগ-সত্যটিকে আবিষ্কার করে, যাহা একটি সম্পূর্ণ যুগকে ব্যাপিয়া বিচিত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে, সেই প্রতিভাই যুগন্ধর এবং সেই অর্থেই মধুসূদন যুগন্ধর। তবু মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য মহাকাব্য নয়; মূলত lyric বা খণ্ড কাব্য (গীতিকবিতা বা গীতিকাব্য নামটি ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করিলাম না)। তাহার কারণ শুধু ইহাই

নয় যে মহাকাব্য-সুলভ গুণগুলির অভাব আছে মধুসূদনের কাব্যে। সে অভাব ত আছেই। প্রথমত রাবণকে নায়ক করিবার ফলে জাতির ঐতিহ্য-গত আবেগের সমর্থন তিনি লাভ করিতে পারিলেন না—যুগ-যুগ-সঞ্চিত পুঞ্জীভূত রাম-কেন্দ্রিক যে ভাবলোক তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার ফলে বাঙালীর স্বতঃস্ফূর্ত অনুমোদন মধুসূদনের ভাগ্যে জুটিল না; যদিও নব চেতনায় দীপ্ত বাঙালী জনসাধারণের অংশবিশেষের পরিপূর্ণ সমর্থন তিনি পাইয়াছিলেন। দ্বিতীয়ত যে ঘটনাকে তিনি আশ্রয় করিলেন সেটি জাতির জীবনের কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা নয় [হোমারের মহাকাব্যের বা ভার্জিলের মহাকাব্যের সত্য প্রাগৈতিহাসিক ভিত্তি আছে আর মিলটন কিংবা দান্তের মহাকাব্য সোজাসুজি মানুষের অধ্যাত্মজীবনের চিরন্তন দ্বন্দ্ব এবং তাহার সমাধানের কাহিনী] বা এমন কোনো ঘটনা নয় যাহার সত্যতা স্বতঃপ্রকট। তৃতীয়ত, এবং মুখ্যত মেঘনাদবধ কাব্যে আসলে কোন কাহিনীই নাই। আখ্যান-মূলকতা যদি মহাকাব্যের একটি গুণ হয় তাহা হইলে মেঘনাদবধ কাব্যে তাহার একান্ত অভাব। এই কাব্যে অষ্টম সর্গ একান্তই প্রক্ষিপ্ত এবং কৃত্রিম; সপ্তম সর্গে শুধু একটি ঘটনার বর্ণনা আছে। অন্যান্য সর্গেও যে সকল দৈবী কার্যকলাপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও ঊনিশ-শতকী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালীর কাছে শুধুই কবি-কল্পনা বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। যে ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মধুসূদন বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, তাঁহার কাব্যের দেব-গন্ধর্বাদি যে সেই কুসংস্কার-প্রসূত তাহা তিনিও বুঝিতেন। একথা কি মধুসূদনের কাছে অজ্ঞাত ছিল যে, হোমারের কাব্যে হেরা (Hera) যাহা করিতে পারেন ঊনিশ-শতকী রেনেসাঁ যুগে পার্বতী কৈলাসে তাহা করিলে শুধু হাস্যকরই হয়। অতএব এই দেব-গন্ধর্বাদির অনুপ্রবেশ শুধু কাব্যের অলঙ্করণ মাত্র, প্রাণের কথা কিছু নয়।

এই সমস্ত অলঙ্করণ এবং প্রক্ষেপ বাদ দিলে এই মহাকাব্যের যাহা থাকে তাহা হইল রাবণের বিলাপ, সীতার বিলাপ, মেঘনাদের ক্ষোভ ও প্রমীলার বিস্ময়কর অভিযান। বিলাপই হইল মুখ্য কথা এবং তাহার কারণও আমরা নির্দেশ করিয়াছি এবং দেখাইয়াছি যে ইহাই মেঘনাদবধ কাব্যের বিশেষত্ব ও মহত্ত্ব। কবির হৃদয়ের করুণ ভাবোচ্ছ্বাসই রাবণের মধ্যমে সারা কাব্য ব্যাপিয়া আছে। এবং অন্য যাহা কিছু বা আছে, তাহাও এই মর্মভেদী আর্তনাদে সম্পূর্ণ তলাইয়া গিয়াছে। উচ্ছ্বাসই এ কাব্যের প্রাণ, আখ্যানবর্ণনা নহে। "এপিক-আকারের তলে তলে অন্তঃসলিলা হইয়া

লিরিকের ফল্গুস্রোত বহিয়াছে। লিরিক সুর কবির সুপ্ত আত্মারই ক্রন্দনধ্বনি, ইহাকে নিবারণ করা কবির পক্ষে অসাধ্য ছিল। নিজ জীবনের যে নিষ্ফলতা ও নৈরাশ্য তিনি জাগ্রত চৈতন্য হইতে দূরে রাখিতে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন, তাহারই রুদ্ধ কাতর ক্রন্দনে মহাকাব্যের গীতোচ্ছ্বাসকেও প্রতিহত করিয়াছে। যে কামনা সফল হইবার আশা ছিল না, যে আদর্শকে সারা প্রাণ দিয়া বরণ করিয়াও জীবনে জয়ী করিতে পারেন নাই, তাহাই তাঁহার প্রাণের নিভৃত কোণে অশ্রুর উৎসরূপে বিরাজ করিতেছিল। রাম-লক্ষ্মণ-বিভীষণ রূপী সমাজই জয়ী হইবে, এ যেন তাঁহার নিজ জীবনেরই আক্ষেপ—তাহাদের জয়ী হওয়া উচিত নয়, তবুও হইবে! তাই তাহাদের প্রতি কবির আক্রোশের অন্ত নাই। মেঘনাদ যখন মরিবেই তখন তাহাকে অন্যায় যুদ্ধে হত হইতে হইবে এবং লক্ষ্মণকেই সেই হত্যার কলঙ্ক কলঙ্কিত করিতে না পারিলে কবির আত্মা শান্তি পাইবে না। এই জন্যই মেঘনাদবধ কাব্যে বীররস প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই [২১৯]। এইখানে মোহিতলাল লিরিকের ফল্গুধারার কথা স্বীকার করিয়াও এই গ্রন্থেই কিন্তু মেঘনাদবধের অমিত্রাক্ষরকে খাঁটি এপিকের অমিত্রাক্ষর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উপরন্তু মোহিতলাল যেন বলিতে চাহিতেছেন, করুণ-রস-প্রধান বলিয়াই মেঘনাদ বধ মহাকাব্য হইল না। তাহা হইলে ত রামায়ণ এবং মহাভারত কোনখানিই মহাকাব্য নয়। কারণ দুইখানিই করুণরস-প্রধান। [অবশ্য রামায়ণ ও মহাভারত পাশ্চাত্য আদর্শের মহাকাব্য নয়] করুণরস প্রধান হইলেই লিরিক হয় না আবার লিরিক হইলে করুণরস-প্রধান হয় না। দুটির মধ্যে কোন কার্যকরণ সম্পর্ক নাই। মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য যে প্রধানত লিরিক-ধর্মী, তাহার কারণ তাঁহার ব্যক্তিগত ভাবোচ্ছ্বাসকে ধারণ করিয়া সার্থক করিতে পারে, এমন কোন ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক চরিত্র তিনি খুঁজিয়া পান নাই। তাহার কারণ তাঁহার কবিমানসের মূল অনুভূতিই হইল ব্যর্থতা। ব্যর্থতাবোধের স্বাভাবিক প্রকাশই হইল, উচ্ছ্বাস, চরিত্র বা অখ্যানের মধ্য দিয়া বর্ণনা নহে। রেনেসাঁ যুগের যে নব আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত, তাহাকে সার্থক করিতে গিয়া ব্যর্থতা বরণ করিয়াছে এবং যে চরিত্র সমগ্র বাঙালীর হৃদয়াবেগকে আপনার উপর কেন্দ্রীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছে, এমন কাহারও সন্ধান মধুসূদনের পক্ষে সে যুগে পওয়া সম্ভব ছিল না। (তাঁহার সামনে একমাত্র পুরুষ বিরাজ করিতেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর; কিন্তু তিনি অতি কাছের মানুষ বলিয়া তাঁহার সম্যক্ গৌরব মধুসূদনের কাছে ঐতিহাসিক বলিয়া বোধ হয় নাই।) তাহার উপর উচ্ছ্বাস সব সময় একমুখী হইতে চাহে। কিন্তু চরিত্র সৃষ্টি করিতে হইলে তাহার বৈচিত্র্যের দিকে দৃষ্টি দিতেই হইবে।

মধুসূদনের সে ধৈর্য নাই, থাকা সম্ভবও নহে। তাঁহার অধীর হৃদয় শুধু কাঁদিয়াই উঠিতে চাহিয়াছিল। তাই ইহা বলিলে অত্যুক্তি বা সত্যের অপলাপ করা হইবে না যে মধুসূদন বাঙালীর অলিখিত মহাকাব্যের মহাকবি। ডাঃ সুশীল কুমার দে ঠিকই বলিয়াছেন, "যে শক্তির স্ফূর্তি ও সংস্কার মুক্তির প্রেরণা বাংলা সাহিত্যের সংকীর্ণ খাতে সমুদ্রগর্জন আনিয়াছিল, নির্জীব পয়ারকে সঞ্জীবিত ও পক্ষমুক্ত করিয়া মহাকাব্যের আকাশে ছাড়িয়া দিয়াছিল, তাহা প্রকৃতপক্ষে একটি lyric আবেগ, প্রাণের দুর্দমনীয় বিদ্রোহের উল্লাস" (নানা নিবন্ধ : বাংলা মহাকাব্য ও মধুসূদন)।

কথাশেষ

কিন্তু এখনও অনেক কথা না বলা রহিয়া গেল ; বিশেষ করিয়া মধুসূদনের বিদেশীয় ও দেশীয় সাহিত্য হইতে আক্ষরিক ঋণের কথা, তাঁহার অলঙ্কার-বিলাস ও বাগ্‌বিস্তারের কথা। কিন্তু কালিদাস, ভবভূতি বাল্মীকি ; হোমার ভার্জিল, দান্তে, তাস্‌সো ; মিলটন, শেক্সপীয়র, বায়রণ এবং আরও অনেকের নিকট হইতে মধুসূদন যে ভাষা ও বস্তু ধার করিয়াছেন তাহার আলোচনায় আমরা ভাষা বা অলঙ্কার বিষয়ে ঋণের উপর কোনো জোরই দিই নাই কারণ রাজনারায়ণ বসু হইতে আরম্ভ করিয়া যোগীন্দ্রনাথ বসু, রাজেন্দ্রনাথ দাস, দীননাথ সান্যাল প্রভৃতিরা সে কথা অনেক বলিয়াছেন এবং চেষ্টা করিলে ভার্জিল ও শেক্সপীয়রের নিকটে মধুসূদনের এই জাতীয় ঋণ আরও আবিষ্কার করা যাইতে পারে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য মধুসূদনের ভাবলোক বিশ্লেষণ করা এবং প্রমাণ করা যে, যে নূতন ভাবলোক বাঙালীর জীবনকে ঘিরিয়া গঠিত হইতেছিল মধুসূদন সেই ভাবলোকের কেন্দ্রীয় বীজটি কবি-মানসে ধারণ করিয়া, লালন ও পোষণ করিয়া তাহার পরিপূর্ণ মহীরূহ রূপটি আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। এই ভাবলোকের নির্মাণে পাশ্চাত্যের নব-মানবতাবাদ, যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাধীনতাবাদ, ঐহিকতা, সৌন্দর্যপূজা ও গণ-তান্ত্রিক জীবনের চেতনা---ভিত্তি রচনা করিয়াছে। আমরা এই ভিত্তির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করিয়াছি। এবং ইহাও দেখাইয়াছি যে, মধুসূদন যে ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা ভিন্ন অন্য কোনো প্রকারের ভাষা তাঁহার পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। অলঙ্কার-প্রয়োগ বা ঐজাতীয় অন্যান্য প্রশ্নও আমাদের বিচার্য বিষয়ের অন্তর্গত ত নহেই বরং আমাদের চোখে এগুলির আলোচনা মধুসূদনের কবিকৃতির আলোচনার তুলনায় একান্ত গৌণ। তিলোত্তমাসম্ভবের আলোচনাতেও আমরা দেখাইয়াছি যে অমিত্রাক্ষর প্রয়োগ একটি মুখ্য ঘটনা হইলেও তিলোত্তমাসম্ভবের অন্তরের কথা বাংলা কাব্যধারার আলোচনায় প্রধানতর ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। তাহা ছাড়া অলঙ্কার-প্রয়োগে মধুসূদনের প্রচুর ত্রুটি, দুরান্বয় (Parataxis), অনন্বয় (anacoluthon), অল্পকথায় ভাবপ্রকাশে অক্ষমতা, নামধাতুর অতিপ্রয়োগ—ইত্যাদি আলোচনা আমাদের বিচারের গণ্ডীর বাহিরে কেননা এগুলি আঙ্গিকের প্রশ্ন আর আমাদের বিষয় হইল ভাববস্তু। যদিও ভাববস্তু ও আঙ্গিকের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য তবু আঙ্গিকের প্রশ্ন লইয়া পৃথগ্‌ভাবে দীর্ঘ আলোচনা বাঞ্ছনীয়।

তবে কথাশেষে না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে সেকালের কল্লোল-যুগের বিদ্রোহী একালের পরম বৈষ্ণব, রবীন্দ্রনাথের স্থান গ্রহণে উদ্‌গ্রীব শ্রীবুদ্ধদেব বসু মহাশয় যে আবিষ্কার করিয়াছেন যে, মধুসূদন বাংলা জানিতে না [২২০] তাহা বাংলা ভাষার ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক বিবর্তনের কথা যাহারা একেবারে ভুলিয়াছে তাহারাই বলিতে পারে। বুদ্ধদেব বাবু প্রথমত মধুসূদনকে আক্রমণ করিয়াছেন কাব্যের বিষয়বস্তু লইয়া এবং যে দুটি অর্বাচীন সমালোচনা (প্রথম বর্ষ ভারতীতে এবং 'আলোচনা' নামক গ্রন্থে) রবীন্দ্রনাথ নিজেই প্রত্যাহার করিয়াছিলেন এবং সেই মর্মে মন্তব্যও করিয়াছিলেন যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের ১২৯৯ সালের নব্যভারত পত্রে সমালোচনার উত্তরে, সেই দুটি প্রবন্ধকেই বুদ্ধদেব বসু মহাশয় রবীন্দ্রনাথের আসল বক্তব্য বলিয়া মনে করিয়া, পরবর্তীকালে সাহিত্যসৃষ্টি প্রবন্ধে [২২১] রবীন্দ্রনাথের গভীরতর বক্তব্যকে কবির মনের কথা নয় বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন; অর্থাৎ তিনি রবীন্দ্রনাথকেও মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন। এই কথার জবাব আমরা পূর্ব পূর্ব পরিচ্ছেদে অবচ্ছেদাবচ্ছেদে দিয়াছি কিন্তু মধুসূদন বাংলা জানিতেন না এই রকম প্রগল্‌ভ উক্তির উত্তর দিবার চেষ্টা না করিয়াও আমরা নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি করিতে পারি।

মধুসূদনের সমকালীন ইংরাজী-নবীশ ও সংস্কৃতজ্ঞ দুই জাতীয় পণ্ডিতেরাই বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধিবেশন ডাকিয়া তাঁহাকে যে সম্বর্ধনা করিয়াছিলেন সে কি মধুসূদন বাংলা জানিতেন না বলিয়া? রাজনারায়ণ বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, রমেশচন্দ্র দত্ত এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ইঁহাদের কেহই বোধ হয় বাংলা ভাষা ভালো করিয়া জানিতেন না কারণ জানিলে বুদ্ধদেব বসু মহাশয়ের মতানুসারে তাঁহারা কখনই মধুসূদনকে অনন্যসাধারণ কবি বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তবু বিদ্যাসাগরই বাংলা গদ্যের জনক আর বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্যই বাংলা লিখিতে জানিতেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরাজী-জ্ঞান নিতান্ত কম না থাকিলেও মাতৃভাষাকে তিনি বুদ্ধদেব বাবুর মত ইংরাজী idiom এর বাহন করেন নাই। বুদ্ধদেব বাবু কি ইহা জানেন যে মধুসূদনের জীবদ্দশাতেই মেঘনাদবধ কাব্যের বহু সংস্করণ হইয়াছিল? এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাংলা দেশে এ গৌরব আর কাহারও প্রাপ্য নয়। বসু মহাশয় ইহাও কি ভাবিয়া দেখিয়াছেন যে মেঘনাদবধ কাব্যের কত বিচ্ছিন্ন পংক্তি এবং কত স্তবক পর্যন্ত, শুধু শিক্ষিত বাঙালীর নয়, অশিক্ষিত বাঙালীরও দৈনন্দিন জীবনে ভাব প্রকাশের বাহন হইয়া উঠিয়াছে? যথা:—

(১) কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে

(২) নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা রে দূত
(৩) কিন্তু একে একে শুকাইছে ফুল এবে নিবিছে দেউটি
(৪) রাবণ শ্বশুর মম মেঘনাদ স্বামী
আমি কি ডরাই সখী ভিখারী রাঘবে
(৫) কোন গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে
(৬) মজালে রাক্ষসকুলে মজিলে আপনি
(৭) যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে বয়সে কাঙালী

তাহা ছাড়া সংস্কৃতের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বাংলাভাষার ভবিষ্যৎ যে কত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল তাহা কি বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পরেও যুক্তি দিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে? সংস্কৃতের ধনে ধনী বাংলাভাষার, পরে অবশ্য, প্রয়োজন হইয়াছে কথ্য ভাষার আরও কাছাকাছি আসিবার কিন্তু সেই প্রত্যাবর্তন কি সম্ভব হইত ভারতচন্দ্রের ভাষার উপর নির্ভর করিয়া? আর অনেকে যে মধুসূদনের বিরুদ্ধে কৃত্রিমতার অভিযোগ আনেন তাঁহারা কি কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছেন যে Spenser কি Milton কি Vergil কখনও কথ্য কি চলিত ভাষায় তাঁহাদের মহাকাব্য রচনা করেন নাই; তাহার কারণ মহাকাব্য আটপৌরে জীবনের কাব্য নয়। Shakespeare এর পরেও যদি Miltonকে ঐ দুরূহ ভাষা প্রয়োগ করিতে হইয়া থাকে তাহা হইলে যে মধুসূদন পথিকৃৎ তাঁহার পক্ষে কর্তব্য কি দুঃসাধ্য ছিল তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। ভাষা ত কোন ভুঁইফোড় সামগ্রী নয়। তাহারও বিবর্তন আছে। যে মধুসূদন প্রহসন লিখিয়াছেন তিনিই মহাকাব্য লিখিয়াছেন ইহা মনে রাখিলে অনেক অহেতুক ভুল বোঝাবুঝির নিরসন হইতে পারে। এ কথা ঠিক যে মধুসূদন বহু ক্ষেত্রেই এমন দুরূহ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন যাহার সরলতর রূপ নির্মাণ করা বা খুঁজিয়া বাহির করা যাইত। কিন্তু সরলতর বাংলা বলিতে যাহা ছিল তাহা ত হুতোমে দেখা গিয়াছে। আজিকার কথ্যভাষার প্রাণশক্তি ও সম্পদ সেকালের বাংলায় যে ছিল না তাহা দীনবন্ধুর সার্থকতম নাটক নীলদর্পণের পাত্র-পাত্রীদের কথোপকথনেই পরিস্ফুট। আজিকার ঐশ্বর্যময় বাংলার পিছনে মধুসূদনের দান কতখানি তাহা আমার ভুলিয়া যাই; কিন্তু মধুসূদন বুঝিয়াছিলেন বাংলাভাষার ভবিষ্যৎ কি:

নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারি তুমি হে আজি, কহ ধনপতি?

বাংলাভাষার ভিক্ষাবৃত্তি আজ ঘুচিয়াছে কিন্তু বুদ্ধদেব বাবুরা এখনও বাংলা ভাষাকে সাবালিকা মনে করিতে পারেন না—‘বীরাঙ্গনারা’ অমন করিয়া মনের

কথা বলিবার পরেও নয়। বুদ্ধদেব বাবুদের অবশ্য আসল উদ্দেশ্য মধুসূদনের ভাষাকেই শুধু আক্রমণ করা নয়, তাঁহার কবিত্বকেও সম্পূর্ণ অস্বীকার করা।* যে পরিচয়টুকু মধুসূদন বাঙালীর কাছে তাঁহার একমাত্র কাম্য পরিচয় বলিয়া সবিনয়ে সমাধিফলকে উৎকীর্ণ করিতে বলিয়াছিলেন সেই পরিচয় বসু মহাশয়েরা গ্রহণ করিতে রাজী নহেন। ভাবিয়া দেখিতে বলি ঐ কয় ছত্রের নিরাভরণ ভাষার তীক্ষ্ণ বেদনাময় আত্মনিবদনকে। মেঘনাদবধ কাব্যের সমস্ত হাহাকারের শেষে অনির্বচনীয় বিষাদে কবি ইহাই শুধু বলিতেছেন—আমি আর কিছু করিতে চাহি নাই, আমি আর কিছুই নই—আমি শুধু কবি। বাঙালী সেই যুগে আর কিছুই জীবনে অর্জন করিতে পারিল না বটে কিন্তু আপনার অন্তরবেদনা দেশবাসীকে জানাইয়া গেল। কবি হইবার এই বেদনাটুকুকে যেন বাঙালী অস্বীকার না করে ঃ

দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধি স্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!
যশোরে সাগরদাঁড়ী কবতক্ষ তীরে
জন্মভূমি জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননা জাহ্নবী!

---

* এই সম্পর্কে বর্তমান লেখকের দীর্ঘ আলোচনা শনিবারের চিঠির ১৩৬৩ সনের কার্তিক সংখ্যায় প্রাপ্তব্য।

নির্দেশিকা

১ ... ... A People's History of England by A. L. Morton-New Edition, 1948, pp 184-18

২ ... ... Hamlet, II, ii

৩ ... ... A Midsummer Night's Dream—v. i;

৪ ... ... Plato—Ion, 534 and 537

৫ ... . Aristotle—Poetics, ch. 9 (Bywater's Translation)

৬ ... . ঐ

৭ ... ... Hamlet—II, ii

৮ ... ... A People's History of England—পৃ ৯০

৯ ... ... ঐ পৃ ৯২-৯৩

১০ ... ... ঐ পৃ ৯৩-১০৪

১১ ... ... Christopher Hill & Edmmund Dell—The Good Old cause—পৃ ৫৮

১২ ... ... ঐ পৃ ৫৯

১৩ ... ... Henry IV, Part 1. V, i;

১৪ ... ... আগেই উল্লিখিত

১৫ ... ... Leo Huberman—Man's Worldly Goods—পৃ ১৩০

১৬ ... ... A Midsummer Night's Dream II, i

১৭ ... ... Columbia Encyclopaedia পৃ—১০৬৩ —দ্বিতীয় সংস্করণ

১৮ ... ... F. Engels—The Origin of the Family, Private Property and State—pp 100 & 111 —Moscow Edition, 1948

১৯ ... ... ঐ, পৃ ১১১, ১২, ১৩

২০ ... ... A Midsummer Night's Dream Act 1, i

২১ ... ... Hamlet—I, v

২২ ... ... H. J. C Grierson—Cross-Currents in

Eng. Literature of the XVII century পৃ—IX, X

২৩ ... ... Romeo & Juliet—II, ii

২৪ .... The Social History of Art, Vol-1, ch 5 ; Sir E. K. Chambers এরও এই মত।

২৫ ... ... J A Symonds—The Renaissance in Italy

২৬ ... ... J Burckhardt—The Civilisation of the Renaissance in Italy

২৭ ... ... রা ত ব স, পৃ-৯৫, ২য় সং।

২৮ ... ... ঐ

২৯ ... ... Life of Clive—Dadabhai Naorojiর Poverty and un-British Rule in Indiaতে ৫৯৬পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

৩০ ... ... Macaulay's *Essay on Lord Clive* ঐ ৫৯৯ -৬০০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত

৩১ ... ... Malcolm's Life of Clive, ঐ ৬০০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত

৩২ .... ঐ, তে উদ্ধৃত, পৃ—৬০০

৩৩ .... ঐ—পৃ ৬১৩

৩৪ ... ... ঐ—পৃ ৬১৫

৩৪ক .... Karl Marx—"British Rule in India." "New york "Daily Tribune", June 25, 1853.

৩৫ ... . The Charter of 1813.

৩৬ .... The charter of 1833.

৩৭ .... Poverty and un-British Rule in India পৃ IX.

৩৮ .... Karl Marx—"British Rule in India"—"New york—Daily Tribune, June 25 1853.

৩৯ .... Karl Marx—Capital, Vol-l, ch. XIV Section—4.

৪০ ... . Karl Marx—'British Rule in India. —New york, Daily Tribune, June 10, 1853.

৪১ ... . Karl Marx—'Future Results of British Rule in India'—New york Daily Tribune August 8, 1853.

৪২ ... ... Poverty and un-British Rule in India, Page 617.

৪৩ ... ... বঙ্কিমচন্দ্র—উক্ত নামীয় রচনা

৪৪ ... ... যোগেশ চন্দ্র বাগল—বাংলার উচ্চশিক্ষা (বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ) পৃ—৮

৪৫ ... . এ্যাডাম্ সাহেবের ১৮৩৪ খ্রীঃ র বিবরণীতে কলিকাতার বাহিরে উনিশটি বালিকা বিদ্যালয়ের কথা আছে।

৪৫ক ... ... নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—রামমোহন রায়

৪৫খ ... ... ঐ—৩৮৮—৩৮৯

৪৫গ .... ঐ—৩৮৯

৪৬ .... Alexander Duff—India and India Missions P—640

৪৭ ... ... Thomson & Garrat—The Rise and fulfilment of British Rule in India.

৪৭ক ... ... বর্তমান গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদের খ' বিভাগে বর্ণনা করা গিয়াছে।

৪৮ .... রা' ত. ব. স.—পৃ—১৬২—৬৩

৪৯ .... এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচিত

৫০ .... স. সে. ক.—৩য় সং—দ্বিতীয় খণ্ড—পৃ—১২৫, ১২৭

৫১ ... ... সা. সা. চ. পৃ—৫২

৫২ ... ... ঐ—পৃ ৬১

৫২ক .... ঐ—পৃ ৬৪

৫৩ .... Hunter—Annals of Rural Bengal p—467.

৫৪ .... ইতিহাসাশ্রিত কবিতা সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ—১৮৭

৫৫ .... রা. ত. ব. স. পৃ—২১২

৫৬ .... সা. সা. চ. পৃ—১৬৬, ১৬৭

৫৭ .... রা. ত. ব. স. পৃ—২১৮

৫৮ .... হুতোম প্যাঁচার নক্সা—সাহিত্য-পরিষদ্ সং পৃ—৫৫৬

৫৯ ... ... The Rise and Fulfilment of British Rule in India—pp—461 ff, 438, p-138 footnote, p. 437, p. 436, p.-442,

৬০ ... ... Buckland—Bengal under the Lt. Governors. p. 182

৬১ .... K. M. Panikkar—Asia and Western Dominance—P. 143

৬২ ... . Calcutta Review—1857—p. p. 393—4 ;

৬৩ .... বিপিন বিহারী গুপ্ত—পুরাতন প্রসঙ্গ—পৃ—২০১

৬৪ .... ভারতী পত্রিকা—প্রথম বর্ষ—৫ম সংখ্যা—পৃ-২০০

৬৫ .... রা. ত. ব. স—পৃ-২১৭, ২১৮

৬৬ ... . যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—কেশবচন্দ্র ও সেকালেরসমাজ পৃ-॥০

৬৭ ... ... রা. ত. ব. স. পৃ—২২৪, ২৫

৬৮ ... ... সাহিত্য পরিষদ সং পৃ—৯১, ৯৩, ৯৪

৬৯ ... . The Hindoo Patriot-29th Jun. 1860

৭০ .... R. C. Dutt—The Economic History of India in the Victorian Age, 7th edition, pp-VII-X

৭১ .... ঐ p v.

৭১ক .... সেকালের একখানি বিখ্যাত পত্রিকার নাম শুধু Hindoo Patriot ছিল না ; হিন্দু ইণ্টারপ্রিটার, হিন্দু রঞ্জিকা, মাদ্রাজের হিন্দু ক্রনিক্‌ল্ নামীয় পত্রিকাও ছিল। হিন্দু হিতৈষিণী সভাও ছিল। ইহার অনেক পরে যখন বিদ্যাসাগর কলেজ প্রতিষ্ঠা করিলেন তখন সেখানে মুসলমানের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। বঙ্কিমেও সাম্প্রদায়িক চেতনা অতি প্রবল। অবশ্য একথাও মনে রাখিতে হইবে যে মিউটিনির

পরে স্যর সৈয়দ আহমদ্ প্রভৃতির চেষ্টায় ইংরাজ বুঝিতে পারিল যে এই ভেদবুদ্ধিকে উস্কানি দিলেই তাহার লাভ। বিদ্যাসাগর বঙ্কিমের কার্য এই পট-ভূমিকায় দেখিতে হইবে।

৭২ .... রা. ত. ব. স পৃ—১০৬

৭৩ .... এই নাটকের কপি জাতীয় গ্রন্থাগারে আছে এবং Calcutta municipal gazetteএও ছাপা হইয়াছে।

৭৪ .... Enquirer—July, 1831 (২য় সংখ্যা)

৭৫ .... রা. ত. ব. স.—১১৩

৭৬ .... স. সে. ক. ৩য় সং—২য় খণ্ড পৃ—১৯২-৯৩

৭৭ .... রা. ত. ব. স পৃ—১৯৬

৭৮ .... ঐ পৃ ২১৩

৭৯ .... স. সে. ক. পৃ ২২৬, ২২৮

৮০ ... . বিশ্বভারতী পত্রিকা-কার্ত্তিক পৌষ ১৩৬২, বাংলার নব জাগরণে বিদ্বৎসভার দান নামীয় প্রবন্ধ

৮১ ... ... রা ত ব স পৃ ১০ ১০৮

৮২ ... ... ঐ

৮৩ .... ঐ পৃ ১৫৬, ১৫৭

৮৪ .... Bengal Harkaru-Feb 13, 1843. বিনয় ঘোষ তাঁহার 'বাংলার নবজাগরণে বিদ্বৎসভার দান' নামীয় (বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬২) প্রবন্ধে উদ্ধার করিয়াছেন।

৮৫ .... এই জাতীয় আরও সভার নাম করা যাইতে পারে; ইহাদের কিছু কিছু আবার ইঙ্গবঙ্গীয় যেমন এগ্রি-কালচারাল সোসাইটি। অন্যান্য সভাঃ—Bethune Society, কোন্নগর হিতৈষিণী সভা, কৃষ্ণমোহনের ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাব, Bengal Social Science Association (প্যারীচাঁদ মিত্র—অবশ্য একটু পরে, ১৮৬৭ খ্রীঃ)

বিশুদ্ধ সমাজ-বিজ্ঞান আলোচনার জন্য সমিতি স্থাপন এই প্রথম। এবং প্রবাসী ১৩৬২ সনের কার্তিক,

পৌষ এবং চৈত্র সংখ্যায় যোগেশ বাগল মহাশয়ের আলোচনাতে এই সভার বিবরণী যাহা পাওয়া যায় তাহাতে সেই যুগেই বাঙালী বিদ্বজ্জনের বৈজ্ঞানিক চেতনা ও সামাজিক দায়িত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

৮৬ .... স. সে. ক. ২য় খণ্ড পৃ—১৩৫-১৩৬

৮৭ .... রা. ত. ব. স পৃ—৯৯

৮৭ক .... বেন্টিঙ্কের এই নীতির পিছনেও ছিল ব্যয় সঙ্কোচের অর্থনৈতিক তাগিদ। তাঁহার আগমনের পূর্বে গড় পড়তা বার্ষিক ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইতেছিল ৩০লক্ষ পাউণ্ড। এই জন্যই নিম্নতর পদে ভারতীয়দের নিয়োগের নীতি।

৮৮ .... বর্তমান গ্রন্থের ৮৩ পৃষ্ঠার ২য় অনুচ্ছেদ

৮৮ক .... বা, সা, গ সুকুমার সেন পৃ—৩০

৮৮খ .... ইস্‌লামি সাহিত্য সুকুমার সেন।

৮৯ .... রা, ত, ব, স পৃ—৫৮

৯০ ... . বা, সা, গ পৃ—৪৩

৯১ .... সা, সা, চ—রামমোহন, পৃ—৪৯ "সে সময়ে বাংলা দেশে বেদ উপনিষদ প্রভৃতির চর্চা মন্দীভূত হইয়াছিল।"

৯২ ... ... বা. সা. ই. ২য় খণ্ড সুকুমার সেন, পৃ—৫৮, ৫৯

৯৩ ... ... ঐ পৃ—৫৬

৯৪ ... ... ঐ পৃ—৬৮

৯৫ ... ... ঐ পৃ—৩১

৯৬ ... ... ঐ প্রবন্ধের ১৬, ২৫, এবং ২৭ পৃষ্ঠা (২য় সং—সাহিত্য পরিষদে প্রাপ্তব্য)

৯৭ ... ... বা. সা. ই—২য় খণ্ড, সুকুমার সেন—প্রারম্ভিক অনুচ্ছেদ

৯৭ক ... ... "Greek tragedy was one of the distinctive functions of Athenian democracy. In its form and its content, in its growth and its decay, it was conditioned by the evolution of the social

organism to whieh it belonged...... Æschylus was a democrat who fought as well as wrote. The triumph of democracy over the internal and external enemies allied against it was the inspiration of his heart"............p. 1, Æschylus and Athens.—George Thomson—2nd edition.

৯৮ ... ... স. সে. ক, ৩য় সং—২য় খণ্ড পৃ—১৫৪

৯৮ক ... ... এই পংক্তির সঙ্গে ডি. এল, রায়ের পংক্তির কেমন মিল :—গা ইল জয় মা জগন্মোহিনী, জগজ্জননী ভারতবর্ষ

৯৯ .... বা, সা, ই ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃ—৮৩২-৮৪৪

১০০ ... . ঐ পৃ—৯৯৮-৯৯

১০১ ... ... বাংলা সাহিত্যের নবযুগ, শশিভূষণ দাশগুপ্ত পৃ-২৩, ২৪

১০২ ... ... পৃ—২২৬

১০৩ ... ... শশিভূষণ দাসগুপ্ত বাংলা সাহিত্যের নবযুগ পৃ—২৩, ২৪

১০৪ .... বা, সা, ই, ২য় খণ্ড, ১ম সং, পৃ—১৩৮

১০৪ক ... . রা, ত, ব, স—পৃ—২১৭-১৮

১০৫ .... ঐ পৃ—১৩৯

১০৬ ... ... পুরাতন প্রসঙ্গ পৃ—২২৮

১০৭ ... ... Handbook of Philosophy—Howard selsam পৃ—৫১-৫২

১০৮ .... রা, ত, ব, স, পৃ—৫৫, ৫৮। যদিও শিবনাথ শাস্ত্রী এখানে রামমোহনের যুগকে বর্ণনা করিতেছেন, তথাপি হুতোম প্যাঁচার নক্সায় বর্ণনা হইতে মনে হয় পরের যুগ সম্পর্কেও ইহা সত্য।

১০৯ ... ... পৃ—২২১

১১০ ... ... ঐ পৃ—৯২

১১১ ... ... পূর্ণিমা পত্রিকা ১২৬৬ ৫ম সংখ্যা পৃ—৩৪ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রাপ্তব্য)

১১২ ... ... ঐ পৃ—৩৫

১১২ক .. ... পূর্বে উল্লিখিত সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব।

১১৩ ... . ঐ

১১৪ ... ... সোমপ্রকাশ, ৬ই আগষ্ট ১৮৬০ (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্ধৃত সা, সা, চ, মধুসূদন গ্রন্থে)

১১৫ ... ... বা, সা, ই, ২য় খণ্ড, পৃ—১

১১৬-১১৭ ... নগেন্দ্রনাথ সোম, 'মধুস্মৃতি' নবতম সং পৃ—৩, ৪

১১৭ক .. .... এই সম্পর্কে Richardson এর বক্তব্য: It is the part of poetry to lift us above the reach of petty cares and sensual desires; and to make us feel that there is something novel and more permanent than the ordinary pleasures of the world. It is a species of religion. Poets are Nature's priests. They lead us from Nature to Nature's God". জীবন চরিত পৃ—৮০

১১৭খ ... oft like a sad bird I sigh
To leave this land, though mine own land it be;
Its green-robed meads,—gay flowers and cloudless sky
Though passing fair, have but few charms for me.
For I have dreamed of climes more bright and free
Where virtue dwells and heaven-born liberty
Makes e'en the lowest happy; where the eye
Doth sicken not to see man bend the knee
To sordid interest:—climes where scienee thrives,
And genius doth receive her guerdon meet;

পৃ ১০৯-১১০ জীবনচরিত।

১১৮—এই বিষয় লইয়া বর্তমান লেখকেরই একটি একাঙ্কিকা ১৯৫৩ নভেম্বর সংখ্যা পরিচয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১১৯—He was an ardent admirer of beauty, nor was beauty. less prone to reciprocate his feelings. Modhu had great faith in love at first sight.

"Who loved that did not love at first sight." Though entertained this belief, though he was by nature impulsive, though "no sooner thought than done" was his motto, though inspired by love at first sight, he would not, supposing adult marriage to have been prevalent in Hindu society, have acted with any precipitancy in the selection of a fit partner for his life. When his heart had been fixed, and it would not have been fixed until he found that his better half breathed equally responsive vows, he would, if circumstance had permitted. not have cared for the barriers of conventionalism or the trammels of caste. It is a fact that, before he became a christian, his parents had elected for his brde a girl who was a cherub—a veritable Peri. But Modhu had not a heart tc give away at the bidding of another, though that bidding was from a revered parent. He could not realise the idea of a wife without experiencing before marriage the "mutual flow of soul and feast of reason" that characterises true love between the sexes. Mere animal passion had no influence on his feelings in matters matrimonial. He longed for courtship though courtship was a myth in Hindu life. His emotions were not excited by the mere sight of physical beauty, without mutual play and interchange of feelings and sentiments in which grown up young people only can indulge. The infantile face gave rise in his mind to fraternal sensations such as a grown up brother feels for his little sister. He used always to tell me that he would rather die a Benedict than wed an "illiterate, uneducated, unsympathetic" girl, and in those days an educated female was a *rara avis* in our society, the solitary exception being in the family of a native christian clergyman; but his hopes in that quarter, if any, were nipped in the bud. By

embracing christianity he was enabled to realise his idea of English courtship before marriage. I had little intercourse with him when he was at Madras, except by means of occasional correspondence ; but, for aught I know to the contrary I can confidently say that Modhu was disappointed in his first wife." জীবনচরিত পৃ ৬৫৩-৫৪.

১১৯—মধুস্মৃতি লেখক নগেন সোম মহাশয় রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের কন্যা দেবকীর প্রতি ব্যর্থ অনুরাগই মধুসূদনের পিতৃপ্রস্তাবিত বিবাহে আপত্তির কারণ বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। কিন্তু সোম মহাশয় কোন সূত্রে এই তথ্য সংগ্রহ করিলেন? বনফুল তাঁহার শ্রীমধুসূদন নাটকেও এই অসমর্থিত তথ্য লইয়া অনেক ধানাই-পানাই করিয়াছেন। এবং শিশির কুমার ভাদুড়ীও তাঁহার নাটকে এই ঘটনাকে স্থান দিয়াছেন। সোম মহাশয় এবং যোগীন্দ্রনাথ বসুও যে বিশ্বাস করিয়াছেন যে মধুসূদন বিলাত যাইবার সুবিধা হইবে বলিয়া খ্রীষ্টান হইয়াছিলেন তাহারও কোন ভিত্তি নাই। রেঃ কৃষ্ণমোহনের লেখা (পৃ ১২৪, জীবনচরিত) হইতেই বুঝা যায় যে মধু প্রথমে তাহা ভাবিতেন। কিন্তু যখন খ্রীষ্টান হইলেন তখন প্রত্যক্ষ কারণ এক বিবাহ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। খ্রীষ্টান হইয়া তিনি অবশ্য বিলাত যাইবার চেষ্টা করিয়া ছিলেন, পারেন নাই।

১১৯ ক—মধুর সহিত Henriettaর আনুষ্ঠানিক বিবাহ হয় নাই এবং Rebeccaর সঙ্গেও তাঁহার আনুষ্ঠানিক বিবাহচ্ছেদ হয় নাই। মাদ্রাজ হইতে তিনি ১৮৫৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর যে চিঠি গৌরদা:·কে লেখেন তাহাতে আছে, 'I have a fine English wife and four children' আর তিনি কলিকাতা যাত্রা করেন ১৮৫৭ সালের জানুয়ারীর শেষে। আর মাদ্রাজ যান নাই। কিছুদিন পরে তিনি স্ত্রী Henriettaকে কলিকাতা লইয়া আসেন। তাহা হইলে যাহা কিছু ঘটনা তাহা ঘটিয়াছিল ২০শে ডিসেম্বর, ১৮৫৫ এবং (ধরা যাক) ২০শে জানুয়ারী ১৮৫৭র মধ্যেই। এবং মধু যে Rebeccaর সঙ্গে বাস করিতে করিতেই Henriettaকে লইয়া elope করিয়াছিলেন তাহা অন্তর্বর্ত সময়ের অল্পতা ও গৌরদাস বসাক মহাশয়কে লিখিত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের চিঠির যে অংশটুকু ব্রজেন বাবু সংবাদপত্রে সেকালের কথার তৃতীয় সংস্করণের ২য় খণ্ডের ৭০২ পৃষ্ঠায় পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন তাহা হইতেই প্রমাণিত হয়: The Madras secret, I believe, is that Madhu eloped with the lady with whom he lived as wife but this myself and my son

knew before I corresponded with you about Madhu's life. You did not tell me anything about it.

১২০ ... জীবনচরিত পৃ—১৮০

১২১ ... „ পৃ—১৭৩

১২২ .... „ পৃ—৫২৫

১২৩ .... বা. সা. ই, সুকুমার সেন—২য় খণ্ড, ৩য় সং পৃ—১৮৩

১২৩ ক ....রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিকথাতেও মধুসূদন সম্পর্কে নিম্নলিখিত উক্তি আছে : Money which he said he had never cared to make meant to him but as an effective means of enjoying life than which he thought there was no other use of it.

১২৪ ... মধুস্মৃতি পৃ—৪৭৩

১২৫ .... সা. সা. চ. পৃ—৭৭-৭৮

১২৬ ... মধুস্মৃতি পৃ—৫৭

১২৭ .... ঐ পৃ—৫৬

১২৮ .... ঐ পৃ—৬৪ ; এটি মধুসূদনের একটি উৎকৃষ্ট ইংরাজী সনেট। ইহার গভীরতা ও বাক্‌সংযম অভূতপূর্ব্ব।

১২৯ ... ... ঐ পৃ—৬৪ ; ২য় সনেট

১৩০ ... ... মধুসূদন নামীয় গ্রন্থ

১৩১ ... ... শ্রী মধুসূদন

১৩২ ... ... মধুস্মৃতি পৃ—৭০

১৩৩ ... ... মধুসূদন পৃ—২১

১৩৪ ... ... ঐ পৃ—২২

১৩৫ ... ... শেষের কবিতা—রবীন্দ্রনাথ

১৩৬ ... ... Rousseau and Romanticism—p-225

১৩৬ক ... ... Captive Ladyর মুখবন্ধে তিনি যে প্রেমাস্পদকে তাঁহার আখ্যান শুনিতে আহ্বান করিয়াছেন সে কি রেবেকা নাম্নী মানবী, না তাঁহার মানসী ?

১৩৭ ... . Literature of Bengal—R. C. Dutta পৃ—১৯৬

১৩৮ ... ... ঐ পৃ—১৭৬

১৩৯ ... ... মধুস্মৃতি পৃ—৪৬৫ ; বঙ্কুবিহারী দত্তের স্মৃতিকথা।

১৪০ ... ... Literature of Bengal—R. C. Dutt পৃ—১৯৭

১৪১ .... রবীন্দ্র-রচনাবলী—অচলিত সংগ্রহ ২য় খণ্ড....পৃ—৭৫

১৪২ .... মধুসূদন-গ্রন্থাবলী—পরিষদ সং, শর্মিষ্ঠা নাটকের ভূমিকায় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সমালোচনার উদ্ধৃতি পৃ—॥/০

১৪৩ .... ঐ পৃ—॥০

১৪৪ .... ঐ মেঘনাদবধ কাব্যের ভূমিকা—পৃ—১০

১৪৪ক .... বা. সা. ই. ২য় খণ্ড, পৃ—৭৮

১৪৫ .... জীবন চরিত, পৃ—৩১০-১১

১৪৬ .... ঐ পৃ—৩২৬

১৪৭ .... Bywater's Translation পৃ—৫০-৫১

১৪৮ ... . পৃ—৯• [Impression of 1925 ; First published in 1896]

১৪৯ ... . ঐ পৃ—৯২-৯৩

১৫০ ... . Æschylus & Athens, George Thomson, Second edition—pp 38-54

১৫১ ... . Æschylus & Athens পৃ—২৮৭-৮৯ ;

১৫২ ... ... পৃ ২১৬-১৭ ;

১৫৩ ... .. পৃ—২১৯

১৫৪-১৫৭ .... তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য—৪র্থ সর্গ

১৫৮ ... ... A History of English Literature—1937 edition পৃ—২৫৪

১৫৯ .... Act III, Sc i

১৬০ .... Ulysses, Tennyson ;

১৬১ .... Tempest—III, i

১৬২ .... Dr. Faustus Christopher Marlowe

১৬৩ .... বিবিধার্থ-সংগ্রহে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সমালোচনা—মধুসূদনের গ্রন্থাবলীর সাহিত্যপরিষদ্ সংস্করণের তিলোত্তমাসম্ভবের ভূমিকার ১/০ পৃষ্ঠায়।

১৬৪ .... Endymion, Keats lines, 6-13
১৬৫ .... রবীন্দ্রনাথ
১৬৬ .... Rousseau and Romanticism—p 225
১৬৮ .... তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের ভূমিকা—সাহিত্যপরিষদ্ সং
১৬৮ .... পৃ—১৬
১৬৯ .... Tempest—Act I, Sci ;
১৭০ .... Rousseau and Romanticism p 121
১৭১+১৭২ .... মধুসূদন শশাঙ্ক মোহন—পৃ—৪৮ ও ৪৯
১৭৩ .... জীবন চরিত পৃ—৩২৪-২৫
১৭৪ .... ঐ পৃ—৪৮২
১৭৫ .... Literature of Bengal—p.—4
১৭৬ .... সা সা চ মধুসূদন—৩য়, সং পৃ-৩৩
১৭৭ .... তিলোত্তমাসম্ভবের সা. প, স এর ভূমিকা—পৃ-।৶০
১৭৮ .... বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (১৭৯৫-১৮৭৬) ৩য় সং পৃ-৪৭
১৭৯ .... ঐ
১৮০ .... সা. প. স মেঘনাদবধের ভূমিকা পৃ—১৫
১৮১ .... Tamburlaine এর Prologue
১৮২ .... তিলোত্তমাসম্ভবের মঙ্গলাচরণ
১৮৪ .... জীবনচরিত পৃ ৪৮৫
১৮৫ .... ঐ পৃ ৪৮৩
১৮৬ .... ঐ পৃ ৩১১
১৮৭ .... ঐ পৃ ৩১১-৩১৩
১৮৮ .... ঐ পৃ ৪৯৪
১৮৯ .... জীবন চরিত পৃ ৩১৩-৩১৫
১৯০ .... ঐ পৃ ৪৮৯
১৯১ .... ঐ পৃ ৪৮৯
২৯২ .... ঐ পৃ ৪৮২
১৯৪ .... মধুস্মৃতি—নবতম সং পৃ ১০১
১৯৫ .... সা সা চ পৃ ৭৩
১৯৬ .... A tremendous literary rebel
১৯৭ .... রবীন্দ্রনাথ—সাহিত্য সৃষ্টি

১৯৮ .... মধুসূদন—শশাঙ্কমোহন সেন পৃ—২২

১৯৯ .... ঐ পৃ ৪৮-৪৯

২০০ .... ভারতী—প্রথম বর্ষ

২০১ .... Milton, Man and Thinker—Saurat pp—124-126

২০২ .... Hindoo Patriot—June 11, 1859 Editorial note

২০৩ .... ঐ April 30, 1857 Correspondence

২০৪ .... জীবন চরিত পৃ ৪১৬-৪১৭

২০৫ .... কবি শ্রী মধুসূদন পৃ ৬১

২০৬ .... ওমর খৈয়াম—Fitzgerald.

২০৭ .... কবি শ্রী মধুসূদন পৃ ৫৬-৫৭

২০৮ .... ঐ পৃ ৫৪

২০৯ .... ঐ পৃ ১২৮

২১০ .... মধুসূদন—শশাঙ্ক মোহন সেন পৃ—১১৯

২১১ ... ... ঐ পৃ ১৩৩

২১২ ... ... বা সা ই, ২য় খণ্ড পৃ—১৫৭

২১৩ ... ... পৃ ২৩১-২৪০

২১৪ ... ... পৃ ১৭১

২১৫ ... ... ঐ পৃ ১৬৭

২১৬ ... ... Preface to Antony and Cleopatra in complete works of Shakespeare edited by Charles Jasper Sisson.

২১৭ ... ... জীবন চরিত পৃ ৪০৯

২১৮ ... ... মধুস্মৃতি পৃ ১৮৬

২১৯ ... ... 'কবি শ্রী মধুসূদন—মোহিত লাল মজুমদার পৃ ২৫-২৬

২২০ ... ... সাহিত্য-চর্চা—মাইকেল নামীয় প্রবন্ধ

২২১ ... ... ইতঃপূর্ব্বে উদ্ধৃত; এই বক্তব্য মেঘনাদবধ শীর্ষক পূর্ব অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

নাম সংক্ষেপ

যে যে গ্রন্থের নামের সংক্ষিপ্ত রূপ নির্দেশিকায় ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাদের একটি তালিকা এবং সংক্ষিপ্ত রূপগুলিও নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল :—

১। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ....রা ত ব স (২য় সংস্করণ)
২। সংবাদপত্রে সেকালের কথা....স সে ক (৩য় সংস্করণ)
৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১৩৫০ সংস্করণ....বা সা ই (ডাঃ সুকুমার সেন)
৪। সাহিত্য সাধক চরিতমালা...সা সা চ

উপরে উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়া অন্যান্য যে সকল গ্রন্থের সংস্করণের উল্লেখ বর্তমান গ্রন্থমধ্যে করা হয় নাই সেগুলি হইল :—

১। মাইকেল মধুসূদনের জীবনচরিত—যোগীন্দ্রনাথ বসু (৫ম সংস্করণ)
২। মধুস্মৃতি—নগেন্দ্রনাথ সোম (নবতম সংস্করণ, ১৩৬১)
৩। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরিবর্ধিত ৩য় সংস্করণ)
৪। রাজা রামমোহন রায়—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (৪র্থ সংস্করণ)
৫। বিদ্যাসাগর—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (৩য় সংস্করণ, ১৯০৯)
৬। বিদ্যাসাগর—বিহারীলাল সরকার (৪র্থ সংস্করণ)
৭। বঙ্কিমরচনাবলী—সাহিত্য সংসদ্ সংস্করণ
৮। রবীন্দ্ররচনাবলী—অচলিত সংগ্রহ. ২য় খণ্ড, (১ম সংস্করণ)
৯। সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ (১ম সং-এর পুনর্মুদ্রণ, ১৩৬১)
১০ Articles on India—Karl Marx (People's Publishing House)
১১ Capital, Vol 1—Karl Marx (Translation by Moore & Aveling, 1946)
১২ Origin of the Family, Private property and State-Engels (1st edition, Moscw)
১৩ Man's worldly Goods—Leo Huberman (2nd Indian edition 1948)
১৪ The Good Old Cause—Christopher Hill and Edmund Dell.
১৫ Shakespeare's Collected Works—by C. J. Sisson (first edition)
১৬ Rousseau and Romanticism—Irving Babbit (7th impression)

বানান সম্পর্কে আমরা চলন্তিকার অনুসরণ করিয়াছি এবং রেফে দ্বিত্ব বর্জন করিয়াছি। মধুসূদনের গ্রন্থ হইতে সমস্ত উদ্ধৃতিই সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ হইতে লওয়া হইয়াছে।